নাটকের শেষ দৃশ্যে

আশাপূর্ণা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৮

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে
এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬নং হেমেন্দ্র সেন
স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীঅশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমান অসিত চৌধুরী (ভুলু)

চিরস্নেহাস্পদেষু

নাটকের শেষ দৃশ্যে

দিনের পর দিন নিষ্ফলা বন্ধ্যা দিনরাত্রিগুলো ধূসর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, ফসলের আশ্বাস নেই। কিন্তু ফসলের আশ্বাস আসবে কোথা থেকে? বীজখানই তো নেই। প্লট নেই। মাথা শূন্য।

অথচ তাগাদার পর তাগাদা আসছে—টেলিফোনের লাইন বেয়ে, ডাক-পিয়নের ব্যাগে চড়ে, মনুষ্যজন বাহিত হয়ে, কী হল? আর কত দেরি?

লেখক কৌশিক রায়, যে লেখাটি বাতাসে ভাসছে—তারই আশ্বাস দিয়ে বলছেন, আর কয়েকটা দিন দিতে হবে ভাই। টেনে তুলছি।

কিন্তু আর তো না হলেই নয়।

শূন্য কলসী থেকেই জল ঢালার চেষ্টায় হাত দিতে হবে। সেই হাতটিই দিয়েছেন সবে। লেখায় নয়, কলমে, বেদান্ত ঘরে এসে ঢুকল। নিজস্ব পদ্ধতিতে হুড়মুড়িয়ে আর নিজস্ব পদ্ধতিতেই ধপাস করে বসে পড়ে বলে উঠল, ওঃ, সেই একই অসহ্য দৃশ্য! হেঁটমুণ্ডে লিখে চলেছিস! তোর লেখার বাতিক আর গেল না! না লিখলে খেতে পাবি না? বাপ-ঠাকুদ্দা তো টাকার গদিতে বসিয়ে রেখে গেছে বাবা!'

এ রকম মন্তব্যে কৌশিক অবশ্য চমকালো না, বিরক্তও হলো না। শুনে শুনে অভ্যস্ত। এইভাবে ঝড়ের বেগে ঢোকা, অহেতুক জোরে বসে পড়া, আর কৌশিকের লেখার বাতিক সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ করা, এটা বেদান্তের মুদ্রাদোষ।

আর কৌশিক রায়ের বাপ-ঠাকুদা যে ওকে টাকার গদিতে বসিয়ে রেখে গেছে, এটাও বেদান্তের একটি মৌলিক ধারণা মাত্র। যেটা ওর ব্যাপারেই বরং প্রযোজ্য। পেনটাকে টুপি পরিয়ে সরিয়ে রাখল কৌশিক। না রাখবার কোনো মানে হয় না। এ বেলাটায় যে আর ওতে হাত পড়বে না, সে তো অবধারিত।

চেয়ার ঘুরিয়ে বেদান্তের মুখোমুখি বসল। বলল, বাতিকটা গেলে তোর কী কী সুবিধে হবে, জানতে পারি?

সেণ্টপার্সেণ্ট সুবিধে। ঘরে ঢুকেই এই মেজাজ-খারাপ-করা দৃশ্যটা দেখতে হয় না।

এতে তোর মেজাজ খারাপের কী হল?

হল না? বন্ধুর কাছে বন্ধু আসে কী করতে? অ্যাঁ, কী করতে আসে?

দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে কিনা? বিপদ-আপদে পরামর্শ-টরামর্শ নিতে কিনা?

কৌশিকের ভুরুটা নিজের জায়গা ছেড়ে অনেকটা উঠে পড়ল। বলল, বিপদ-আপদ মানে?

বেদান্তর মুখটা সেকালের কনে-বৌদের মত লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ঘাড়টা একটু চুলকে বলল, 'বিপদ' না বলে শুধু আপদও বলতে পারিস। আবার একটু ফেঁসে গেছি!

ওঃ, আবার শ্রীকৃষ্ণলীলা! হতভাগা বাস্কেল, বলেছিলি না, ও নাটকে চিরদিনের মত যবনিকাপাত করে দিয়েছি! এ জীবনে আর নয়!

বলে তো ছিলাম—

বেদান্তের মুখটা আরো, যাকে বলে 'ব্রীড়াবনত'।—ভাইরে, গেলাম ফেঁসে! একটু নয়, দারুন!

আর তার জন্যে পরামর্শ চাইতে এসেছিস? বেরিয়ে যা!

যাব। দুপুরে তোর বৌয়ের হাতে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে চা খেয়ে তারপর যাব।

অসহ্য! এই নিয়ে কবার হল?

অতো কি আর হিসেব আছে? তোকে তো বলেছি ফি বার।

আমি হিসেব রাখতে গেছি?

রাখলে পারতিস। সবদা কাগজ-কলমের কারবার।

কলমের আর অন্য কাজ নেই। এতোবার ফেঁসেও এমন জলজ্যান্ত আছিস কী করে, তাই ভাবছি। উঃ, সেবারে অত কাণ্ডর পর আবার? কান মূলেছিলি না?

তা হয়তো মূলেছিলাম। সেই কোন্ অতীতকাল থেকেই তো নিজের কান মূলে আসছিরে ব্রাদার!

কৌশিক একটা সিগারেট ধরাল।

বেদান্ত সিগারেট খায় না।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলে উঠল কৌশিক, বয়েস কত হল?

তুইই জানিস। তোর থেকে এক মাস চোদ্দ দিনের বড় না ছোট, এইটুকু মনে রেখেছি। জানি বাকিটা মনে রাখার দায়িত্ব তোর।

কৌশিক একটুক্ষণ আপন মনে সিগারেট টেনে বলল, তোর মত বেহায়া

হতচ্ছাড়ার কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

কৌশিকের স্বর বেশ নির্মম, খাতব-খাতব।

বেদান্ত নির্বিকার।

তার গলার স্বর আইসক্রীম আইসক্রীম। মুখের রেখায় কাতরতা।—এই কৌশিক, মাইরী। তুই শালা আমার কিছু না-পরার বয়েসের বন্ধু। তুই এ রকম করছিস?

সবেরই একটা সীমা আছে।

খাতির বল, আমার ভাগ্য। তোরা শালা সবাই দিব্যি চরে খাচ্ছিস, এমন কি তুই একটা লেখক, তাও সেই মা-বাপের দেওয়া বিয়ের বৌটাকে নিয়েই সুখে জাবর কেটে চলেছিস, আর এই ব্যাটা বেদান্ত বাগচীর কপালেই মধু ভাণ্ডের দিকে মৌমাছির মতন কোথা থেকে না কোথা থেকে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা ছুটে এসে জুটবে।

চেহারার অহঙ্কারটা করে নিচ্ছিস? বলে কৌশিক আর একটা সিগারেট ধরাল। খানিকটা ধোঁয়াও ওড়াল।

বেদান্ত বলে উঠল, এই কৌশিক, পয়সা দিয়ে ক্যানসার কিনতে চাইছিস?

তার মানে? ও হো হো! সিগারেটের কথা বলছিস? তবু তো বৌয়ের গঞ্জনায় অনেক কমিয়েছি। বলে, এর বদলে তুমি বরং ড্রিংক করবে। যেটা বাঙ্গসুদ্ধ লেখক-টেখক করে। তাতে ক্যানসারের ভয় নেই। চেষ্টা করছিলাম, সুবিধে করতে পারিনি। গলা দিয়ে নামাতে-নামাতেই বুকটুক জ্বালা করে। মাথা ঘোরে। ডাক্তার বলেছে, অ্যালার্জি।

কে ইচ্ছে করে মদ খেতে বলে তোকে?

মদ খেতে তো বলে না, কৌশিক হেসে ওঠে, শুধু একটু একটু ড্রিঙ্ক করতে বলে, ওর সব বান্ধবীদের বরেদের মত। তা পোষাল না, কী করব!

তাই বলে এনতার সিগারেট চালিয়ে যাবি?

কৌশিক হাসল, কী আর করা? একটা ফুরোলেই আর একটার জন্যে মনটা নিসপিস করে। যাক গে। ক্যানসারে তো একবার ভিন্ন দুবার ফাঁসব না?

হুঁ। নিলি এক হাত!

নিলাম। তা এবারের কেসটা কী?

বেদান্ত নড়েচড়ে বসল। বলল, এবারের কেসটা, বুঝলি, একটু বেশী জটিল।

কোন্ ব্যাপারটা তোমার বেশী জটিল নয়, তাই তো বুঝলাম না আজ পর্যন্ত। সেই ন বছর বয়েস থেকেই তো জটিলতা সৃষ্টি করে আসছ বাপ। তখন থেকেই হীরো।

কথাটা আতিশয্য নয় কৌশিকের, বেদান্তর এই নারীঘটিত ব্যাপারের সূত্রপাত ওর সেই ন বছর বয়েসেই।

বৃহৎ একান্নবর্তী সংসারের ছেলে, বনেদী বাড়ি, বাড়ি সর্বদাই লোকে লোকারণ্য, ছেলেপুলে কে যে কোথায় কী করছে কে খবর রাখে। এ খবরও কেউ রাখেনি, বড় জেঠির যে ছেলের নতুন বিয়ে হল, সেই বৌয়ের প্রেমে পড়ে বসে আছে এই ছেলে।

বিয়ে হয়েছিল বৈশাখে-টৈশাখে বোধ হয়, মর্নিং স্কুল চলছিল। অতঃপর গরমের ছুটি। অগাধ অবসর। পড়াশোনার কথা আর ওঠে না, হোমটাস্কের খাতা হারিয়ে-ফারিয়ে হাওয়া, বেদান্ত নামের কন্দর্পকান্তি বছর নয়েকের ছেলেটা উদয়াস্ত সেই নতুন বৌয়ের সঙ্গে সেঁটে বসে আছে।

বৌ ওঠে বসে, নড়ে চড়ে, খায় শোয়, হাই তোলে, চুল শুকোয়, সবেতেই সে মোহিত। যা দেখে তাতেই বিহ্বলতা। নতুন বৌয়ের হাত-পায়ের আঙুলগুলো যেন পৃথিবীর এক পরম আশ্চর্য।

তোমার আঙুলগুলো কী সুন্দর! তুমি নোখ কাটো? কে তোমার নোখ কেটে দেয়? নিজে-নিজেই কাটো? আমি পারি না···তোমার চুলে একটু হাত দেব? তুমি কাঁচা আম খেতে ভালবাস না? বাসো? এনে দেব?

সঙ্গে সঙ্গে ছুট এবং নুন সহযোগে কাঁচা আম এনে হাজির। মুখে বিজয়-গর্বের হাসি।

ছোটদিরা কেটে কেটে খাচ্ছিল, বুঝলে? আমি বললাম আমায় দে। বেশী করে দে। অনেক বেশী করে দে। নইলে ছোটকাকে বলে দেব, কাসি হয়েছে তবু কাঁচা আম খাচ্ছিস! ব্যাস, দিয়ে দিল একগাদা। খাও।

মুখে কৃতার্থমন্য আর বিজয়গৌরব মিশ্রিত হাসির ঝিলিক। কথা যতটা বলছে, চাপাচ্ছে তার থেকে বেশী।

নতুন বৌও এই দেবদূতের মত মুখ ছেলেটার মুক্তোর সারির মত দাঁতের আলোর ঝিলিক দেখে মোহিত মুগ্ধ। অতএব ভাব দেখাবে না, এই কাঁচা আমের গাদা দেখে সে কতটা আহ্লাদে আটখানা হয়েছে। সেই আটখানা ভাবটি মুখে ফুটিয়ে বলল, ওমা, অ্যাতো! এসো দুজনে মিলে গপগো করে

করতে সাবড়াই।

আমি না, আমি না, তুমি সব খাবে।

সে কী! তাই কখনো হয়? তুমি কষ্ট করে বাগিয়ে আনলে।

তাতে কী? খাও না। তুমি তো ভালবাসো।

তাই বলে অ্যাতো? একা অ্যাতো খেলে আমারও যদি কাসি হয়?

অ্যাঁ! ইস! তাহলে দাও। যতগুলো খেলে কাসি হবে না, তাই নিয়ে আমায় দাও।

কিন্তু শুধুই কি কাঁচা আম? প্রেম নিবেদনের আরো কত মাধ্যম আছে। ডাঁসা পেয়ারা, পাকা জাম, পোড়া ভুট্টা। আরো কত কী।

বৌ শঙ্কিত হয়। বলে, এই, তুমি এসব আনো কেন? অ্যাতো খেতে পারি আমি? না না, ধ্যাৎ!

ধ্যেৎ কেন? সেদিন যে বললে, বিয়ের আগে বাপেরবাড়িতে তোমার ছোট বোনের সঙ্গে সারাদিন এনতার এইসব চালিয়ে যেতে। তবু তো—

তা এইসব গল্প আলোচনাই হয় বৈকি। এই বালক ভক্তটির সঙ্গে আর কোন্ হৃদয়ালাপই বা চলতে পারে? সারাক্ষণই যে পায়ে পায়ে ছায়ার মত ঘোরে, আর অনর্গল প্রশ্ন করে চলে। প্রশ্নই, নতুন বৌদি সম্পর্কে তার যে অনন্ত কৌতূহল। বিয়ের আগের জীবনটি তার কীভাবে কর্তিত হয়েছে, সেটা জানা যে এই ছেলেটার কেন এত জরুরী তা ছেলেটাই জানে!

আবার বিয়ের পরের ব্যাপারেও!

বড়দা যে তোমায় বিয়ে করে কদিন পরেই বাঙালোর চলে গেল, অনেকদিন পরে এলে তুমি চিনতে পারবে? মোটে তো কদিনের চেনা, এত বড় চিঠিতে কী লেখে বড়দা?...অফিসের কথা? এমা, অফিসের কথা নিয়ে তোমার কী দরকার?

...আজ তোমার মুখটা এমন দুঃখ-দুঃখ কেন? বাড়ির জন্যে মনকেমন করছে বুঝি? ওঃ না বুঝেছি, নিশ্চয় পিসিমা বকেছে। ভীষণ শয়তান বুড়ী। সব সময় সবাইকে বকে।...বলতে নেই? গুরুজন?

...গুরুজন হল তো ভারী বয়ে গেল। পাজীকে পাজী বলব না তো কি ভাল বলব?...এই সেরেছে, আজ তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বাপেরবাড়ি যাবে? কবে আসবে? পো-র্সু? ইস্! আমি যে কী করব।...হ্যাঁ খেলব তো, কিন্তু তোমায় তো দু দুদিন দেখতে পাব না?

ওরেব্বাস্! এত পান তুমি একলা সাজবে? এই তিনথালা চারথালা? তুমি তো পাগল হয়ে যাবে!…আহা!…তখন তো ছোড়দি মেজদি ছোট খুড়ি তিনজনে মিলে পান সাজতো! আর তুমি বেচারী একলা!

(কথাটা ঠিক। এ বাড়ির এই বৃহৎ পান-সাজা-পর্ব সমাধা করে তুলতে তিন-চারজনে হাত লাগাতে হতো। কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র। নতুন বৌ আর কোন্ কম্মে লাগবে পান সাজা, বিছানা গোছানো, কাচা কাপড় গোছানো ছাড়া? আদর দিয়ে অলস করে বসিয়ে রাখলে তো সারাক্ষণ বরকে চিঠি লিখবে!)

এই, আমি তোমায় একটু সাহায্য করি?…ইস! পারি না বৈকি? এতদিন ছোড়দিদের সাহায্য করেছি। ছোড়দি বলতো, এই পানগুলো একটু একটু করে এলাচ দিয়ে দে না রে। সবগুলোয় যেন পড়ে, নাহলে রক্ষে থাকবে না।…দিই না সুপুরি এলাচ দিয়ে!…পিসি বুড়ী কী দুষ্টু দেখেছ? রোজ বলি, আমি ছোটদের সঙ্গে আগে আগে খাব না, নতুন বৌদির সঙ্গে খাব, রোজ বলবে, খেয়ে নে, খেয়ে নে। আবার বলে, ইস্কুল খুললে কী করবি? বিচ্ছিরি লাগে।…তোমার মা এলে সারাক্ষণ শুধু মা জেঠিমা পিসিমা খুড়িমাদের সঙ্গে গল্প করেন কেন গো? তোমার বুঝি গল্প করতে ইচ্ছে করে না? এই ঘরে ডেকে এনে খিল বন্ধ করে গল্প করতে পার না?

কথা! কথা! কথার সমুদ্র স্রোত! কাজেই নতুন বৌকেও কথা বলতে হয় বেশী করে। এখন বলল, 'তবু তো—' কী?

উত্তরদাতার মুখ মলিন। ঢোক গিলে বলে, তবু তো ফুচকা, আলুকাবলী, ঘুঘনিদানা-টানা আনতে পারি না। আমার তো আর পয়সা নেই।

এই দৈন্যের স্বীকারোক্তিতে মুখটা খুবই নিষ্প্রভ দেখায়।

বৌ বোধ হয় মনে মনে বলে, ভাগ্যিস নেই। থাকলে তো তুমি আমার জীবন মহানিশা করে ছেড়ে দিতে চাচু। এইতেই পাছে কেউ দেখে ফেলে ভেবে ভয়ে প্রাণ যায়। আর আরো চালালে ধরা পড়ে কেলেঙ্কারির একশেষ হতো।

মুখে বলে, তা চালাতাম বোনের সঙ্গে। সে বিয়ের আগে একরকম। এখন আর ইচ্ছেই করে না।

ইচ্ছেই করে না!

কই, করে না তো।

ইস, তোমাদের কী কষ্ট! মেয়েমানুষদের কথা বলছি—নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়ি চলে এসে কেবল কাজ করা আর বকুনি খাওয়া!

বৌ শিহরিত হয়, কণ্টকিত হয়, চাপা গলায় বলে, এই, অমন বলতে নেই! লোকে তাহলে আমাকেই নিন্দে করবে!

লোকের কথা বাদ দাও। কিসে না নিন্দে করে লোকে?

সারাক্ষণই কথার চাষ। আর এই রকম সব কথার।

নতুন বৌয়ের বুক কাঁপে। তা ছেলেটা যদি ছোট খুড়শাশুড়ীর ছেলের মত পুঁয়েপাওয়া, নাকে সর্দি ঝরা, কেলে-কুচ্ছিত হতো, নতুন বৌ এতটা রিস্ক নিয়ে তাকে প্রশ্রয় দিত কিনা কে জানে! হয়তো ছুতো-টুতো করে ভাগাতো। কিন্তু এই সদ্য দেবদূতের মত দেখতে ছেলেটা আর যার কথার ছত্রে ছত্রে নতুন বৌদির প্রতি মমতা সহানুভূতি আর ভালোবাসা, তাকে বিদায় করবার ছলছুতো খুঁজে পাওয়া শক্ত। বরং একটা লাড্ডু দিয়ে বসে বন্ধন নিবিড় করে তোলে।

* * *

ডাকবাকসে চিঠি ফেলে দিয়ে আসতে পারো?

ডাকবাকসোয়? পা উঁচু করে হাত পেয়ে যাব। দাও চিঠি।

আজ তো তোমাদের সুখেনকে দিয়েই দিয়েছি। কাল দেব।

বাপেরবাড়ি আর বাঙালোরে দু জায়গায় পত্রালাপ। দেকো বাড়িতে কোটার মাত্রাটি মোটামুটি মাপা! বৌমানুষের আবার এত ঘন ঘন বাপের বাড়ি চিঠি দেওয়া কেন? ওতে শ্বশুরঘরে মন বসতে চায় না। আর বরের কাছে? সেই বা বেশী কেন, লোকটাকে ব্যস্ত করতে! আপিসের কাজ করবে, না রোজ বসে বসে বৌকে পাতা-পাতা চিঠি লিখবে?

তা, নতুন বৌও চালাকি খেলতে চায়। দু'চারখানার জন্যে যদি সুখেন ছাড়া অন্য একটি সোর্স আবিষ্কার করা যায়, মন্দ কী?

পা উঁচু করে? ও বাবা, তাহলে সবাই আমায় বকবে!

কে দেখতে যাবে শুনি? আমি তো লুকিয়ে ফেলতে যাব!

এই এই, লুকিয়ে কেন? এমনিই তুমি ছেলেমানুষ—

বৌ শিহরিত হয়, কারণ লুকিয়ে শব্দটা তো নির্দোষ নয়।

দেবদূত কচি তালশাঁসের মত মুখে পাকা হাসি হেসে বলে, আহা, আমি যেন কিছু বুঝতে পারি না! সুখেন পাজীটা বাড়ির সব চিঠি ফেলতে যাবার সময় পিসিমাকে দেখিয়ে নিয়ে যায়, জানি না বুঝি?

অতএব আর কি ! দেবদত্তকেই ষড়যন্ত্রের শরিক করে ফেলা।

একেবারে দেয়ালের লাগোয়া পাশের বাড়ির 'কুশে' বলে, তুই আর খেলতে টেলতে আসিস না কেন রে বেদা ? গরমের ছুটিটা তো প্রায় ফুরিয়েই গেল।

বেদা করুণ মুখে বলে, কী করব বল ? নতুন বৌদি বেচারী একা একা থাকে।

একা ? একা কী রে ? তোদের বাড়িতে এতো লোক।

লোক থাকলে কী হবে ? কেউ তাকে ভালবাসে ? কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আমি ধরে ফেললে মিছিমিছি করে বলে, ছোট ভাইবোনের জন্যে মনকেমন করছে।

মিছিমিছি কেন ? মন কেমন করতে পারে না ?

পারে। তবে সে অন্য কান্না, এ হচ্ছে গার্জেনদের বকুনিতে।

তুই কি করে জানলি ?

আমি সব বুঝতে পারি।

এ সময়ও মুক্তোর সারিতে বিজয়গৌরবের ঝিলিক।

তা বলে সব সময় মেয়েদের কাছে থাকতে ভাল লাগে ?

মেয়েদের আবার কী ? নতুন বৌদি কী ভাল জানিস তুই ? ওই সব বুড়ীদের মতন নাকি ?

* * *

ন বছরের প্রেমিক, আঠারো বছরের প্রিয়া !

সংসারে এও যে ধর্তব্য হতে পারে, সেই ভয়াবহ সম্ভাবনা ন' বছরের তো দূরস্থান, আঠারো বছরও অনুমান করতে পারে নি। অতএব নিশ্চিন্ততার পাথার। বোঝে না—'সংসার' নামের জায়গাটি সোজা চীজ নয়। টেরই পায় না বেচারারা ওই নিশ্চিন্ততার অজ্ঞাতে তিলে তিলে যা জমে চলেছে—প্রায় বিদ বাষ্পই। পিসিমা 'পাজী', এইটুকুই জানা।

এ আবার কী আদিখ্যেতা। সারা বাড়িতে এত ছেলেপুলে, একটির সঙ্গে সর্বক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস কিসের ? লুডো খেলার আর সঙ্গী জোটে না ওই পাকাপকাম ছোঁড়াটা ছাড়া ? ছোঁড়াও আচ্ছা মেয়েন্যাকড়া বটে। তাই ব' বলি কি, বোনেদের সঙ্গে তো এতো কিছু দেখি না। ব্যাপারটা ভাল না।

একেবারে দূষ্য কিছু, একথা কেউ বলতে আসছে না, তবে অসৈরণও সওয়া যায় না। আর বাড়ির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা পিসিমা, যাঁর কাছে জ্যাঠামশাই পর্যন্ত নাবালক, তাঁর তো আবার অসৈরণ সইবার ক্ষমতা একেবারে শূন্যের ঘরে।

অতএব হঠাৎ একদিন সেটা পড়লেন তিনি মানে বাপ্পে দেশলাইয়ের কাঠি ঠেকলো।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে তো খুব সুন্দর পবিত্র দৃশ্যের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

নতুন বৌ বলেছিল, সব সময় এত গল্প কী? তোমার লেখাপড়া নেই?

ফোটা ফুলে রোদের আঁচ।

এখন তো ছুটি!

তিনদিন পরেই তো স্কুল খুলে যাবে। একটু পড়াশুনো করবে তো?

আচ্ছা বাবা, পড়ছি পড়ছি।

ছুটে গিয়ে একখানা মলাট-ছেঁড়া বই নিয়ে এসে মহোৎসাহে শুরু করে দেয়

ছোট ছোট তারাগুলি আকাশের গায়—
মাথার উপরে বসি মিটিমিটি চায়।
আবার রজনীকালে।

নতুন বৌ সন্দেহের গলায় বলে, এ বই তোমার নিজের পড়ার বই?

না, মানে, ইয়ে—এটা ফুটকির। আমার বই একটাও খুঁজে পেলাম না যে—

সহসা সেই বিস্ফোরণ ঘটল।

পিছনে বজ্রমিশ্রিত কাংস্যধ্বনি, তা পারে কোথা থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছু আছে, এ জ্ঞান আছে আর? বইখাতা তো যমে দক্ষিণদোরে গিয়ে বসে আছে। একফোঁটা ছোঁড়া ভেতরে ভেতরে পাকা পিপনা।

ছোঁড়া বলছ যে?

বলব না তো কি দুধের সোনা বলব? হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া, সন্ধে চুলোয় দিয়ে সর্বোক্ষণ ওই বুড়ো ধিঙ্গী বৌটার গায়ে এঁটুলির মতন লেগে থাকা কেন ব্যা? আর তোমাকেও বলি বৌমা, ভদ্দর ঘরের মেয়ে, একটু শিক্ষা-সহবৎ শিখে আসোনি? ওই একটা কচো ছেলের মাথাটা চিবিয়ে খ আঁ আঁ আঁ অঁ—

* * *

ভীষণ গোবগোল তোলপাড় কাণ্ড একটু প্রশমিত হলে বেদান্তর 'কিছু না-পর বয়েসের বন্ধু' কুশে অবাক গলায় বলে, তুই নাকি তোর পিসির গলা টিপে ধরেছিলি বেদ?

বেদার স্তিমিত মূর্তিতে আবার রুদ্রের আবির্ভাব ঘটে।

ধরবো না তো কী? বুড়ী কেন বৌদিকে খারাপ কথা বলল? ধরেছি বেশ করেছি

কুশে এই বীর মূর্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে বলল, আর যদি মরে যেত ?

গেলে ফাঁসি যেতাম। মরতে আমি ভয় পাই না।

কুশে আরো হাঁ হল। বেদাকে তো বরাবর একটু হাবাগোবা বলেই জানতো, কোন্ মহামন্ত্রে এমন মৃত্যুভয়জয়ী বীর হয়ে উঠল ?

হ হল অবশ্য সবাবওলারাও। তবে তার প্যাটার্ন আলাদা। সেই আলাদার ফলশ্রুতি -ই—বাগচীবাড়ির বেদান্ত নামের দেবদূত হেন ছেলেটাকে সাবেকী বাড়ির দরদালানে মেপে সাতহাত নাকেখৎ দিতে হল, আর দু'হাতে নিজের দু'কান ধরে আধ ঘণ্টা ধরে ঘোড়দৌড় করতে হল।

কারো কাছে এক কানাকড়াও সহানুভূতি জুটল না, বরং ছোড়দি কোম্পানী ক্যাকক্যাক করে হাসতে লাগল।

সেই ফার্স্ট অ্যাটাক।

* * *

সেকেণ্ড অ্যাটাক এসে গেল তের বছর বয়েসে

এবারের প্রেমপাত্রী বেশী নয়, মাত্র বছরখানেকের বড়। বেদার মামার বাড়ির ভাড়াটেদের মেয়ে, মা-বাপ নেই, কাকা-খুড়ির কাছে মানুষ। তা এ রকম একটা বেওয়ারিশ জীবকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে বাধ্য হলে, কে আবার তার দাম উসুল করে নিতে ছাড়ে ? সংসার তো আর স্বর্গভূমি হয়ে যায় নি ?

কিন্তু বাগচীবাড়ির ওই দেবদূতের মত ছেলেটার (এখনো গোঁফ গজায় নি বলে দেবদূতত্বটি মুখলাবণ্যে পুরো বজায় আছে) মনের মধ্যে যে স্বর্গীয় চেতনা। তাই সে ওই মেয়েটার লাঞ্ছনা দেখলে কাতর হয় আর তাকে বাসন মাজতে ঘর মুছতে কাপড় কাচতে দেখলে রাগে দুঃখে উত্তেজিত হয়।

অথচ দেখতেও হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। নেহাৎ মামারবাড়িতে দুদিন বেড়াতে আসা তো নয়, 'কারে' পড়ার ব্যাপার। তার বার্ষিক পরীক্ষার মুখে, হঠাৎ বাড়ির একটা ছোট ছেলেকে জলবসন্তর শিকার হতে দেখে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল মামারবাড়িতে। সংক্রামকতার সময় পার হলেই নিয়ে আসা হবে।

কিন্তু এমনি কপালের ফের, জলবসন্তের জল গড়াল বাড়ির আরো দু'চারটি বালক-বালিকার গা বেয়ে বেয়ে। অতএব যে বেটা এর আওতার বাইরে চলেই গিয়েছে, তাকে আর এনে দরকার কী। মামারবাড়িতে, অন্য রাজ্যে নয়, যে

সেখান থেকে পরীক্ষা দেওয়া যাবে না? সাধারণ অঙ্ক, সাধারণ হিসেব। কে আর ভাবতে বসবে, আওতামুক্ত এলাকায় রেখে দেওয়ার ফলশ্রুতি তার গায়ে 'জলবসন্ত' দেখা না দিলেও বসন্তের জল এসে লেগে বসে আছে!

পরীক্ষার পড়া পড়তে-পড়তেই সে জল গড়াতে থাকে। গড়ানোর ঢাল্ পথটি এই—এই, তোর নাম কি রে?…চুপ করে রইলি যে? বোবা নাকি? নাকি কালা? শুনতে পাস না? নাম কী?

কুটি।

কুটি! কুটি আবার কী রকম নাম? মানে কী?

মানে জানি না। মা বলত 'কুট্টু', এরা বলে কুটি।

তা বলবেই তো! হ্যানস্থা করা চাই তো! এরা তোর কে হয়?

কাকা-কাকী।

নিজের?

হ্যাঁ।

এরা এতো বিচ্ছিরি কেন? তুই এইটুকু একটা মেয়ে, তোকে দিয়ে সব কাজ করায়। ঝি রাখতে পারে না?

আগে ছিল। ছেড়ে গেছে।

ছেড়ে গেছে না হাতী! ছাড়িয়ে দিয়েছে। তোকে খাটাবার মতলব।

তুমি এসব কথা বলতে এসেছ কেন?

কেন বলব না? রোজ দেখতে পাই তুই রাতদিন গাধার মতন খাটিস, আর এরা আরাম করে। তার ওপর আবার বকে।

বকে তো বকে। তুমি এসব বলবে না। শুনতে পেলে রক্ষে থাকবে না। আমি যাই।

বলে কিন্তু চলে যায় না। বোধ হয় ভাবতে বসে, কোন্ স্বর্গলোক থেকে এই দেবদূতটির আবির্ভাব?

কাল থেকে আর এত খাটবি না।

খাটব না? চমৎকার!

কেন, চমৎকার কিসের? বলবি, আমি কি মানুষ নয়? তোমাদের বুঝি ভগবান হাত-পা দেন নি?

* * *

পরিচয়ের প্রথম সোপান পার হয়ে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে এগোতে থাকে—

এই, এতবড় ধাড়ি মেয়ে ইস্কুল যাস না যে ? এমা ! হঠাৎ কাঁদলি যে ? কী বলেছি শুনি ? এত বড় মেয়ে ইস্কুল যাস না, শুধু তো এই বলেছি। বেশ বাবা, বলব না।

বলবে না কেন ? তুমি তো ভাল ভেবেই বলছ ?

তবে ? যাস না কেন ? তোর ওই খুড়তুতো বোনটা তো যায় ?

আমি ইস্কুল গেলে এতো সব কাজ করবে কে ?

তা বলে তুই ইস্কুল যাবি না ? গোমুখ্যু হয়ে থাকবি ? কেন, তোর ওই কাকী পারে না কাজ-টাজ করে নিতে ? তুই রান্না করবি, ঝিয়ের কাজ করবি, দোকানে যাবি, লণ্ড্রীতে যাবি—সব সময় কাজ আর কাজ। খেটে খেটে মরে যাবি নাকি ?

মরে গেলেই তো বাঁচি। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ যে ?

বলতে বলতে পা চালায়।

দোকানে পাঠায়, লণ্ড্রীতে পাঠায়, এটা তো শাপে বর। তবু তো বাইরের জগতের মুখ দেখতে পায়। আর বেদান্ত নামক হৃদয়বান বালকটির এইসব হৃদয়ঘটিত কথা বলার সুযোগ ঘটে।

তুমি যাও তো ! আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ কী জন্যে ?

আসছি আমার খুশি। রাস্তাটা কি তোর কেনা ?

ঠিক আছে, ওই ও ফুটপাথ দিয়ে যাওগে।

তোর হুকুম নাকি ? আমার যেখান দিয়ে ইচ্ছে যাব !

বেশ, তাহলে আমার সঙ্গে কথা কইতে আসবে না।

কথা কইতে আসব না ? ওঃ, ঠিক আছে। আমার কথায় তোর রাগ হয়, আগে বললেই হতো।

বোকার মতন কথা বোলো না। রাগ হয় বলেছি ? বলছি লোকে নিন্দে করবে।

বেদান্ত থমকে যায়। বোধ হয় অতীতের সেই মেপে সাত হাত নাকেখৎ দেওয়ার ছবিটি চোখে ভেসে ওঠে।

লোকেরা তো এই রকমই বটে। নিজেরা নিষ্ঠুর হবে, মায়াটায়া করবে না, আর কেউ তাকে একটু মায়াদয়া করলেই—

থমকে গিয়ে বলল, জানি। লোকেরা ওই রকমই পাজী। তা হোক গে। আমি বলে দিচ্ছি, তুই বাড়ি গিয়ে বলবি ইস্কুল যাবি। লেখাপড়া করবি।

তুই তো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিলি বললি সেদিন!

পড়ে তো ছিলাম। এখানে চলে আসার পর আর মাইনে দেওয়া হল না—নাম কাটিয়ে দিল।

মাইনে দেওয়া হল না?

ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে হৃদয়বান বেদান্ত বাগচী।

কাল থেকে তুই হাঙ্গার-স্ট্রাইক করবি, বুঝলি? একদম লাগাতার অনশন ধর্মঘট!

ফুটির রোগা কালো হাড়-বার-করা মুখে একটু ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে, তাহলে তো ওদের বড্ড ক্ষেতি! দুঃখে একেবারে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবে! বরং খাবারগুলো বাঁচছে বলে আহ্লাদে ভাসবে।

উঃ, এত পিশাচ কেন রে ওরা?

ভগবান জানে। আঃ, তুমি এত দেরি করিয়ে দাও! এক্ষুনি চিনি আর হলুদগুঁড়ো দরকার!

* * *

এই খবরদার, এক্ষুনি বাড়ি ফিরবি না। বলবি সিনেমার টিকিটের অনেক লম্বা লাইন। ওরা মা-মেয়েতে মিলে মজা করে সিনেমা দেখবে, আর তুই কষ্ট করে টিকিট কিনে নিয়ে যাবি! আহ্লাদ! চলে আয়।

চলে যাব মানে?

আয় না। ওদিকে ফুচকাওলা এসেছে।

এসেছে তো কি! আমার কাছে যেন পয়সা আছে!

আমার কাছে অনেক পয়সা আছে।

থাকল তো থাকল। রাস্তায় কত লোকেরই তো পকেটে পয়সা আছে।

ওঃ, আমি ওই রাস্তার সব লোকেদের সঙ্গে সমান? ঠিক আছে, বুঝেছি! গোড়া থেকেই দেখছি—

হন হন করে চলতে শুরু করে।

অগত্যাই ফুটিকে লোকলজ্জা বিসর্জন দিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে হয়, এই, এই, কী হচ্ছে কী? ওঃ, বাবুর কী রাগ! ঠাট্টা বোঝে না! দাঁড়াও-বলছি!

* * *

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া চলে না। কে আবার দেখতে পেয়ে ফুটির খুড়তুতো বোনটাকে লাগিয়ে দেবে গিয়ে। তার তো পাড়াসুদ্ধ সকল মেয়ের

সঙ্গেই ভাব। একই স্কুলের তো।

অতএব পার্কের বেঞ্চে বসে হুশহুশ করে তেঁতুলজল খেতে খেতে দেবদূত তার আলো ফোটা মুখে বলে, রোজ আসবি এখানে, আমি তো রোজই যা ইচ্ছে কিনে কিনে খাই। মামারবাড়ি পড়ে থাকতে হচ্ছে বলে বাবা টাকা দিয়ে যায়। দুজনে মিলে সাঁটা যাবে।

কুটি হঠাৎ আবার সেই শীর্ণমুখে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে ওঠে, তুই তো একটা পুঁচকে ছেলে, তোর পয়সায় কেবল খাবো কেন রে?

আমি পুঁচকে ছেলে? তুই বড্ড বড়!

না তো কী! তোর থেকে আমি পুরো এক বছরের বড়, বুঝলি?

অবস্থা-দৈন্যে আর স্বভাবগত-দৈন্যে কুটি এতদিন এক বছরের ছোট (মাথায় অবশ্য আধ হাত উঁচু) ছেলেটাকে 'তুমি' করেই কথা বলতো (যদিচ ছেলেটা প্রথম সম্বোধনেই তুই করেছে), আজই হঠাৎ তুই বলে বসল। তার সঙ্গে ওই হাসি।

অতএব বেদান্ত নামক হৃদয়বান ছেলেটির হৃদয়ের পর্দাব আরো খানিকটা ফাঁসল।

ওঃ, এক বছরের বড় হয়েছিস বলে একেবারে রাজা হয়ে গেছিস! রোজ আসবি বলে দিচ্ছি, ব্যাস। বাড়িতে কে তোকে যে কত দেয়, তা খুব জানি। এই তো সেদিন ছাত থেকে দেখলাম, তোর কাকা একগাদা কচুরি না কি যেন নিয়ে এল শালপাতার ঠোঙায় করে, তোকে মাত্র একটা দিল। নিজেরা গাদা গাদা খেল।

আমি বেশী খেতেই পারি না।...এই তোর না পরীক্ষা? এত সময় নষ্ট করিস যে?

ধ্যেৎ, পরীক্ষা বলে সারাক্ষণ পড়ব নাকি? পরে রেজাল্ট দেখিস। ফার্স্ট না হলেও সেকেণ্ড তো হবোই। আমার এক বন্ধু ভবেন হচ্ছে ফার্স্ট বয়, আমি সেকেণ্ড। তবে দু-একবার বদলেও গেছে।

*   *   *

এই, তুই সব সময় ছেঁড়া-ছেঁড়া ফ্রক পরে থাকিস কেন রে? রাস্তায় বেরোতে লজ্জা করে না? যাব্‌, বাবাঃ, অমনি চোখ দিয়ে জল! তোর মতন এমন ছিঁচ-কাঁদুনে পৃথিবীতে আর দুটো নেই। কাঁদার কী হল? বুঝেছি, ওরা কিনে দেয় না! আমি একদিন তোর ওই কাকীকে বলব।

সর্বনাশ। কী বলবি ?

বলব, আপনাদের লজ্জা করে না বাড়ির মেয়েকে এইভাবে রাস্তায় বেরোতে দিতে। দেখলে মনে হয়, কারুর বাড়ির কাজ করার মেয়ে।

খবরদার বলছি, এসব বলতে যাসনে। তুই কি আমার খুন হওয়া দেখতে চাস ?

কী ? এর জন্যে খুন করবে তোকে কাকী ?

কাকী না করুক, নিজেই হতে হবে হয়তো।

উঃ, কী দুঃখী তুই। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আর তোর শান্তি-সুখ নেই।

বিয়ে। হি হি হি। ওই আনন্দেই থাক।

কেন ? বড় হলে বিয়ে হবে না ?

এই কালো-কুচ্ছিত মেয়েটাকে কে বিয়ে করতে আসবে শুনি। তায় আবার বাপ-মা নেই, টাকাপয়সার ব্যাপারে কাঁচকলা।

তোর কাকীর মেয়ে বুঝি খুব সুন্দর ? তার বিয়ে হবে না ?

সে আলাদা কথা। অনেক টাকা খরচ করবে কাকা।

ইস, আমি যদি হঠাৎ খুব বড় হয়ে যেতাম রে।

* * *

সমাজজীবনে পিসির যা পজিশান, মামীর তো তা নয়। অনাথ অসহায় ঘাড়ে-পড়া ভাগ্নে হয়, আলাদা কথা। এ হল কেষ্টবিষ্টু ননদাইয়ের রাজার বেটার মত বেটা, দরকারে পড়ে মামারবাড়ি রয়েছে, মামা-মামী তাতে কৃতার্থ। তবে অসৈরণ বলে সেই যে কথাটা আছে, সেটার হাত এড়ানো শক্ত। তাই মামীও আর থাকতে না পেরে মুখটি খুললেন। অবশ্যই পিসির স্টাইলে নয়, তবে বক্তব্যের বিষয়বস্তু একই।

যার ছাগল সে যদি ল্যাজে কাটে, তোমার কী বাবা ? ওদের মেয়েকে ওরা মারুক কাটুক খাটাক, তুমি কেন বাবা তাই নিয়ে মাথা ঘামাও ? তুমি একফোঁটা ছেলে, হীরো হতে চাইলে চলবে কেন ? একটা পরের মেয়ে, তুমি যাচ্ছ তাকে পার্কে নিয়ে গিয়ে ঝালমুড়ি অবাক-জলপান, ফুচকা খাওয়াতে। তুমি তাকে ডেকে ডেকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছ—অত কাজ করিস না, এ সব ভাল ?

মুখে বালকের লাবণ্য, কিন্তু লম্বায় বাগচীবাড়ির ধারায় এখনি কর্তাদের মাথায় মাথায়। তাই উত্তেজিত হলে আর বালক লাগে না। কিন্তু

২

কথাগুলো ?

আর ওরা যা করে খুব ভাল, কেমন ? জানো তুমি, ইস্কুলের মাইনে না দিয়ে দিয়ে নাম কাটিয়ে দিয়েছে ?

সে ওরা বুঝবে।

ওরা বুঝবে ? চমৎকার! খুব বুঝদার ওরা! লেখাপড়া না শিখলে ওর পরে কী দুর্দশা হবে, বুঝেছ ? ওরা ওইটুকু একটা মেয়েকে দিয়ে কতো কতো কাজ করায় জানো ? তার ওপর আবার দিনরাত বকুনি। ওর সঙ্গে একবয়েসী ওই বোনটা, যেটা নাচতে নাচতে ইস্কুলে যায়, সে কী করে জানো ? ভাবতে পারো ? ওর জামাটামা ইস্ত্রি করা না থাকলে, কি জুতো পরিষ্কার না থাকলে কুটুর চুল টেনে দেয়। বলে, সারাদিন করিস কী ? এটুকু কাজ করে রাখতে পারিস না ? শুনে তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

মামীর কণ্ঠ উদাস, হলেই বা কী করছি বল ? আমাদের আর কী অধিকার আছে কিছু বলতে যাবার ?

বেদান্ত আত্যন্ত উত্তেজিত হয়। কড়া গলায় বলে ওঠে, কেউ কারো ওপর অত্যাচার করছে দেখলে মানুষ মাত্রেরই অধিকার আছে প্রতিবাদ করবার। আমাদের হেড স্যার বলেছেন, পশুদের প্রতি পর্যন্ত অত্যাচার অবিচার করবার আইন নেই। করলে শাস্তি হয়।

মামী মুচকি হেসে বলে, তাই বুঝি ? জানতুম না। তবে মেয়েমানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার করলে শাস্তি হয় না, এটা জানি।

তুমি হাসছ ? ওঃ, সব্বাই দেখছি এক! কারুর মধ্যে মায়াদয়া নেই!

মামী কষ্টে হাসি চেপে বলে, তাই হবে। তবে তোমার এই দয়ামায়া দেখাতে যাওয়ার বহরে মেয়েটার দুর্গতি আরো বেড়েছে।

মানে ?

মানে ওর ওই রাস্তায় বেরিয়ে দেরি করা, পাড়ার ভাগ্নের সঙ্গে গপ্পো টপপো করা জানতে পেরে কাকা রাগারাগি করছে। বলছে পাড়ার ভাগ্নে না হয়ে ছেলে হলে দেখিয়ে দিতাম।

ইস্, দেখিয়ে দিতেন! ভারী একেবারে। ওর কী দোষ ? আমিই তো জোর করে বসিয়ে রাখি। আরো রাখবো। গেলেই তো সেই গাধার মত খাটা আর বাড়িসুদ্ধ সকলের কাছে বকুনি খাওয়া!

তুমি তো মহত্ত্ব দেখালে বাবা, কিন্তু মেয়েটার ? ওদের হাতেই তো থাকতে

হবে। কাকা নাকি একদিন ধরে মেরেছে—

অ্যাঁ, মেরেছে ?

তাই তো শুনলাম। বলেছে নাকি, ফের যদি কোনদিন ওই লক্কাপায়রা ছোঁড়াটার সঙ্গে কথা বলিস—

ছোঁড়া! লক্কাপায়রা ছোঁড়া!

আবার সেই অপমানকর অশালীন উক্তি!

ছোঁড়া বলেছে ?

বলেছে তো। ছাখ না অসভ্যতা। বলে কি জানিস ? তেরো বছর বয়েস ওর পাঁচ বছর আগে ছিল। এখন আঠারোর এক পয়সা কম নয়। নীচু ক্লাসে পড়ে তাই বয়েস কমিয়ে বলে।

বলেছে এই সব কথা ?

বালসুলভ লাবণ্যময় মুখ এখন স্রেফ কুলিস-কঠোর।

বলছিল তো, ইচ্ছে করে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে। কী অভদ্র বল্! মামীর মুখ করুণ।

ঠিক আছে। বলা বার করছি।

এই ছাখো, তুই আবার কী করবি ? এইটুকু ছেলে—ওই বাঘা লোক একটা!

ওঃ, এইটুকু ছেলে বলে অপমান সয়ে যাবে ? বাঘা! বাঘার ওপর সিংহ আছে। তবে আমিই দেখে নেব—রাস্তায় তো বেরোবে।

মামী ভয় পেয়ে মামাকে জানাল।

কিন্তু মামা ভাগ্নেকে ডেকে সদুপদেশ দেবার আগেই সেই বাঘা বাজার থেকে ফেরার পথে কলার খোসায় পা পিছলে আছাড় খেয়ে সটান হাসপাতালে পৌঁছে গেছে।

এক হাতে বৃহৎ বৃহৎ কপি বেগুন মুলোর সঙ্গে আলু রাঙাআলু শাক সীমের প্রাণভরা সম্ভার, অন্য হাতে ছুৎমার্গ বাঁচিয়ে মাছের থলি। আর রবারের চটির তলায় মর্তমানের খোসা। এই ত্রিশক্তি যোগে হাঁটুদুটো গেল।

আকস্মিক পথ-দুর্ঘটনা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। দুর্ঘটনার উপকরণটি নিমিত্ত মাত্র। হরদমই এমন ঘটছে হাটে মাঠে বাটে। তত্রাচ লোকে এই অতি স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে থেকে দুর্ঘটনার নায়ককে আবিষ্কার করে বসল।

ফলে বাগচীবাড়ির জলবসন্তের জের না মিটতেই বেদান্ত বাগচীকে মামা-

বাড়ি থেকে ফিরে আসতে হল। এবারের প্রেসক্রিপশানে কানমলা, নাকেখৎ-এর প্রয়োগ না হলেও, জ্যাঠা বলল, এ ছেলের ওষুধ হচ্ছে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চাবুক। চাবুকের চোটে ছাল ছাড়িয়ে ফেলা।...বাবা বলল, জীবনে আর কখনো মামারবাড়ি যেতে চেয়ো।...মা বলল, গতজন্মে কত পাপ করেছি, তাই এই ছেলেকে পেটে ধরেছি।

পিসি বলল, তোমরা আজ চেনো বাবা, আমি ও ছেলেকে অনেককাল আগেই চিনেছিলাম।

জেঠি বলল, মাকালফল।

খুড়ি বলল, রাঙামুলো।

এ ও সে পাঁচজনে যার যা খুশী বলল। তেরো বছরের ছেলে প্রেমের দায়ে মানুষ খুন করতে পিছপা হয় না, এমন কথা ইতিপূর্বে তো কেউ শোনে নি। কাজেই অনেক মৌলিক মৌলিক কথা শোনা গেল।

এই সমস্ত ইতিবৃত্ত আজন্মের বন্ধু 'কুশের' জানা। বেদান্ত নিজেই সমস্ত বলেছে বন্ধুর কাছে। মায় ডায়লগ পর্যন্ত। মানে প্রত্যেকের।

তবে কুশে এতটা সমর্থন করতে পারে নি।

কুশের অভিমত, পৃথিবীতে কত সব অত্যাচার হচ্ছে, তুই কিছু করতে পারবি? তবে? শুধু শুধু একটা লোককে খোঁড়া করে দিয়ে কী আর লাভ হল?

ক্রুদ্ধ বন্ধু বলল, শুধু শুধু?

না, মানে ইয়ে...

যাক, তোকে আর ইয়ে বোঝাতে হবে না। জানিস, সব সময় ওর ওই বোনটার পুরনো জামাগুলো পরতে দেয়।...উঃ, আমার যদি অনেক টাকা থাকতো!

কুশে হঠাৎ চমকে উঠে বলে, বেদা!

কী?

তোর কী ভালবাসা হয়েছে? মানে প্রেম-ট্রেম?

বেদান্ত বিচলিত গলায় বললে, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই বল্ না। তুই কবিটবি মতন হয়েছিস, তোরই বোঝা উচিত।

হ্যাঁ, কিছুদিন যাবৎ কুশের খাতার পাতায় কবিতার পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। মামারবাড়ি যাবার আগে বেদান্ত কিছু কিছু দেখে গিয়েছিল এবং অবাক হয়ে বলেছিল, এইসব কথা লিখেছিস তুই? নিজে? কিন্তু কি নিয়ে লিখেছিস

ঠিক বুঝতে পারছি না তো। বুঝিয়ে দে তো।

কুশে অপ্রতিভভাবে বলেছিল, স্থাখ, আমিও ঠিক বুঝতে পারি না। কীরকম-ভাবে যেন মনে এসে যায়, কীরকমভাবে যেন লেখা হয়ে যায়।

তারপর তো পাড়ায় ওই জলবসন্ত।

বন্ধুর মামারবাড়ি যাত্রা। কুশের পিসির বাড়ি। কারণ দুজনেরই তো একই সমস্যা। অ্যানুয়াল পরীক্ষার মুখোমুখি।

তা পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে ঠিকই। ভালই হয়েছে।

তবু তার ফাঁকেই একজন বৃহৎ একটি কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের ইতিহাস রচনা করে বসে আছে। যার শেষ অধ্যায়ে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ।

এদিকে অন্যজন ইত্যবসরে বৃহৎ একটি খাতা পুরো ভরিয়ে ফেলেছে মিল এবং ছন্দ বিহীন স্বচ্ছন্দ কবিতায়। যা দেখে বন্ধু অবাক বিস্ময়ে বলেছে, হ্যাঁরে এও তো প্রেম-ট্রেম নিয়ে লেখা হয়েছে মনে হচ্ছে!

যে লিখেছে সে বলল, ধ্যেৎ!

তবে কী নিয়ে? এই যে লিখেছিস, কে তুমি? যখনি আমি একা থাকি, কে তুমি নিঃশব্দে আমার কাছে এসে দাঁড়াও।···আমার চুলে তোমার স্পর্শ পাই। তখন বুকের মধ্যে ভয়ানক একটা আনন্দ হতে থাকে। না না, ভয়ানক একটা যন্ত্রণা।···যন্ত্রণা আর আনন্দ। আনন্দ আর যন্ত্রণা। আশ্চর্য, কে তুমি?···তা এই তুমিটা কে?

তা কী জানি!

বাঃ, নিজে লিখেছিস, নিজেই জানিস না?

দেখ, সে তোকে ঠিক বোঝাতে পারব না! সত্যিই মনে হয় কে যেন আমার কাছে এসে দাঁড়ায়!

বেদান্ত বন্ধুর এই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু আগুন কখনো আঁচলচাপা থাকে না।

রায়বাড়িতে কুশের এই অকালপক্কতার খবর কেমন করেই যেন বাগচীবাড়ি পৌঁছে গেল এবং যেন এতদিনে সকলের চোখের সামনে থেকে অন্ধকারের পর্দা সরে গেল। ওঃ, তাই! পবিত্র বাগচীর বাড়ির ছেলের এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ এই ওই অকালপক্ক ছেলেটি! ঐ ছেলের সঙ্গে মিশলে আর এই পরিণাম হবে না?

জন্মাবধি মিশে আসছে?

তাতে কী ? শৈশবাবধিই তো প্রেমে পড়ে আসছে।

কিন্তু নেশা বন্ধ করার উপায় বা কোথা ?

বাড়ির দেয়ালে বাড়ি, একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়া, এবং অতঃপর একই সঙ্গে সগৌরবে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে সগৌরবে কলেজে প্রবেশ।

মুস্কিল তো ওইখানেই। গার্জেনদের মুখ বন্ধ করে দেবার এই এক উপায় আবিষ্কার করে বসে আছে দুটো ছেলেই।

যে ছেলেদের লোকে বলছে 'হীরের টুকরো', তাদের কী করে বলা যায়, লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছিস। অথচ এই বয়সে প্রেমে পড়া তো বটেই, প্রেমের কবিতা লেখাও কি উচ্ছন্নে যাবার নামান্তর নয় ?

তবু খাতায়-কলমে প্রেম এক ব্যাপার, কিন্তু হাতে-কলমে ? কেলেঙ্কারি ছাড়া আর কী। অথচ যে ছেলের ঠাকুর্দার নাম ছিল 'উপনিষদ বাগচী', বাবার নাম 'সাংখ্য', জ্যাঠার নাম 'পতঞ্জলি', আর নিজের নাম বেদান্ত, সে আশৈশব করেই চলেছে সেই কেলেঙ্কারি।

তৃতীয় আক্রমণ বছর-উনিশে।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অতএব এহেন সময়ে স্বভাবতই সহাপাঠিনীর প্রেমে পড়া চলে।

তাছাড়া এক্ষেত্রে সহপাঠিনীরাই তো পড়বার জন্য নদীর কিনারায় এসে দাঁড়াতে উৎসুক। একেই তো নামটা আকর্ষণীয়, ঝাঁকে মিশে যাবার নয়, তায় আবার—বাগচীবাড়ির ধারা আনুযায়ী দীর্ঘোন্নত চেহারার সঙ্গে মায়ের রং আর মুখলাবণ্য। এখনো সেই দেবদূতজনোচিত অপাপবিদ্ধ মুখ আর আলো-ঝলসানো হাসি।

কিন্তু ছেলেটার জন্মলগ্নেই যে উৎকট গ্রহ। তাই একঝাঁক সহপাঠিনীর মুগ্ধদৃষ্টির আওতা-মুক্ত হয়ে সে কিনা গড়িয়ে পড়তে গেল এক সহপাঠিনীর বিধবা বৌদির পায়ে। তাও খোঁড়া। বিয়ের পর মধুচন্দ্রযাপন করতে গিয়ে ট্রেন-অ্যাকসিডেন্টে স্বামী এবং একখানা পা হারিয়ে ফিরে এসে যে মেয়ে বাপেরবাড়ি বলে কিছু না থাকায় শ্বশুরবাড়িতেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

একটা পা কাঠের। তাই নিয়েই টেনে টেনে চলে—ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে থাকে গবেষণার মালমশলা সংগ্রহ করতে। বিয়ের আগে থেকেই এ কাজে হাত দিয়েছিল, মাঝখানে বহু বিপর্যয় পার হয়ে আবার অধীত কাজে হাত দিয়েছে। বলতে গেলে জীবনের অবলম্বন হিসেবেই। সেই মেয়ে।

এ বাড়িতে বেদান্তর প্রবেশাধিকার ঘটেছিল অবশ্য একদা সহপাঠিনীর আগ্রহাতিশয্যে। সহপাঠিনীর মাও দেখে মুগ্ধ বিগলিত। এমন কি ঠাকুমাও।

ঠাকুমার মন্তব্য, আহা যেন গৌরাঙ্গ অবতার! প্রশ্ন, কী জাত বৌমা? এখন থেকেই যদি—

বৌমার উক্তি, জাতি তো আমাদেরই ব্রাহ্মণ। তবে আমাদের পক্ষে বামন আর চাঁদ।…মস্ত বড়লোকের ছেলে। গাড়ি করে কলেজে আসে। আর রূপ তো দেখছেনই। সে জায়গায় আমার মধুমিতা কিছুই না।

ভরসা শুধু মেয়ের আগ্রহ আর মায়ের হাতের চা এবং টায়ের প্রাচুর্য। মেয়ে কতটা কী করে উঠতে পারবে ভেবে মা নিজেই আসেন হাল ধরতে।

হঠাৎ একদিন চায়ের জমজমাট মজলিশ থেকে চোখ গেল পাশের প্যাসেজের দিকে।

আদ্যোপান্ত চমকে উঠল বেদান্ত বাগচী নামক উৎকট লগ্নে জাত ছেলেটা। বললো, উনি কে?

সহপাঠিনীর নীরস সংক্ষিপ্ত উত্তর, আমার বৌদি।

বৌদি! এ-বাড়িতে থাকেন?

আর কোথায় যাবেন?

না, মানে দেখিনি তো কোনদিন। তোমার যে কোন দাদা আছেন, তাও জানতাম না।

দেখে কি মনে হল, দাদা আছেন?

বেদান্ত থতমত খেল। দেখে কী মনে হবে? দাদার থাকা না থাকার চিহ্নটা কী? সাবেকী বাড়ির ছেলে বেদান্ত বৈধব্যের থানধুতিটা বোঝে, কিন্তু তা তো ঠিক মনে হল না!

এখন সহপাঠিনীর মা আরো নীরস আরো বিরস গলায়, সংক্ষিপ্ততর ভাষণে ওই উনি'র ইতিহাসটি বিবৃত করে বললেন, আমার এই এক দুর্ভাগ্য! ছেলে তো চলে গেলই, তার ওপর মাথায় এই বোঝা চেপে রইল। দারুণ জেদী। ঢের বারণ করা হয়েছে, ঘরে বসে যা পারো করো, এইভাবে বাসে-ট্রামে যাতায়াত! তা হিতকথা শোনবার পাত্রী নয়। শুধু আমাদের লোকসমাজে লজ্জায় ফেলা।

কিন্তু পায়ের তো খুব অসুবিধে দেখলাম। শহরের এই ভীষণ রাস্তা, একা যাওয়া তো বিপদ।

তা সঙ্গে আর কে যাবে বল বাবা? মধুর বাবার তো একতিল সময় নেই,

আমার ছোট ছেলে খড়গপুরে পড়ে—

সত্যি প্রবলেম।

কিন্তু এই 'প্রবলেম' বলে ছেড়ে দেওয়া যায়?

অতঃপর কেবলই দেখা যেতে লাগল বেদান্ত বাগচীর গাড়িতে একটা রোগা পাতলা চেহারার সাদা শাড়ি পরা মেয়ে। এতটা রোগা না হলে হয়তো 'ছবি-ছবি' চেহারা বলা চলতো, কিন্তু আপাতত কাঠি-পাকাঠি। তাও যা হোক, গাড়ি থেকে নামা-ওঠার সময় মালুম হয় মেয়েটার পা রীতিমত খারাপ। কোনমতে টেনে টেনে চলে। অর্থাৎ খোঁড়া।

গন্তব্যস্থল?

ন্যাশনাল লাইব্রেরী।

বন্ধুদের চোখে পড়ছে দৃশ্যটা। এও চোখে পড়ছে, বেদান্তর প্রায়ই কলেজে ক্লাস কামাই। তবে! একদিন তো চেপে ধরতেই হয়।

নাঃ, আর কিছু নয় বাবা! স্রেফ জীবে দয়া।

বন্ধুরা হাসে।

দয়া করবার জন্যে আর জীব খুঁজে পেল না যাদু! তরুণী বিধবা?

তা দয়াই বা বলার কী আছে? মানবিকতা বলে একটা জিনিস নেই? একটা অসহায় মেয়ে বাড়িতে, এই সভ্যকালেও "অপয়া" বলে রাতদিন হ্যানস্থা খায়। সব দুঃখ সয়ে নিজে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। তার জন্যে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া কি খুব বেশী?

বেদান্তব কী ওর জন্যে গাড়ির তেল আলাদা করে পুড়ছে? বেদান্তও তো বরং এই সুযোগে ভাল ভাল লাইব্রেরীতে ঢুকে পড়ে নিজেও যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

যুক্তি শুনে অবশ্য বন্ধুদের চৈতন্যোদয় হয় না। মুচকি হাসে। কিন্তু ওই-খানেই তো আর শেষ হয় না।

সমাজ-সংসার এত উদার নয় যে মানবিকতা দেখাবার প্রেরণা পেলেই তুমি সেটি দেখাতে বসবে। যাকে দেখাতে বসছ, সংসারে সে দুঃখিনী হতভাগিনী হ্যানস্থার পাত্রী কিনা সেটা সংসার বুঝবে, তাই বলে তোমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা বরদাস্ত করবে নাকি?

হতে পারো তুমি ধনবান গাড়িবান, তাই বলে তুমি আমার বাড়ির বিধবা বৌকে জোর করে করে লিফট দেবে?

'দিদি' ডাকছ তো মাথা কিনছ। অমন দিদিটিদি ঢের দেখা আছে। বয়েসে

পাঁচ-সাত বছরের বড় ? ফোঃ ! জেঠির বয়সীও দেখতে কসুর নেই লোকের ! গাড়ির দেমাকে ধরাকে সরা দেখছেন ! দুমদাম চলে এসে 'চলুন চলুন' আবদার !

হ্যাঁ, বাড়ির কুমারী মেয়েটাকে এ ডাক ডাকতে, আলাদা কথা। সে আশায় যদি ছাই পড়েছে দেখা যায়, রেয়াৎ করা হবে তোমাকে ?···এতটা যে এগিয়ে পড়তে পেরেছ, জেনো সে ওই আশাটুকু ধুকধুক করার কারণে। তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেই ধুকধুকুনিটা থেমেই যাচ্ছে, গেল ! তবে ? তোমার ধুদ্ধুড়ি নেড়ে দেওয়া হবে না ?

এদিকে কলেজেও ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে জটলা, মৃদু গুঞ্জন, মুখ-টেপা হাসি। অতঃপর সোচ্চার। আন্দোলন। ওই বদ ছেলেকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার দাবি !

প্রতিহিংসায় জর্জরিত হিংস্র নায়িকা মধুমিতাই এই আন্দোলনের নেত্রী। দাবির ভাষাও তার। প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে জ্বলন্ত ভাষায় নিবেদন, সেও তো তারই। তারই তো পবিত্র বংশের সুনামে কালি।

নির্মল সরল চিত্ত নিয়ে সহপাঠীকে বাড়িতে ডেকে নিয়েছিল সে—বাড়িতে পুত্রশোকাতুরা মায়ের শোকে সান্ত্বনা দিতে। সান্ত্বনা তিনি পাচ্ছিলেনও। কিন্তু ভাগ্যচক্রে হঠাৎ পাশার দান উল্টে গেল। করুণা দেখাবার ছল করে—ন না, এই বয়েসে এরকম চরিত্রহীন এ ছেলের সঙ্গে তারা এক কলেজে পড়তে পারবে না। পড়বে না। কর্তৃপক্ষ যদি অবহিত না হন, অপর পক্ষের হাতে তো ব্রহ্মাস্ত্র আছেই। একযোগে স্টাইক। দেখি কেমন সোনার কার্তিক ছেলেটিকে কলেজে রাখেন ওঁরা !

পবিত্র বাগচীবাড়িতে আবার এই এক ক্লেদাক্ত অশনিপাত !

এখানেও প্রায় একই প্রশ্ন। বাবা বলল, লেখাপড়ায় একটু ভাল বলে কি তুমি আমাদের মাথা কিনে বসে আছো ? বারে বারে বাড়ির মুখ হেঁট ! ভেবেছ কী তুমি ? সেই একটা অজানা অচেনা লোক এসে আমায় কী যাচ্ছেতাই করে গেল, তা জানো ?

মা বলল, এই ছেলের জন্যেই আমায় একদিন গলায় দড়ি দিতে হবে !

পিসি বলল, বুকের পাটার কী সীমে-পরিসীমে নেই গো। এই বয়েসে এতো দুঃসাহস। ভদ্দরঘরের একটা বৌকে ঘরের বার করে নিয়ে এসে বাসভাড়া করে রাখা ! মা মা মা, কোথায় যাবো গো !

ভাইপো রক্তচক্ষে বলল, বাসাভাড়া মানে ? যা খুশী বলবে না বলছি !

পিসি ডাক ছেড়ে বলতে লাগল, একফোঁটা ছেলে, এখনো এককুড়ি বয়েস হয় নি, এক্ষুনি অ্যাত্তোখানি কুলোপানা চক্কর ! আঁ্যা ! তুমি লক্ষীছাড়া ছেলে, যা খুশী করে বেড়াবে, আর লোকে বললেই যত দোষ। তুই বার করে নিয়ে আসিস নি ওদের বৌটাকে ?

অসহ্য ! কেবল খারাপ খারাপ কথা ! যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে এসো না···

কিন্তু যে বোঝে সেও তো বলল, ইডিয়ট ! আবার ম্যালেরিয়া ? আবার কাঁপুনি ? আবার অবৈধ প্রেমের নায়ক ?

ছাখ কৌশিক, তুইও যদি বোকার মত কথা বলিস, বলার কিছু নেই।

কলেজে 'কুশে' বলা চলে না, তাই কৌশিকটাই অভ্যেস হয়ে গেছে ক্রমশ। ওদিকেও বেদার বদলে পুরোপুরি বেদান্তই।

কৌশিক বলল, চমৎকার ! বোকামির চরম করছিস তুই, আর কলেজে তোর নামে কী চলছে জানিস ? দেয়ালে দেয়ালে ছড়া লেখা হচ্ছে কাঠকয়লা দিয়ে। মধুমিতাটা—

জানি, ওই জন্যেই তো কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।

কলেজ ছেড়ে দিয়েছিস ?

তা কী করব ? ওরকম ছোটলোকের জায়গায় থাকার কোনো মানে হয় ?

তোর হিসেব ধরলে পুরো পৃথিবীটাই তো ছোটলোকের।

কারেক্ট।

কিন্তু এই অভাগা জায়গায় যখন থাকতেই হচ্ছে, এদের নিয়ম-টিয়মগুলো তো মানতেই হবে !

আচ্ছা কী করে মানা যায় বল তো ?

অন্য আর কিছু না, পরের ব্যাপারে নাক না গলানো !

ইস্, তুই কবি হয়ে একথা বলছিস ?

খুব আহত হয়েছিল বেদান্ত সেদিন।

ভাবতে পারিস, একজন ভদ্রমহিলা, বিয়ের পরই হনিমুনে যেতে—

জানি। মধুমিতা কলেজে সব হিস্ট্রি বলেছে।

তবে ?

কী তবে ?

তবুও তোদের মনে দাগ কাটে না? জানিস ভদ্রমহিলা এত কষ্টের মধ্যেও 'বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা' নিয়ে রিসার্চ করছেন! কী মন দিয়ে পড়েন! দেখলে ভক্তি আসে।

ভক্তি, শ্রদ্ধা, মমতা, করুণা, দয়া, মায়া—সবই প্রায় একই গ্রুপের, বুঝলি? ওই সবের যে কোনো একটা পথ ধরেই বিপদ আসতে পারে।

এলে আর কী করব?

তা ওনাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে রেখেছিস কোথায়? শ্বশুর তো তোদের বাড়িতে এসে শাসিয়ে গেছে। পুলিস কেস করবে।

করুক। ভদ্রমহিলা নাবালিকা নন। ছাব্বিশ বছর বয়েস। অসহ্য হওয়ায় একটা লেডিজ হোস্টেলে চলে এসেছেন।

টাকা-পয়সা কে দিচ্ছে? তুই?

ওঃ, আমার ভারি টাকা! বড়লোকের বাড়ির ছেলে, ভাল খাই পরি, গাড়ি-ফাড়ি চড়ি, এই পর্যন্ত। নিজের কী আছে বল? পকেটমানিই বা কত?

তবে চলছে কিসে ওর?

আরে ওর মধ্যেই দু-দুটো টিউশানি করছেন। অথচ ওঁর হাজব্যাণ্ডের অফিস থেকে অনেক টাকা পাবার কথা ওঁর। কিন্তু তাতে ওই পাজী শ্বশুরটার সইটই চাই। তা দিচ্ছে না শয়তানটা। আমি একদিন সেই কথা বলতে যাওয়ায়, আমায় এই মারে তো সেই মারে।…গিন্নীটির সুদ্ধ কী কড়া কড়া কথা! …অথচ আগে? বাবা বেদান্ত, কাল তুমি এলে না? কাল আমি মাংসের পকৌড়া করেছিলাম, কতক্ষণ আশা করে বসে রইলাম যদি আসো! উঃ, জঘন্য!

তা তোর যেমন! কোথায় ওদের সুন্দরী আহ্লাদী মেয়ের সঙ্গে প্রেম চালাবি, আর রোজ রোজ মাংসের পকৌড়া, ডিমের হালুয়া, মাছের কচুরী খাবি—তা নয়, গেলি কিনা ওদের খোঁড়া বিধবা বৌয়ের প্রেমে পড়তে!

ক্ষেপে!

কী হল?

তুইও একে প্রেমে পড়া বলছিস?

যা সত্যি তাই বলছি।

তোদের ধারণা ভুল।

তোর ধারণাটাই ভুল।

তোর তাই মনে হচ্ছে ?

নিশ্চয়ই। আমি বলছি তুই ফেঁসেছিস।

কী জানি! তুই কবি মানুষ, ভাল বুঝিস। তবে সেই যে তুই ছেলেবেলায় লিখেছিলি, 'আনন্দ আর যন্ত্রণা', 'যন্ত্রণা আর আনন্দ' একই সঙ্গে! মাঝে মাঝে সেইরকমই যেন কী একটা ফীল করি।...আচ্ছা তুই ব্যাটা প্রেমে-ট্রেমে না পড়েও এন্তার প্রেমের কবিতা লিখছিস কী করে রে ?

কৌশিক তার এই অবোধ বন্ধুর নির্বোধ প্রশ্নে একটু হেসেছিল।

'ফেঁসে যাওয়া' শব্দটা আসলে কৌশিকেরই আবিষ্কার!

একসময় একটা কবিতায় লিখেছিল, 'এই পৃথিবীতে আমরা সবাই, রাতদিন, দিনরাত কেবল ফেঁসে যাচ্ছি। এপাশে ওপাশে যেদিকে তাকাই, ওই এক ইতিহাস।...ফাঁসছি, অথচ আবার তাতেই আহ্লাদে ভাসছি।

কিন্তু বন্ধুর ফেঁসে যাওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া, বলতে গেলে কৌশিকের এই শেষ। কারণ এক কলেজের পড়াটা তো ঘুচেই ছিল, এক দেয়ালে বসতটাও ঘুচল।

তা তখন তো বলতে গেলে বালবুদ্ধির জের চলছে।

মহান ঐতিহ্যময় বাগচীবাড়ির একান্নবর্তীতায় ফাটল ধরল। অতঃপর দ্বিধাবিভক্ত। পরিশেষে টুকরো টুকরো।

এই বৃহৎ বাড়ির বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের অন্নের যোগানদার ছিল তিন পুরুষের বিজনেস বাগচী প্রেস। ঠাকুর্দার নবকৈশোরে—একদা, অভিযান, গোয়েন্দাকাহিনী, নাটক ইত্যাদি দিয়ে শুরু। সেটাই ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিশাল হয়ে তিন ধাপ পর্যন্ত নেমে এসেছিল। কিন্তু যথারীতি তলায় তলায় চলছিল ভাঙনের খেলা।

অতএব যথারীতি তিন পুরুষের প্রেস একদিন বিক্রি হয়ে গেল। তৎসঙ্গে বাড়িও। কে কোথায় ছিটকে গেল।

আর কৌশিকও তো তখন বাংলায় এম-এ হয়ে উত্তরবঙ্গে চলে গেছে। একটা বেসরকারী কলেজের অধ্যাপনা নিয়ে।

বেদান্তর বাবা বাড়ি বিক্রির টাকার অংশ ভাগ নিয়ে যোধপুর পার্কে একটি সুন্দর শৌখিন ছোটখাটো বাড়ি বানিয়েছিলেন এবং প্রেস বিক্রির অংশ ভাগে একটি 'আর্ট প্রিন্টিং প্রেস' খাড়া করেছিলেন। তাই থেকেই তাঁর দারুণ বোল-বোলাও ঘটেছে, এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর বেদান্তর হাতে পড়েও বোল-বোলাও-এ তেমন কিছু ঘাটতি ঘটে নি।

পুরনো বাড়িটার জন্যে মাঝে মাঝে খুব মনকেমন করলেও, যোধপুর পার্কের বাড়িতে এসে বেদান্ত অনুভব করেছিল, সেই লুঙ্গি পরে ঘষে ঘষে গায়ে তেল মাখার আরামে চোখ বুজে আসা পুরুষ্ট একজোড়া ঝোলাগোঁফ সম্বলিত দীর্ঘকায় পুরুষটির স্থূল কথাবার্তা নিতান্তই স্থূল আচার-আচরণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রুচি-সম্পন্ন সৌন্দর্যপিপাসু মন নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল, কোনো একদিন 'দিন আসা'র প্রতীক্ষায়।

হয়তো চকমিলোনা দরদালানদার বিশাল বিশাল বাড়িগুলোর পাথুরে দেওয়ালে ফাটল ধরার ইতিহাসের অন্তরালে এরকমই সব—দিন আসার প্রতীক্ষার ইতিহাস থাকে লুকনো হয়তো বা অবচেতনেই। হয়তো দুটো-চারটে রাক্ষুসে উনুন গাঁথা রান্নাঘরে উদয়াস্ত ঘোরাফেরা করতে করতে কোনো দিন কোনো মহিলার চোখে ভেসে ওঠে বান্ধবীর বাড়ির ছিমছাম আধুনিক রান্নাঘরটি, যেখানে রুচি আর সৌন্দর্যবোধের পরাকাষ্ঠা।…একটি নিঃশ্বাস পড়ে। সেই নিঃশ্বাসেই হয়তো বনেদী দেওয়ালের বনেদে চিড় খায়। তবে নিঃশ্বাসের ইতিহাসটি জানতে পারলে ছিছিক্কার। অতএব দিন আসার প্রতীক্ষা।

বাবা মারা যাওয়ার পর বেদান্ত আপনমনে বলে উঠেছিল, আমরা কেউ কাউকে চিনি না। আমরা সবাই সবাইকে ভুল বুঝি।

সেই দার্শনিক বিষণ্ণতায় বাবার আরব্ধ কাজটিতে মনটা বসিয়েছিল বেদান্ত। তা তার ফলও পেয়েছিল ভালই। বাড়বাড়ন্তই চলছে তার ব্যবসার।

পরের চাকরি নয়, বাঁধাধরা কাজ নয়। অতএব বেদান্ত বাগচী বেশ সুখেই কাটায়। ভাল খায়, ভাল পরে, ভালভাবে থাকে, গাড়িটা নিয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। ছোট বোনটারও ভাল একটা বিয়ে দিয়ে ফেলেছে। কাজেই অবস্থা সুখেরই।

অতএব রূপ অটুট, স্বাস্থ্য অটুট, মানসিক প্রসন্নতা অটুট।

কিন্তু এমন রূপবান স্বাস্থ্যবান বিত্তবান পুরুষটি বিয়েয় নারাজ। যারা দেখে তারা যেন বিরাট একটা অপচয়ের সামনে দাঁড়ায়। তাই ব্যাকুল হয়, হায় হায় করে, প্রতিকারের চেষ্টায় আদাজল খেয়ে লাগে, তবে করে উঠতে পারে না কিছু। লোকটা সব অনুরোধ উপরোধ গা ঝেড়ে ফেলে দেয়।

মা তো বলে বলে হার মেনেছে। আবার কখনো বলতে গিয়ে ঘৃণায় ধিক্কারে থেমেছে। কারণ ওই হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে সমানেই মাঝে-মাঝেই হঠাৎ হঠাৎ ফেঁসে যাওয়ার ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

উত্তরবঙ্গের পালা চলাকালীন সে-সব ইতিহাসের খবর যে একেবারে পেত না তা নয়। কখনো লোকমুখে, কখনো বা হঠাৎ এক-একদিন হুটহাট নিজেই গিয়ে হাজির হয়েছে বেদান্ত। বলেছে, খুকুটা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে মার কাছে রয়েছে। তাই কেটে পড়লাম দুদিন।

অতএব কৌশিকের জানা হয়ে গিয়েছিল, কৌশিক এখানে চলে আসার অব্যবহিত পরেই বেদান্ত একটা ক্যানভাসার মেয়েকে নিয়ে বিভ্রান্ত।

কিছুর মধ্যে কিছু না। বাবা তখনো পৃথিবীতে বিরাজিত, যেমন হয় কোনো প্রসাধন দ্রব্যের কোম্পানীর নিয়োজিত তরুণী, সাবান শ্যাম্পু মাথার তেল ইত্যাদি নিয়ে করুণ কাকুতি মিনতি করছিল বেদান্ত-জননী ও বেদান্ত-ভগিনীর কাছে, যেদিন যা বেচতে পারে, তার কমিশন থেকেই তাদের সংসার চলে, মাসমাইনে বলে কিছু নেই, বাড়িতে বিধবা মা, নাবালক গোটাকতক ভাইবোন ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিজের ঘর থেকে বই পড়তে পড়তে এই আবেদন নিবেদন শুনতে পেল বেদান্ত। আর শুনতে শুনতে রাগে দুঃখে ধিক্কারে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। এইটি বুঝে যে, যে মিনতিতে পাথর গলতে পারতো, সে মিনতিতে তার মা বোনের মন গলল না। তাঁদের একই যুক্তি—নাম-না-জানা কোম্পানীর এইসব অজানা জিনিসপত্র তাঁরা ব্যবহার করেন না।

মেয়েটা মিনতিতে ভেঙে পড়তে চাইল, দু-একটা অন্তত নিন মাসিমা, না হলে আজকের দিনটা বৃথায় যাবে।

বোন বলে উঠল, কেন, আরো তো কত বাড়ি রয়েছে, যান না। আপনার তেল মেখে আমার মাথার চুল উঠে যাক, আর হিহি সাবান মেখে গায়ে মুখে ছুলি বেরোক। আপনার আর কী?

দাঁতে দাঁত চেপে শুনছিল বেদান্ত এইসব কথোপকথন।

আর পারা গেল না। বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মাকে এবং বোনকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়ে বলে উঠল, কী কী আছে আপনার কাছে?

তরুণী থতমত। এঁরা হতভম্ব।

মেয়েটার কাছে যত যা ছিল সব কিনে নিল বেদান্ত এবং গম্ভীরভাবে বলল, এসব ব্যবহার করলে যদি তোমাদের চুল পাকে, দাঁত পড়ে, গায়ের ছাল উঠে যায়, ভোম্বলের মাকে দিয়ে দিও।

ভোম্বলের মার জন্যে তুই এতগুলো টাকার জিনিস কিনলি দাদা? খুকুর

ঝঙ্কার।

বেদান্ত অবশ্য তাতে টলে না। আরো গম্ভীর হয়ে বলে, ভোম্বলের মার জন্যে নয়, তোমাদের হৃদয়হীনতার জন্যে। একটা ভদ্রবাড়িতে এরকম অমানবিক ব্যাভার! ভাবা যায় না। শুনতে শুনতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।

বোন এবং মা দুজনেই লড়াইয়ে নামল। কে মুখ বুজে সহ্য করে যাবে এত অপমান!

লজ্জা! এইসব মেয়েদের কাঁদুনিতে গলে যেতে হলে তো বাজারের মোড়ের ওই ধূপবেচা ছেলেগুলোর থলের সমস্ত ধূপগুলো কিনে নিতে হয়। তারা তো ভেউ ভেউ করে কাঁদে। এই ব্যবসায় নামার আগে এইরকম সব অভিনয় শিখে আসতে হয়। যত সব দুঃখের গাথা গাইছিল সব যদি সত্যি হতো, তাহলে আর রক্ষে থাকত না। ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের সকলেরই ঘরে হয় বুড়ো বাবা, নয় রুগ্ন বিধবা…

বেদান্ত গম্ভীরতর হয়ে বলল, মানুষ সম্পর্কে এতো অবজ্ঞা প্রকাশ মস্ত একটা পাপ। কে বলতে পারে, তোমাদেরও একদিন এ-রকম অবস্থা আসতে পারে কিনা!

দুটো মানুষকে পাথর করে দিয়ে সদর্পে প্রস্থান।

সেই জল অনেকদূর গড়াল।

মেয়েটার দুঃখগাথাটা সত্যি কি মিথ্যে? তার তদন্ত করতে, তক্কে তক্কে থেকে একদিন মেয়েটাকে পাকড়াও করে বসল বেদান্ত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি গেল।

জিত হল বেদান্তরই।

সত্যিই দীনহীন অবস্থা। যা বলেছে তার থেকে বেশী তো কম নয়।

অতএব সেইদিনের চালাব বস্তির সামনে ঘন ঘন একটা মোটরবাইক এসে দাঁড়াতে থাকে, সমস্ত পরিবেশটারই চোখ ট্যারা করে দিয়ে বাইক থেকে সিনেমার হীরোর মত, অথবা পুরনো ভাষায় রাজপুত্রের মতই একজন নেমে পড়ে ওই মালতী না ভারতী কাদের ঘরে যেন ঢুকে পড়ে ঠোঙা ঠোঙা ফল, শিশি শিশি ওষুধ, প্যাকেট প্যাকেট জামা-কাপড়ের সম্ভার নিয়ে।

আবার সেই পুরনো তুলনাতেই আসতে হয়।

আগুন কখনো আঁচলচাপা থাকে না।

বাবা বললেন, আবাব এটা কী হচ্ছে তোমার?

বেদান্ত এখন আর শিশু নয়, বালক নয়, কিশোর নয়, একদম পূর্ণ যুবক।

বাবার ব্যবসা দেখছে শুনছে। তাই বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলল, জগতে সবাই যে জোচ্চোর নয়, সেটাই প্রমাণ করা হচ্ছে।

তোমার যে বদনাম হচ্ছে, সেটা টের পাচ্ছ?

মিথ্যে বদনামে কী এসে যায়?

বাবার উক্তি, যায় বৈকি বাবা। কালে কালে এর নজির আছে। ওই মিথ্যের জন্যেই স্বয়ং সীতাদেবীকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল, বনবাসে যেতে হয়েছিল।

রাম একটি বুদ্ধু ছিলেন, তাই।

বাবা থমকে গেলেন। ছেলের উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে বললেন যে, প্রমাণ করবার আরো উপায় আছে। মেয়েটি যদি সুন্দরী আর ছেলেমানুষ না হতো, তুমি কি সে প্রমাণে এতো উৎসাহী হতে বাবা।

ছেলে বোধ হয় হঠাৎ বাবার মুখের থেকে এহেন কথা শোনবার আশঙ্কা করে নি। তাই একটু থমকালো। তারপর বলল, ঠিক আছে, আপনি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসবেন।

কী দেখে আসব?

ওদের অবস্থা।

দুরবস্থাগ্রস্ত পরিবারের অভাব নেই বেদাস্ত, যেদিকে তাকাও দেখতে পাবে। ঠিক আছে, গিয়ে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে আসব না হয়।

টাকা।

ছেলে শিহরিত।

তাতে তারা অপমানিত বোধ করতে পারে বাবা।

কী আশ্চর্য। তুমি তো বলছ, তাদের সাহায্য করতেই যাও?

সে আলাদা। মানে সে তো জিনিসপত্র। উপহারের মত।

বেশ, তাই নিয়ে যাব। ঠিকানাটা দিও।

বাপ ফিরে এসে ছেলেকে ডেকে গম্ভীরভাবে বললেন, ওই জানা ঘরের বাড়িতে তুই রোজ যাস?

জানা ঘর বলেই অবজ্ঞা করার কিছু নেই বাবা।

তা বটে।

সাংখ্য বাগচী গায়ের জামা খুলে ভিজেগামছায় ঘাম মুছতে মুছতে নির্লিপ্তভাবে বললেন, মহিলাটি তো আমায় মেয়ে দেখিয়েছিলেন খুব সাজিয়ে

গুছিয়ে। মিষ্টি খেতে সাধাসাধি করলেন।

আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল ছেলে।

তার মানে ?

বাবা আরো নিরাসক্ত গলায় বললেন, মানে আর কী! ধরে নিয়েছেন আমি ছেলের জন্মে কনে দেখতে গেছি! ধরাই স্বাভাবিক।

ধরাই স্বাভাবিক ?

ছেলে অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে উঠল, কী বলছেন যা-তা ?

যা-ত'-র কী আছে! ভেবেছে—মানে মহিলাটি ভেবেছেন, তুমি ব্যাপারটা ফাইন্যাল করতে বাপকে পাঠিয়েছ!

বাপ একটু হাসলেন। বললেন, অবশ্য তোমার সামনে বলেই মহিলা বলছি। নইলে—

নইলে কী বলতেন, তা না শুনেই ছেলে ঝপ্ করে বেরিয়ে পড়ে মোটর-বাইকটায় চড়ে বসল।

পরের ঘটনা বেদান্ত নিজমুখেই জানিয়েছিল কৌশিককে এবং বলেছিল, শেষপরে তাদের কথাবার্তায় আমারও মহিলা না বলে অন্য কিছু বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। এত বড় শয়তান, জানিস, চেঁচিয়ে বস্তিসুদ্ধু সবাইকে বলে কিনা আমি নাকি ওর মেয়েকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে যা খুশী করেছি! উঃ।

আর মেয়েটা ?

একটা প্রতিবাদ করল না রে! দিব্যি চুপ করে শুনল দাঁড়িয়ে। ভাবটা যেন, করেইছি আমি যা-তা।

শেষ অবধি সে ব্যাপারের ফয়সালা সাংখ্য বাগচীই কীভাবে যেন করে ফেলে-ছিলেন। টাকা দিয়ে, কি পুলিসের ভয় দেখিয়ে কে জানে। বেদান্ত দীর্ঘকাল আর ও-রাস্তা দিয়ে হাঁটেনি।

এরপর বাপ বলেছিলেন, তোমার এ রোগের একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে জাঁদরেল একটা বৌ। এদিকে তোমার মার বাসনা কচি টুলটুলে সুন্দরী একটি মেয়েকে বরণ করে ঘরে তোলার। আমি ওতে রাজী নই। তোমার পিসির টাইপের একটি মেয়ের সন্ধানে আছি।

বেদান্ত বাগচীর ভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, 'পিসি' টাইপের মেয়ের সন্ধান পাবার আগেই সন্ধানকারী ব্যক্তি অন্য এক জগতের সন্ধানে উধাও হয়ে গেলেন।

অতঃপর বেদান্ত মন দিয়ে বাবার বিজনেস দেখতে লাগল, মাকে দেখতে

লাগল, ছোট বোনের জন্যে পাত্র দেখতে লাগল। বুকজুড়নো ছেলে।

মা ভাবল, আহা, ছেলের এই পরিবর্তনটা দেখতে পেলেন না তিনি। তারপর ভাবল, কিন্তু ছেলে তো আমার চিরকাল এইরকমই। 'মা' বলতে প্রাণ বার করে, বোনটাকে কত ভালবাসে, মাঝে-মাঝেই যা হঠাৎ হঠাৎ ঘাড়ে ভূত চাপে। অথবা পেতনী। এর ওষুধ অবশ্যই কর্তা যা বলেছিলেন, জন্মের মত ঘাড়ে একটি সিংহবাহিনী চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু ওখানেই মুস্কিল, সে ব্যাপারে ছেলের ঘাড় নোয়ানো যাচ্ছে না। ওই তো বাবা ওর প্রাণের বন্ধু কুশেও—

হ্যাঁ, ইত্যবসরে কৌশিক রায় বিয়ে করে ফেলেছে এবং সর্বকর্মে পটুপটিয়সী বৌটিকে নিয়ে উত্তরবঙ্গের সেই নামকরা কলেজের ক্যাম্পাসে মনোরম একটি কোয়ার্টার্সে সংসার পেতে সুখে আছে। বৌয়ের হেফাজতে থাকার সুবিধেয় কর্মজীবন আর সাহিত্যজীবন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হচ্ছে, এবং বৌয়ের উৎসাহে আর পরামর্শে পদ্য ছেড়ে গদ্য ধরে চড়চড়িয়ে অর্থ আর খ্যাতির সোপান অতিক্রম করছে।

বেদান্ত অবশ্য এতে একটু মনঃক্ষুন্ন হয়েছিল। বলেছিল, কবিতাটা ছাড়লি! কবিতা একটা আলাদা জিনিস।

আহা একেবারে ছেড়েছি, কে বলল? লিখি তো!

ওটা একটা বাজে ছুতো। গদ্যর ফাঁকে ফাঁকে সময় পেলে তবে তো! দূর! দ্যাখ, 'কবি' ভাবলেই বেশ কেমন একটা সমীহ আসে। বরাবর তোকে আমি নিজের থেকে অনেক উঁচু ভেবে এসেছি, ওই কবি বলেই তো। কবিত টবিতা তো আর বোঝা যায় না, বেশ কেমন একটা ঝাপসা ধোঁয়াটে রহস্য ভাব থাকে। মনে হয়, যা পড়লাম সেটাই পড়ার শেষ নয়। যা বুঝলাম, তার আড়ালে আরো কিছু মানে আছে। গদ্য? ধুস! দিনের আলোর মতন রহস্যহীন।... মনে হচ্ছে তুই যেন ফুলের বাগান ছেড়ে ধানচাষে নেমে পড়েছিস। এখন শুধু ঘেমে-টেমে হ্যাট্‌ হ্যাট্‌ করে লাঙল চষে মরবি। ধর্মচ্যুত হলি তুই।

কৌশিক চিরকালই তার এই বন্ধুর কথাবার্তা 'অমৃতং বালভাষিতম্‌' হিসেবেই ধরে, তখনও তাই ধরেছিল এবং বাদ-প্রতিবাদে যায় নি। হেসে বলেছিল, কী করি! বৌয়ের আবদার! গল্প-উপন্যাসের দারুণ ভক্ত।...বলে, মোট মোটা থানইটের মত বই বেরোবে রোজ রোজ, তবে না লেখক! তবে না ভক্ত-সংখ্যার বাড়বাড়ন্ত!

ওই তো! বৌ! বৌয়ের আবদার!

বেদান্ত বলেছিল, জীবনের সবকিছুর বারোটা বাজিয়ে দেবার পক্ষে ওই একটি বৌ-ই যথেষ্ট।...এই ছবির মত বাড়ি, এই খোলামেলা হাওয়ায় এই সুন্দর বাগান, এতো ফুল, আর তুই কিনা এর মাঝখানে বসে কবিতা লেখা ছেড়ে থান ইট লিখতে শুরু করেছিস—স্রেফ বউয়ের আবদারে, অ্যাঁ! বুঝেছি বাবা, বৌয়ের বুদ্ধি রীতিমত বৈষয়িক। জানে কবিতা লিখলে সব লবডঙ্কা, আর থানইট লিখলে ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বেড়ে যাওয়া।

ভাগ! টাকার জন্যেই বুঝি?

আমি তো সেটাই সার বুঝছি। তোর এই বস্তা বস্তা গদ্য লেখার বাতিকটা ছাড় কৌশিক। ভেতরের শাঁস ফুরিয়ে যাবে।

তা এসব তো 'বালভাষিতং'। কে আর কান দেয়?

বেদান্ত চলে গেলে বৌ বলেছিল, এই, খবরদার গল্পটল্প লিখবে না! হিহি, শাঁস কমে যাবে! হিহিহি, তোমার বন্ধুটির চেহারাখানা দেখলে তো প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে, কথাবার্তা এমন পাগল-ছাগলের মত কেন?

কৌশিক মুখ গম্ভীর করে বলে, প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে!

করেই তো। কী ফিগার! কী রং, কি কী মুখের কাটুনী! যে মেয়ে দেখবে, তারই ওর প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করবে।...কিন্তু হিহি—

কিন্তু 'হিহি'—

কৌশিক বৌয়ের স্বরের অনুকরণ করে বলে, হিহি, ওই পাগল-ছাগল! এই তো?...আসলে ব্যাপারটা একদম উল্টো। তোমার ওই 'কী একখানা' চেহারা লোকটাই তরুণী দেখলেই প্রেমে পড়তে ছুটবে! রূপগুণের ধার ধারবে না! একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য!

ভাগ! মন ভাঙানো হচ্ছে, কেমন? ভয় হচ্ছে পাছে বৌটা সত্যিই ওর প্রেমে পড়ে!

কৌশিক হাসল, যে মন ভাঙালে ভাঙে, সে মনের জন্যে কে কেয়ার করে?

ইস! বুকে হাত দিয়ে বলছ?

বুকে মাথায় পিঠে, যেখানে বল, বলছি। ও শালার সত্যিই শৈশবকাল থেকেই প্রেমরোগ!

শৈশবকাল থেকে?

তাই তো, বলব একদিন ওর প্রেম-ব্যাধির ধারাবাহিক ইতিহাস।

একদিন কেন, আজই বল। এক্ষুনি।...'শৈশবাবধি প্রেম' বস্তুটি কি শুনি একবার?

কৌশিক হেসে হেসে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বেদান্ত বাগচীর প্রেমকাহিনী বলে ফেলে বৌকে। বলে, এই ব্যাধির জন্যে বেচারী কম লাঞ্ছিত হয়েছে!

বৌ বলল, ইস্, আমার তো শুনে ভক্তি আসছে। নমস্য ব্যক্তি।

এরপর অবশ্য যোগাযোগটা ক্রমেই কমে আসছিল। কৌশিককে উত্তরবঙ্গ ছেড়ে কিছুকাল বীরভূমে থাকতে হয়েছিল। সামান্য কিছুকাল বর্ধমানেও অবশেষে পড়ানোর চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যজীবনে। এই সুবাদে কলকাতায় চলে এসে একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। এ চাকরিতে অবকাশ বিস্তর, লেখারই পরিবেশ। অতএব কর্মস্থলে বসেই বস্তা বস্তা লেখা চলছে এবং কোথায় কোনোখানে শাঁস কমে যাচ্ছে কিনা কে জানে, তবে বহিরঙ্গের চেহারা তো দিনে দিনে রীতিমত শাঁসালো হয়ে উঠছে। দুমদাম খানইট সাপ্লাই করছে, হুহু করে কাটছে, অভিজাত পাড়ায় একটি ফ্ল্যাট কিনেছে টেলিফোন পেয়ে গেছে, গাড়ি কিনবো কিনবো করছে।···অর্থাৎ যথানিয়মে জীবনের ছন্দ বদলাচ্ছে, গড়ন বদলাচ্ছে।

বেদান্তও অবশ্য কলকাতাতেই, সেই যোধপুর পার্কেই। তবে দুজনের মধ্যবর্তী দূরত্ব খুব কম নয়। তারও তো বহিরঙ্গে বদল ঘটছে। তবে ভিতরে? না তার আর বদল ঘটছে না। মাঝে-মাঝেই পুরনো রোগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে

কৌশিক বলে, হোপলেস।

এর ওর মাধ্যমে সেই সব সংবাদপ্রবাহ কানে আসে কৌশিকের।

কখনো কখনো হতাশ হয়ে টেলিফোনে ডাকে, এই হোপলেস! তোর কি আর কোনদিন জ্ঞানবুদ্ধি হবে না! শুনেছি কারা যেন আশী বছরে সাবালক হয়, তুই কি তাদের দলে? আবার কী একখানা বাগিয়েছিসি শুনলাম!

টেলিফোনের ওপার থেকে উচ্চরোল ভেসে আসে, গিয়েছে তোর কানে আরে ন্যাখ, সেই পরিস্থিতিতে পড়লে তুইও একই কাজ করতিস। হয়তো কিছুই হবে না, কিন্তু দশজনে মিলে ব্যাপারটাকে তুঙ্গে তোলে, বুঝলি—আর মহিলা তেমনি—

তা সেই পরিস্থিতিটা কি ছিল?

বেদান্তর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিশদ করে বললে এই দাঁড়ায়—

গাড়ি নিয়ে গড়িয়াহাটের মোড় পার হতে হতে বেদান্ত দেখল, একটা হকার কর্ণারের সামনে একটি মহিলাকে ঘিরে কিছু মানুষের জটলা, আর তার ফাঁক থেকে শিশুকণ্ঠের তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে।

এই পরিস্থিতিতে তো আর গাড়িটা থামিয়ে নেমে না এসে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাওয়া যায় না।···

এসে দেখা গেল ব্যাপার এই, এক নেহাৎ মধ্যবিত্ত চেহারার মহিলা দুটি শিশুপুত্রকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে এসেছেন এবং এখানের একটি স্টলে দেখেশুনে পছন্দ করে দুজনের জন্যে বেশ কিছু জামা প্যাণ্ট ইত্যাদি কিনে, দাম দিতে যাবার সময় দেখেছেন, হাতে ঝোলানো ব্যাগের দ্বারোদ্ঘাটিত। মুখের চেন খোলা, ভিতর ফাঁকা। না, একেবারে ফাঁকা নয়, ব্যাগের খোলে পড়ে থাকা পুরনো ক্যাশমেমো, মাথা ধরার বড়ি, চোখের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, রুমাল, কী ভাগ্যিস বাড়ির চাবির গোছাটিও রয়েছে। নেই শুধু পুরনো চিঠির খামে ভরে রাখা নোটের গোছা। যেগুলো চোর ঠকাতে, পাশ থেকে বার করে ওই একটা মুখখোলা খামে ভরে নিয়েছিলেন মহিলা। কিন্তু চোর ঠকানো গেল না।

তার মানে তিনি যখন নিবিষ্ট মনে ছেলেদের গায়ের মাপের সঙ্গে পছন্দসইয়ের সামঞ্জস্য সাধনে প্রাণ সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই এই ঘটনা ঘটেছে। হয়তো সেই পকেটমার কাছাকাছিই আছে এখনো। হয়তো ব্যাগ মারা যাওয়া মহিলার মুখচ্ছবিখানি উপভোগ করতেই।

অবর্ণনীয় সেই মুখ।

দুঃখে হতাশায় চাপা হাহাকারে এবং লজ্জায় একদম কাঠ।

লজ্জা তো বটেই, 'পিকপকেট' হওয়াটা তো এখন আর সহানুভূতির নয়, লজ্জারই। একদা সহানুভূতির ছিল, যখন মানুষ মানুষের সুখ-দুঃখ বুঝতো।

কিন্তু এখন? সেটা বুঝতে আসাও সন্দেহজনক। যেমন ঘটল এই ক্ষেত্রে।

মহিলা কষ্টে কান্নাচাপা মুখে ঈষৎ হাসির আভাস ফোটাবার চেষ্টা করে হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে বললেন, দেখলেন তো অবস্থা! আজ আর হল না। দয়া করে যদি এগুলো একটু আলাদা করে রেখে দেন, কাল কি পরশু এসে নিয়ে যাব।

মহিলার মুখ ক্লিষ্ট, কিন্তু কথার ভঙ্গী দ্রুত। যেন পালাতে পারলে বাঁচেন। ···তা বাঁচবেনই তো, অবস্থা যে প্রায় কুরুসভায় দ্রৌপদীর মত। অনুভব তো করছেন, প্রায় প্রতিটি লোকের চোখেই অবিশ্বাসের ছায়া।

ধরেই নিচ্ছে ওরা, পিকপকেটের গল্পটা বানানো।

শুধু ছায়াই বা কেন, কায়াও রয়েছে বৈকি।

এই দোকানের সামনেটা ঘিরে যে জটলা জমে উঠেছে, তার মধ্যে থেকে

বেশ স্পষ্ট পরিষ্কার একটি গুঞ্জনধ্বনি উঠছে।

যে গুঞ্জনকে শব্দে ধরতে পারলে অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়, ভেবেছিলে তালে-গোলে হৈচৈ তুলে জিনিসগুলো হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। দোকান এই ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করবে না। হুঁ, অতো সোজা নয়।···তবে মেয়েরাই যে আজকাল বেশী জোচ্চোর আর ফেরেববাজ হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই

সন্দেহ নেই যে, সেটা বোঝা গেল দোকানীর ব্যবহারে।

যেই শুনল 'কাল, পরশু'—সেই ফস করে প্যাকেটগুলো টেনে নিয়ে গুদামজাত করে ফেলে বলল, বলতে পারছি না। বলতে পারবে কেন? এক্ষুনি নয়, একটু পরে নয়, 'কাল পরশু'! ছেলের হাতে মোয়া! দোকানী যেন ঘাস খায়!

অপমানাহত মহিলা আরক্ত মুখে, কারো দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলেন, যেন তিনিই ধরাপড়া পকেটমার, কিন্তু বিপদে ফেলল ছেলে দুটো। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ও মা, আমাদের জামা-প্যান্ট নিয়ে তুলে রাখল আমাদের জামা! আমাদের জামা!

এরপর আর উপস্থিত কারো মনে কোনো সন্দেহই থাকলো না। অর্থাৎ ব্যাপারটা পুরোপুরিই তৈরী করা নাটক। এবং লবকুশের মত প্রায় একরকম দেখতে আর প্রায় একই সাইজের ছেলে দুটিই নাটকের প্রধান কুশীলব। সন্দেহ নেই এক্সপার্ট অভিনেতা। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তারা স্বরগ্রাম উচ্চে তুলছে, জামা নিয়ে যাব! জামা নিয়ে যাব!

অর্থাৎ যদি কোনোমতে দোকানীর করুণা উদ্রেক করা যায়।

মা কষ্টে বলছে, বোকার মত কথা বলো না। দেখছো তো টাকা হারিয়ে গেছে। চল চল, বাড়ি চল। কিন্তু তাদের গোঁ, জামা না নিয়ে যাবে না।

না যাব না। তুমি আর আসবে না। তুমি জামা কিনে দেবে না—বলবে টাকা নেই।

জটলার মধ্যে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে হাসছে এবং মহিলার কান না বাঁচিয়ে শহরের রাস্তাঘাটে আজকাল কী পরিমাণ ধাপ্পাবাজীর কারবার চলছে তাই বলাবলি করছে। এহেন সময় গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে হীরোর রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ

আর ঠিক তন্মুহূর্তেই একটা ছেলের গালে ঠাস করে একটা চড় পড়েছে ফলে কান্নার রোল আকাশে উঠেছে।

কী ব্যাপার?

বেদাস্তর সম্ভ্রান্ত চেহারা আর গাড়ি থেকে নামা দেখে জটলা একটু সরে সরে

ফাঁকা করে দিল। এবং দু-একজন আগবাড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

বেদান্ত প্রথমেই প্রহৃত শিশুর মাথায় হাত দিয়ে বলল, ছি ছি খোকা, রাস্তায় কাঁদতে আছে? চুপ করো। জামা কেনা হবে।

বলার আগেই বোধ হয় চুপ করে গিয়েছিল তারা। কারণ আকস্মিক রাজার মত এই লোকের আবির্ভাবে থতমত খাওয়াই স্বাভাবিক।

অতঃপর বেদান্ত বাগচী মহিলার দিকে তাকাল।

লজ্জায় অপমানে বিবর্ণ-মুখ ছেলেদের শত্রুতায় মহিলা আরো উদ্‌ভ্রান্ত।

পরবর্তী ডায়লগ এই—কত ছিল ব্যাগে?

সে জেনে আর লাভ কী!

সেই উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় হঠাৎ দৃঢ়তার ছাপ।

বেদান্ত বুঝতে পারল, সহসা কেন এই বদল।

বলল, লাভ আমারও নয়, আপনারও নয়, লাভ এই বাচ্চাদের। বলুন, বলে ফেলুন, দেখি কী করতে পারি।

খামোকা আপনি কিছু করতে যাবেন কেন?

মানুষ মাত্রেই এটা করে। বলে ফেলুন চটপট।

বেদান্তর একটা হাত প্যাণ্টের পকেটে।

মহিলা ছেলেদের ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে বলেন, মানুষ সম্পর্কে আপনার দেখছি অনেক ভক্তি। কী ছিল আমার মনে নেই। খালি বাড়িতে কিছু রেখে আসব না বলে সব নিয়েই বেরিয়েছি—সরুন, আমি বেরিয়ে যাই। এই চল চল।

মার খাওয়া ছেলেটা আবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, চলে যাবো কেন? জামা না নিয়ে চলে যাবো কেন? উনি যে বললেন—

কে একজন বলে উঠল, ওঃ, শিক্ষা বটে!

কে বলল, কেন বলল বুঝতে পারল না বেদান্ত। বলে উঠল, ঠিক আছে, কী ছিল মনে না থাকে এর দোকানের বিলটাই বলুন না হয়! ও-ভাই, কত হয়েছে?

মহিলা সতেজ ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললেন, কেন? আপনি মিটিয়ে দেবেন নাকি?

বেদান্ত অম্লান মুখে বলল, দেবার জন্যেই তো বলছি। বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে।

করুক না। আপনার কী হচ্ছে তাতে?

কী আশ্চর্য—আপনি এমন রগচটা কেন? দেখছি আপনি অসুবিধেয় পড়ে গেছেন, বাচ্চারা কাঁদছে। অথচ আমার কাছে বেশী টাকা রয়েছে—

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটা অসভ্য ধরনের উল্লাসধ্বনি ওঠে, মাইরি দাদা, আছে নাকি? বিলোবার মতন এক্সট্রা টাকা? তাহলে ছাড়ুন না কিছু এদিক ওদিক। বেছে বেছে একদিকে কেন?

অসভ্যর মত কথা বলছে কে?

বেদান্ত তার দীর্ঘোন্নত আর দামী স্যুট পরা শরীরটা নিয়ে ফিরে দাঁড়ায়। বলে, আর যেন এ ধরনের কথা না শুনি।

'মজা দেখনেওলা' কিছু লোক এই রণমূর্তির দিকে তাকিয়ে একটু পিছিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল বাকি মজাটার আশায়। কিন্তু শহরে বাজারে পথেপ্রান্তরে 'মস্তান' নামক একটি জাতি নেই? যারা ঠিক মহামুহূর্তে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে?

তারা ততক্ষণে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের মাসল ফোলাচ্ছে।

বেদান্ত দোকানীর দিকে ফিরে বলল, বলুন তো ভাই, আপনার কত হয়েছে?

লোকটা অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে (মহিলাটির দিকে একনজর তাকিয়ে) বলল, আড়াইশো।

মাত্র? ঠিক আছে। দিয়ে দিন জিনিসগুলো।

প্যাণ্টের পকেট থেকে হাত বার করল বেশ কিছু মালকড়ি সমেত।

এই সময় হঠাৎ বোমা ফাটলো।

মহিলা ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এর মানে? আপনি ভেবেছেন কি? টাকা দেখাচ্ছেন?

কী মুশকিল! এতো চটছেন কেন? আমি কী বলেছি আপনাকে দান করতে চাইছি? বাচ্চারা মনখারাপ করছে, জিনিসগুলো না নিলে কাঁদবে—বেশ তো, না হয় এখন ধার হিসেবেই নিন, শোধ দিয়ে দেবেন পরে।

বেদান্ত টাকাটা দোকানীর দিকে এগিয়ে ধরে। তবে দোকানী নেয় না। দোকানী মহিলার মুখভঙ্গী ওয়াচ করে।

মহিলা একবার এই মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি পুরুষের অপাপবিদ্ধ সরল সতেজ মুখটির দিকে তাকাল, কিন্তু চারদিকে কৌতূহল আর কৌতুকে রসালো অশ্লীল মুখের সারি। অতএব গলাটা যতটা সম্ভব চড়া করে বলেন, মাপ করবেন, সম্ভব হবে না।

কী মুশকিল। এই তো কাছেই, যোধপুর পার্ক। আচ্ছা ঠিকানাটা রাখুন। যে কোনোদিন সুবিধেমত—

চট করে পকেট থেকে একটা নেম-কার্ড বার করে এগিয়ে ধরে।

মহিলা এই অভিজাত চেহারার ব্যক্তির এরকম নাছোড়বান্দা ভাবে খুব অস্বস্তিবোধ করেন এবং বলে ওঠেন, দেখুন সংসারের সবাই দয়া নেবার জন্যে ব্যগ্র, এটা ভাবলে ভুল করবেন।···সরুন, আমায় যেতে দিন।

দয়া।

বেদান্ত যেন আকাশ থেকে পড়ে, দয়া মানে? বল'ছ তো শোধ দিয়ে দেবেন।

আমিও বলছি, আমার ওসব সুবিধে হবে না।

উঃ। আচ্ছা জেদী তো আপনি? বাচ্চারা কী রকম আপসেট হয়ে গেছল, দেখতে পাননি? বেশ, আমার বাড়ি এসে শোধ দেবার সুবিধে না হয়, চলুন আপনার বাড়ি গিয়েই এই দণ্ডে আদায় করে নিই। চলে আসুন গাড়িতে। এসো তো খোকারা—

দেখা গেল কখন কোন্ মন্ত্রবলে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে খোকাদের হাতিয়ে ফেলেছে বেদান্ত বাগচী নামের হাড়বেহায়া লোকটা। তার দুটো হাত দুই খোকার মাথায় আর খোকাদের দুই হাত নিজ নিজ বুকে চাপা নিজ নিজ পুলিন্দা সমেত। ছেলে দুটো দিব্যি গুটি গুটি এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে।

গাড়িটা তার নয়নবিমোহন রূপ নিয়ে হাতকয়েক দূরে দণ্ডায়মান।

মহিলাটি আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। চিৎকার করে ওঠেন, আপনার মতলবটা কী? এই ঝণ্টু-ঘণ্টু, চলে আয় বলছি।

ব্যস। এরপর আরও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'মাসল' ফোলাবার দরকার আছে নাকি? ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে না? অতএব রে-রে রব। মার শালাকে, ধর শালাকে, মেরে তক্তা বানিয়ে দে, গাড়ির নম্বর টুকে নে, শালা ঘুঘু দেখাতে এসেছিল, ফাঁদ দেখিয়ে দে—এইসব মনোরম ধ্বনির সঙ্গে গাড়ির ওপর দনাদ্দন ইট পড়তে থাকে।···আশ্চর্য, হাতের কাছে ইটই বা আসে কোথা থেকে?

এই ইঁট-বৃষ্টির পাশ কাটিয়ে মহিলা ছেলেদের হাত থেকে প্যাকেট দুটো ছিনিয়ে নিয়ে আসামীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের টানতে টানতে পিছিয়ে অন্য মোড় পার হয়ে চলে যান।

শুনতে শুনতে যান, শালা বদমাস। চাঁদু আমার। কতদিন চালানো হচ্ছে এ কারবার? চেহারা দেখিয়ে, গাড়ি দেখিয়ে আর টাকা ছড়িয়ে ছেলে পাচার,

মেয়েছেলে বাগাবার? বেশি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করতে আসবেন না, লাশ নেমে যাবে।…

গাড়ির নম্বর টুকে নেবার কথা বললেও নেয়নি কেউ। ইটিয়ে গাড়িটার যা করতে পারে করেছিল। মস্তানরা থানাপুলিস করতে চায় না। আইন তার সর্বদা নিজের হাতে রাখে। কেসটা তাই কাগজে ওঠেনি। শুধু বেদান্তকে দিন দুই বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

* * *

এটা কাগজে ওঠেনি। কাগজে উঠেছিল সেই বৃষ্টির বিকেলের ব্যাপারটা।

গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল বেদান্ত তার প্রেস থেকে ফেরার মুখে; হঠাৎ বেদম ঝড় উঠল। কালবৈশাখী ঝড়। তার সঙ্গে বৃষ্টি। প্রবল ঝড়ের মুখে গাড়ির জানলার কাঁচ টেনে বন্ধ করতে গিয়ে লক্ষ্য পড়ল পথচলতি লোকের যে যেমন পারছে দুমদাম ছুটে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে। রাস্তার ছোট ছোট টিনের চালা, দোকানের চালাগুলোও যেন ছুটে পালাবার তাল করছে। অথচ মাঝরাস্তায় একটি মেয়ে পালাতে পারছে না। তার শৌখিন ফোল্ডিং ছাতাটি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।…ছাতাটা হঠাৎ উল্টে গিয়ে হাতছাড়া হয়ে আকাশে উড়ে পালাতে চাইছে। মেয়েটা কোনোমতে দু'হাতে তার কিনারাটা ধরে পালানোটা আটকে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় অসম্ভব চেষ্টা।

ভিজে সপ্‌সপে হয়েও ঊর্ধ্ববাহু ঊর্ধ্বমুখ হয়ে এই চেষ্টা চালানোর ভঙ্গিটা দেখে প্রথমটা খুব হাসি পেল বেদান্তর। ভাবল সামান্য একটা জড়বস্তুও মানুষকে কত নাস্তানাবুদ করতে পারে। তবে গাড়িটার গতি স্লো করল।

মনে মনে বলল, ওহে মহাশয়া, ওই বিগড়ে-যাওয়া পলায়মান বস্তুটিকে বাগিয়ে ফেলে, আবার ফর্মে এনে ব্যবহার করার আশা ছাড়ুন। ওকে পথে পরিত্যাগ করে ছুট মারুন। ওর হাড়পাঁজরা দুমড়েমুচড়ে খতম। এইসব শৌখিন মাল দিয়ে কি আর মাথা রক্ষে হয়?

বলল অবশ্য মনে মনে। তবে ভাবল, এবার বোধ হয় হাল ছেড়ে দেবে। কিন্তু আশ্চর্য, ছাড়ছে না হাল, অর্থাৎ ছাতার কিনারা ছাড়ছে না। আপ্রাণ শক্তিতে টেনে ধরে রেখেছে।

দূর থেকে ওই ছাতা সামলানো দৃশ্যটি দেখেই বেদান্ত গাড়িটাকে 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করে চালিয়ে আসছিল। এখন একেবারে নিকটে এসে, একেবারেই

থামিয়ে, জানলার কাঁচ সরিয়ে, মাথাটা একটু এগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হবে না। ছেড়ে দিন।—ওকে উড়ে যেতে দিন। চলে আসুন।

যদিও গাড়ি একেবারে ঘাড়ের কাছে, তবুও ঝড়বৃষ্টির শব্দে কথাগুলো স্পষ্ট শোনা না গেলেও হাতের ভঙ্গিতে বোঝা গেল, ওকে গাড়িতে উঠে আসতে বলা হচ্ছে।

মেয়েটা এতক্ষণ উর্ধ্বমুখে থাকার জন্যে বোধহয় পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা খেয়াল করেনি। ছাতাটা যখন ওড়ার বায়না শুরু করেছিল, তখনো তো রাস্তায় অনেক লোক।

এখন এ কী।

বৃষ্টির অরণ্যে সে একা। ঘাড়ের কাছে থাবা-উঁচানো বাঘ।

মুহূর্তে এতক্ষণের আপ্রাণ চেষ্টার ধনটিকে হাত থেকে উড়ে যেতে দিয়ে ছুট ছুট—দুরন্ত ছুট।

পরনে ভিজে শাড়ি-সায়া, ঝড়ের উল্টোমুখ, ছুটবো বললেই কি দুরন্ত ছোটা যায়? তার সঙ্গে যদি জোটে দুরন্ত ভয়ের কাঁপুনি।

এই জনমানবশূন্য পথে, গাড়িতে তুলে নিতে ক'সেকেণ্ড লাগবে? তার মানে সেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই 'নবনলিনী বিদ্যালয়'র 'ইংরিজি দিদিমণি'র জীবন শেষ।

কিন্তু ছুটে পালানো সম্ভব নাকি?

একটা চটি পা থেকে ছিটকে চলে যায় এবং 'দিদিমণি' সপাটে আছাড় খান মুখথুবড়ে উপুড় হয়ে।

এই সময় আকাশ বিদীর্ণ করে কোথায় যেন বাজ পড়ে।

এরপরও কী গাড়ির আরোহীর গাড়িতে বসে থাকা সম্ভব হতে পারে? ভূপতিতার প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বেদান্ত তাকে একগোছা ভিজে সলতের মত বাগিয়ে ধরে গাড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করে দরজাটা জোরে বন্ধ করে লক করে দিয়ে আরো জোরে বলে ওঠে, হচ্ছেটা কী? মারা পড়তে চান নাকি?

হ্যাঁ চাই। নামিয়ে দিন বলছি আমায়। শিগগির নামিয়ে দিন। খুলে দিন দরজা।

বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চিৎকারে বলেই চলে, খুলে দিন বলছি। আপনি দরজা লক্ করলেন কেন। অ্যাঁ, লক্ করলেন কেন?

বেদান্ত গাড়ি চালাতে চালাতে নির্লিপ্ত গলায় বলে, কেন আর। আপনি

চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার বীরত্ব দেখাতে পারেন এই ভয়ে।

গাড়িতে তুললেন কেন আমায় ?

মারা পড়া থেকে উদ্ধার করতে। কপাল কেটে রক্ত পড়ছে, টের পাচ্ছেন ?

আমি মারা পড়ি, আপনার কী ? খুলে দিন বলছি, নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

লোক !

বেদান্ত দিব্যি গলা খুলে হেসে ওঠে, লোক কোথায় ? চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ আসবে না। দেখছেন রাস্তার অবস্থা ?

এরপর অবশ্যই আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। নবনলিনী বিদ্যালয়ের দিদিমণির কিল চড় আঁচড় কামড়ে বেদান্ত বাগচীর জামা ছেঁড়ে চামড়া ছড়ে আঙুলের ডগায় দাঁতের দাগে রক্ত ফুটে ওঠে।

*   *   *

প্রথমটায় বেদান্ত একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতটা দিয়ে মার ঠেকাচ্ছিল, গায়ের ওপর উড়ে এসে পড়া আরশোলা পেড়ে ফেলার ভঙ্গিতেই। কিন্তু মেয়েটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। হঠাৎ এক ধমক দিয়ে বসল, এরকম অসভ্যতা করছেন কেন ? আমি আপনাকে খেয়ে ফেলছি ?

ফেলছেন না, ফেলবেন। ইতর ! শয়তান ! ছোটলোক !

এখন বৃষ্টির গতি একটু মন্থর, বেদান্তর গাড়ির গতিও। ও গম্ভীর গলায় বলল, আপনার বুঝি কখনো 'ভদ্রলোক' দেখার অভ্যাস নেই, ঝাঁসির রানী !

এই অবস্থায় আবার ব্যঙ্গোক্তি ! ছিটফিটিয়ে ওঠে মেয়েটা।

থামুন থামুন। ভদ্রলোকের নমুনা তো সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি। নামিয়ে দিন বলছি।

না। আগে আপনাকে একটা ফার্স্ট এড দিতে হবে। তারপর অন্য কথা। চলুন একটা কোনো ডিস্‌পেনসারিতে।

গাড়ির গতিটা আবার বাড়ায় বেদান্ত বাগচী। তার মানে নিয়ে পালাবার চেষ্টায় তৎপর হচ্ছে।

বেদান্তর কাঁধটা টেবিলের টপ নয়, তবু টেবিলে ঘুষি পড়ার মত সজোরে একটা ঘুষি পড়ে, আমার কিছু হয়নি।

হাত দিয়ে দেখুন, কপালে রক্ত গড়াচ্ছে। ফার্স্ট এড দরকার। একটা 'টিটেনাস' ইঞ্জেকশনও দরকার।

ওঃ, দরকার! মেয়েটার গলা হিংস্র শোনায়, আমার গার্জেন এসেছেন। আমি যদি বলি আপনার জন্যেই আমার এই অবস্থা?

বেদান্ত পরিষ্কার চোখে তাকিয়ে বলে, বিশ্বাস করবে না।

বিশ্বাস করবে না?

না। সবাই আপনার মত নয়।

ওঃ, আমি ছোটলোক! আর আপনি—আপনি—কী হচ্ছে? এতে স্পীড দিচ্ছেন কেন? অ্যাঁ! অ্যাঁ! শয়তান! সুন্দর চেহারার আড়ালে—

গাড়ির গতি কমাবার অন্য কোনো উপায় না দেখে মেয়েটা (মেয়েটাই—দিদিমণি হলেও) হঠাৎ বীরবিক্রমে দু'হাত দিয়ে চালকের কণ্ঠনালি চেপে ধরে। গায়ের জোর যত না থাক—সাঁড়াশীর মত সরু সরু আঙুলের জোরটা খুব কম নয়। হয়তো ভয়ে সন্দেহে মরীয়া হয়ে উঠেছে বলেই—

বেদান্ত কষ্টে একটা হাতকে স্টিয়ারিং-এ ঠেকিয়ে রেখে আর একটা হাতে বজ্র-মুষ্টিতে মেয়েটার একটা কব্জি চেপে ধরে।…বলাই বাহুল্য 'খুনী'র আঙুল শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে। 'হাড় ভেঙে গেল' বলে মেয়েটা একটা অস্ফুট চিৎকার করেই এতক্ষণকার সমস্ত তেজ বীরত্ব ধূলিসাৎ করে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বলে, আপনার পায়ে পড়ছি, আমায় ছেড়ে দিন!

প্রায় নিজের পাড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে বেদান্ত। সামনেই একটা ডিস্পেনসারি। চেনা।

গাড়ি থামিয়ে দরজাটা খুলে ফেলে বেদান্ত। গলায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, এক্ষুনি ছাড়ার কথাই ওঠে না, ফার্স্ট ফার্স্ট এড, তারপর টিটেনাস, তারপর এক্স-রে করে দেখা হাড় ভাঙলো কিনা।

এখন থামাগাড়ি। এখন বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে। এখন গাড়ির দরজাও হাট।

'নবনলিনী'র বুদ্ধিমতী ইংলিশের টিচার ফট্ করে মাটিতে নেমে পড়ে চিৎকার করে ওঠেন, আপনারা দেখুন, আমাকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসে—আ-মা-কে—আ-মাকে—

* * *

সেবারে জল অনেকদূর গড়িয়েছিল।

'নবনলিনী'র দিদিমণির বিস্রস্ত কেশপাশ আর বৃষ্টিতে ভেজা বিস্রস্ত বেশবাস, কপালে গড়িয়ে-আসা রক্তের রেখা এবং হাঁফাতে হাঁফাতে ডিস্পেনসারির সিঁড়ির সামনে শুয়ে পড়া, এ দৃশ্য—বেদান্তর চেনা ডাক্তার, চেনা কম্পাউণ্ডারও

খুব নির্মল দৃষ্টিতে দেখল না।

বেদান্তর গলায় আঙুলের দাগ ?

সেটা তার স্বপক্ষে যাবে, না বিপক্ষে ?

একটা রোগা পটকা মেয়ে একটা জোয়ান পুরুষের গলা টিপে ধরতে পারে কোন অবস্থায় ?

কাগজে কাগজে 'এক অভিজাত ব্যক্তি'র কেলেঙ্কারির কলাও বর্ণনা। থানা-পুলিস। বাকি কিছুই থাকেনি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে উদ্ধার।

তবে অদ্ভুত এক আশ্চর্য মজার খবর, সবকিছু মিটে যাবার পর সেই দিদিমণিটি একদিন যোধপুর পার্কের 'বাগচী ভিলায়' এসে হাজির ক্ষমা চাইতে। শুধু বেদান্তর কাছেই নয়, বেদান্তর মার কাছেও। কেঁদে ফেলে বলেছিল, ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি—ওরকম—

মা নীরস গলায় বলেছিলেন, আর এখন ক্ষমা চাওয়া। আমার ছেলের যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেল। আমার আইবুড়ো ছেলে—

আর স্বয়ং আসামী সরস গলায় বলেছিল, ভাগ্যিস সময়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলাম। তাই তবু আপনি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটা পেলেন, কী বলেন? তবে আপনার কাছে আমি উপকৃত।

উপকৃত।

হ্যাঁ, উপকৃতই। জীবনের একটি শিক্ষা হল।

হেসে উঠেছিল, তা ওটাই তো আপনার পেশা, তাই না? নাবালিকা নাবালকদের শিক্ষাদান।

* * *

ওই সব কাণ্ডকারখানার সময় অবশ্যই কৌশিক বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর সব মিটে যাবার পর বলেছে, আশা করি এরপর আর আমাকে মুখ দেখাতে আসবি না। চিত্রা সভ্য মেয়ে, তাই তোর ঘটনাটাকে বিশ্বাস করেছে। অন্য যে-কোন মেয়ে হলে বলত, গল্প তুমি একাই বানাতে পারো না, তোমার বন্ধুও বেশ ভালোই পারেন দেখছি। যাক, মনে রাখিস।

বেদান্ত বলেছিল, প্রমিস করতে পারছি না, জানিসই তো, বরাবরই আমার স্মৃতিশক্তি একটু কম।

তা সেই 'কম'-এর জন্যেই বোধ হয় বেদান্ত সেই অনুতপ্ত যুবতীর ক্ষমা চাইতে আসার পরদিনই খবরটা দিতে এল।

কৌশিক বলল, তাহলে নিজমুখে স্বীকার করছিস, শিক্ষা হয়েছে।

করছি ভাই।

তবে সেই অতীত কালের মতো মেপে সাতহাত নাকখৎ দে আর দু'কান ধরে ঘোড়দৌড় কর।

বেদান্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথা চুলকে বলল, পারি, তবে তোর গিন্নীর সামনে—

কী? লজ্জা করছে?

ইয়ে একটু একটু করছে যেন।

করার দরকার নেই। গিন্নী নেই এখানে।

নেই এখানে!

না, বাপের বাড়ি গেছে কিছুকালের মতো।

বাপেরবাড়ি গেছে! 'কিছুকালে'র মতো! কেন?

বেদান্ত বোকার মতো তাকায়।

কৌশিক বলল, বেটা বুড়ো বুদ্ধু! মেয়েরা কেন মাঝে মাঝে 'কিছুদিনের' জন্যে বাপেরবাড়ি যায়, জানো না তুমি?

বেদান্ত বলল, যাচ্চলে! ভাবতে ভাবতে আসছি তোর বৌয়ের হাতে চা খাবো!

সে-আশা ছাড়। ওই একটা হাফপ্যান্ট-পরা খোকাকে তালিম-টালিম দিয়ে রেখে গেছে, সেটাই যা পারে। যাক, আর তো লজ্জা করার কিছু নেই! আমার এই 'হল', টানা সাতহাত জায়গা না পাস, দু'বারে দে—

বেদান্ত বলল, দুর! অমন একখানা রগবগে দৃশ্য যদি তোর বৌ না দেখল তো-কী আর 'মজা' হল?

সেই সকালের পর আবার আজ এই সকাল। এর মধ্যে কালপ্রবাহ অনেকখানি বয়ে গেছে।

মাকে নিয়ে অনেকদিন ধরে তীর্থভ্রমণ করিয়েছিল বেদান্ত। কারণ মা তাঁর আইবুড়ো ছেলের বিয়ের আশায় 'জলাঞ্জলি' দিতে হল ভেবে প্রায় ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, আর কলকাতার সমাজে মুখ দেখাতে পারছিনে, কাশীতে তোদের ঠাকুর্দার আমলের যে বাড়িটা আছে সেখানে গিয়ে থাকব। আমায় রেখে আয়।

অর্থাৎ বার্ধক্যে বারানসী!

তা সেটা উচিত। সংসার করার আশা আমার আর নেই।

আহা, সে কী! তোমার অমন সোনার চাঁদের মত জামাই, অমন হীরের চাঁদের মত নাতি, দেবী চণ্ডীতুল্য মেয়ে, এদের নিয়ে সুখে সংসার কর।

ওদের নিয়ে আবার আমার সংসার কী?

মা রেগে আগুন, মেয়ে-জামাই হচ্ছে আদরের জিনিস, দু'দিন এনে আদর-যত্ন করা যায়। তারা কী আমার সংসার? 'সংসার' তো ছেলে-বৌ নিয়ে।

বেদান্ত মুখ খুব গম্ভীর করে বলেছিল, তোমাদের এটা খুব ভুল ব্যবস্থা। আর এই ভুলভাল সমাজব্যবস্থার জন্যে সংসারে এত সংঘর্ষ আর সমস্যা। মেয়ে-জামাইকে কাছে রাখতে হয়। তোমার নিজের মেয়ের কাছে তুমি যেমন স্ত্রী হতে পারবে, পরের মেয়ের কাছে তা পারবে?

আর পরেব ছেলেটি?

পরের ছেলে? দূর, ওটা আবার একটা ব্যাপার নাকি? তোমাদের মা' কালীমূর্তিই তো তার নিদর্শন।

তা কাজে কথায় হয়েছিলও তাই।

মাকে নিয়ে বেরোবার সময় খুকুকে আর তার বরকে এনে রেখে গিয়েছিল বেদান্ত,—খুকুকে ঘরবাড়ি সামলাতে আর তার বরকে বেদান্তর ব্যবসা সামলাতে। কিন্তু ফিরে এসেও তাদের ছাড়তে পারল না। ক্রমেই দেখা গেল তারা অপরিহার্য! মা কাশীর বাড়িতেই রয়ে গেছেন, আর বেদান্তর ব্যবসা নিজের বেগেই বাড়বাড়ন্তর পথে যাচ্ছে, কাজেই সাহায্যের হাত দরকার।

ওদেরও অবশ্য তখন প্রায় সেই 'আচাবো কোথায়' অবস্থা। মানে খুকু তো বনেদী শ্বশুরবাড়িতে একখানা মাত্র ঘরের অংশীদার। আর বরও হঠাৎ 'কোম্পানি' উঠে যাওয়ায় বেকার।

বেদান্ত বলল, একটু দয়া আমায় কর খুকু! মা যতদিন না কাশী থেকে ফিরছেন, তুই থাক বাবা!

খুকু অবশ্য ভাঙে তো মচকায় না। বলল, মা তো বলেছেন, কবে আসি ঠিক নেই। এতোদিন বাপেরবাড়ি থাকবো? লোকে কী বলবে?

বেদান্তর চোখে ভেসে ওঠে বোনের শ্বশুরবাড়ির সেই জনারণ্য। তার মধ্যে বাস। তার মধ্যে একখানি ঘরের মধ্যে বসেই স্টোভ জ্বেলে ভাইকে চা বানিয়ে দেওয়া।

বলল, কী আশ্চর্য! এতে আবার বলাবলির কী আছে? নিজ অধিকার বলেই থাকবি। লোকে কথায় বলে, 'এ কী তোর বাপের জিনিস।'—জানিস না?

তবুও মান খোয়াতে সহজে রাজি নয় খুকু।

বলেছে, আর ও ? ও বুঝি বসে বসে শালার অন্ন ধ্বংসাবে ? আর শালার অফিসে চাকরগিরি করবে ?

সর্বনাশ।

বেদান্তর মাথায় হাত।

শালার অন্ন ধ্বংসানো ? বরং আশা করে আছি, মা যতদিন না ছেলেটার দেখাশোনা করতে ফেবেন, ততদিন তোদের সংসারে পেয়িং গেস্ট হয়ে থেকে দুটো খেতে পাবো। আর শালার অফিসে চাকরগিরি মানে ? তবে বলতে পারিস, পরিবারের চাকরগিরি। 'আর্ট প্রিন্টিং প্রেসে'র অর্ধাংশের মালিক তো তুই।

খুকুর ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল, আমি আবার কখন হলাম ?

হয়েছিস। জানতে পারিসনি।

ঘটনাটা তাই। ওটা করে দিয়েছিল বেদান্ত, মার উপস্থিতিতেই।

ছেলের এই উদারতার সিদ্ধান্তে মা প্রথমটা 'অবজেকশান' তুলেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যবসার মধ্যে আবার জামাইকে ঢোকানো কেন বাবা ? বুদ্ধিসুদ্ধি কি কোনো কালেই হবে না তোর ? চিরকেলে কথা—'জন-জামাই-ভাগনা, তিন হয় না আপনা'।

বেদান্ত বলেছিল, জামাই কেন ? পাচ্ছে তো মেয়ে। বাবার জিনিসে তো তার সমান অধিকার ?

ওসব একেলে ফ্যাসানের কথা ছাড় বেদা। মেয়ের মানেই তো সেই পরের ছেলে এসে কর্তা হয়ে বসবে।

বেদান্ত হেসে উঠেছিল, তা পরের মেয়ে এসেও তো সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে বসে মা। এসেই ক্রমশঃ সবাইকে কোণঠাসা করে ছাড়ে। ছেলে তো মহাকালীর পায়ের তলার শিব। তবু তো লোকে ছেলেকেই আপন ভেবে সব দিতে চায়।

মা রেগে ওঠেন, তোর হচ্ছে এসব এঁড়েতর্ক। এতে কে জিততে পারবে ? আবহমানকাল যা চলে আসছে, আমি তো বুঝি সেটাই ভালো। সেকালের পণ্ডিতজনের মাথা-বুদ্ধির ফসল সেটা। নিশ্চয়ই তার মধ্যে 'হিত' আছে।

মাগো। পণ্ডিতজনেরা তো ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন শিশুবিবাহের, বাল্যবিবাহের—সেটাই চালু থাকলে ভালো হতো।

মা আরো রেগে বলেছিলেন, ভালোই তো। তাতে এই তোমার মতোন

বুদ্ধিহীন ছেলেরা 'ছাড়াগরু' হয়ে ঘুরে বেড়াবার সুবিধে পেত না। যাক আমি বলে রাখছি, যতদিন না তুই বিয়ের মত দিচ্ছিস, ততদিন আমি এখানে ফিরছি না। তুই বোন-বোনাই নিয়ে সুখে থাক।

বেদান্ত দুষ্টু হাসি হেসেছিল, বিয়ের 'মত' দেওয়া? কার মত চাই? তোমার এই 'দাগী ছেলে'কে কেউ মেয়ে দেবে?

কী, দেবে না? আচ্ছা দেখব দেয় কিনা!

অর্থাৎ তখনো তিনি মনে মনে কনে খোঁজার স্বপ্ন পোষণ করছেন।

তবে মার এতো বিরোধিতা সত্ত্বেও খুকু তার বাবার ব্যবসার অর্ধাংশের মালিক হয়ে গেছে। কারণ বেদান্তর মতে না হওয়াটা মেয়েদের প্রতি অবিচার।

অতএব বেদান্ত বোন-বোনাই নিয়ে সুখেই আছে। সত্যিই 'ছাড়াগরু'র জীবনের স্বাধীনতা ভোগ করছে। এখানে-সেখানে বেড়াতে যায়, হঠাৎ হঠাৎ দু'-চারদিনের জন্যে মার কাছে গিয়ে হাজির হয়। মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাড়া লাগায় এবং একাই ফেরে। মা কাঠকবুল।

হয়তো মাও এই কাশীতে এসে সারাজীবনে অনাস্বাদিত ওই সুখটির স্বাদ পেয়ে আর ছাড়তে চাইছেন না।···ওই 'ছাড়াগরু' হয়ে বেড়াবার স্বাধীনতা-সুখ।

তারপর? তারপর তো ওই—

অনেকদিন দেখা হয়নি বন্ধুর সঙ্গে, অনেকদিন। হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে এসে ধপাস করে বসে পড়ে ঘাড় চুলকে লাজুক-লাজুক ঘোষণা, বুঝলি, ইয়ে—আবার একটু ফেঁসে গেছি।

বন্ধু বলল, এত ফাঁসাফাঁসি সত্ত্বেও তোর যে কেন আজ অবধি একবার ফাঁসি হল না তাই ভাবছি। যাক, এবারের কেসটা কী?

বেদান্ত আর একটু মাথা চুলকোলো, এবারের কেসটা—মানে একটু বেশি জটিল।

যাক, বাঁচা গেছে! এতেই তাহলে ফাঁসিটা হয়ে যাবে। তো বল শুনি।

বেদান্ত বলল, বলছি। টেবিল থেকে তোর ওই কাগজপত্রগুলো সরা।

ওগুলো তোকে কি করছে?

না, করছে না কিছু। মানে টেবিলটা একটু ফাঁকা হয়।

টেবিল নিয়ে তোর কী দরকার?

বেদান্ত বিনয়ে গলা গলায় বলল, জানিস তো ভাই, চিরদিন আমি টেবিলে না বসলে কথা বলতে ঠিক সুবিধে পাইনে।

বাড়িতে আমার বৌ আছে জানিস ? সে এসব বেয়াড়াপনা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, বুঝলি ?

বুঝেছি। বৌ। অতএব কারুর কিছু এদিক-ওদিক চলবে না। তো 'বৌ' এসেছে ?

এসেছে মানে ? কোথা থেকে ? কেন, তুই কি ঢোকবার সময় তাকে কোথাও বেরোতে দেখলি ?

আমি! আমি কখন দেখতে গেলাম! দেখতে পেলেই তো চায়ের জল চড়াতে বলতাম।

ঘরের পর্দাটা একটু তুলে উঠল।

'চড়ানো হয়েছে'—বলতে বলতে চিত্রা ঢুকলো।

হয়েছে! আঃ!

বেদান্ত বলল, এইজন্যেই তোর বৌকে এতো ভালবাসি!...

বৌয়ের চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কৌশিক দু'হাত জড়ো করে বলল, দোহাই তোমার বাবা! আমার একটিমাত্র বৌ। ওদিকে আর বেশি ভালবাসার নজর দিও না।

তুমি একটি বুনো শূয়োর।...শুনুন ইয়ে—

ইয়ে নয়, চিত্রা!

বৌ হেসে ওঠে, ভালবাসার দৃষ্টান্ত বটে একখানা। নামটা পর্যন্ত বিস্মরণ! তা কী শুনবো বলুন ?

বলছি, কী বলছিলাম যেন ? ওঃ! বলছিলাম, কবে ফিরলেন ?

ফিরলাম মানে ? কোথা থেকে ?

বাঃ, সেই যে অনেকদিনের জন্যে বাপেরবাড়ি গিয়েছিলেন। আপনার হাতের চা খাওয়া হল না।

চিত্রা অবাক হয়ে বলে, কবে ?

সেই কবে যেন ? এই কৌশিক, বল না ?

কৌশিক হাসি চেপে বেশি গম্ভীর হয়ে বলল, সেই উনিশশো বিরাশি সালে, তুমি যখন আমায় অনাথ করে মাস-চারেকের মত চলে গিয়েছিলে—হা হা হা!

কী কাণ্ড! অ্যাঁ! তারপর আর আসেননি ?

কই না-তো!

সত্যি তো! 'গুণ্ডা' জন্মাবার পরে কই আর ? ছিলেন কোথায় এতদিন ?

এমনি এখানেই।

আশ্চর্য। আমি তো ভেবেছি, আপনি বাইরে কোথাও চলে গেছেন। সেটার মুখেভাত-এর সময় কিন্তু খোঁজ করা হয়েছিল, আপনি ছিলেন না কলকাতায়।

বেদান্ত চমকে বলল, কার মুখেভাতে?

কৌশিক হেসে ফেলে বলল, গুণ্ডার! আর কার জন্যে আমার মাথাব্যথা!

গুণ্ডা! গুণ্ডা কে?

কৌশিক হো-হো করে হেসে ওঠে, তাও জানিস না? গুণ্ডা আমাদের ছেলেটা! মহাগুণ্ডা।

তোর—ছে-লে—তোর ছেলে! তোর ছেলে মানে? ওহো হো। বুঝেছি। সেইজন্যেই সেই তখন—কই আন্ দেখি?

আনব। না এনে কি ছাড়ব। তার আগে চা আনব। যাক, এতদিন পরে হঠাৎ যে? নতুন খবর আছে?

চিত্রা অবশ্য চোখ নাচিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে নতুন খবর হিসেবে বেদান্তর বিয়ের কথাই বলতে চাইছিল। কৌশিক সিগারেটটা মুখে ঝুলিয়ে রেখেই বলল, ওর আবার নতুন খবর! ওর খবর সেই আদি ও অকৃত্রিম! উনি ফেঁসেছেন!

এই রে—

সর্বনাশ!…ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল বেদান্ত। বলে উঠল, মেয়েটাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে এসেছি—

মেয়েটাকে! কোন্ মেয়েটাকে?

কৌশিকরা দু'জনে একই সঙ্গে চমকে উঠে একই কথা বলে উঠল।

বেদান্ত ব্যস্তভাবে বলল, বলব এসে, সব বলব। এখন একটা কথা—ইস্! একদম ভুলে গিয়ে—কৌশিক শোন্, তোর এখানে একটা মেয়েকে একটু জায়গা দিতে হবে।

একটা মেয়েকে!

কর্তা-গিন্নীর চোখে চোখে ভাববিনিময়ের বিদ্যুৎ খেলে গেল।

অবশ্য বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল না, দু'জনের একই ভাব। বিপন্ন, বিব্রত, আতঙ্ক, হতাশা।…হতাশাটা অবশ্যই বন্ধুকে 'না' করা যাবে না, সেই নিরুপায়তায়।

তবু কৌশিক সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে বলল, বলিস কী রে! একটা

'মেয়ে'কে।...এই একখানি মেয়েকে জায়গা দিয়েই তো সেই পুরাণের বলিরাজার দশা ঘটেছে। বামনদেবের তৃতীয় চরণটি রাখতে মাথা পেতে দিতে হচ্ছে। আবার 'মেয়ে'?...তুই এক ডজন ছেলেকে জায়গা দিতে বললি না কেন ভাই।

বেদান্ত উগ্রভাবে বলল, তোর এসব কথার মাথামুণ্ডু বুঝি না বাবা। রাখতে পারবি কি না-পারবি স্পষ্ট বলে দে।

চিত্রা বরের দিকে একটি তীব্র কটাক্ষপাত করে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, ওর কথা ছাড়ুন। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা সাজিয়ে গজিয়ে ফর্মা বাড়ানোর অভ্যাস তো? তাই সব সময় কথার প্যাঁচ। সামান্য একটা 'মেয়ে' মাত্র, তার জন্যে আবার এত ভাবনা? যান যান, নিয়ে আসুন। ইস্! এতক্ষণ গাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন, আপনি কী?

বেদান্ত অবশ্য প্রশ্নের শেষটুকু পর্যন্ত শোনার জন্যে দাঁড়াল না। 'নিয়ে আসুন' শুনেই দুদ্দাড় করে নিচে নেমে গেল।

কৌশিক বৌয়েব চোখে চোখ রেখে বলল, এটা কী হল?

কী আর হল। অনিবার্যকে মেনে নেওয়া হল। মেনে নিতে হলে হাসিমুখে নেওয়াই ভাল।

ওর নিজের বাড়ি থাকতে এখানে কেন!

নিজের বাড়ি!

চিত্রা মুচকে হেসে বলল, নিজের বাড়িতে কি কেউ কখনো যেখান-সেখান থেকে 'একটা মেয়ে' এনে তুলতে পারে? সে সাহস জন্মায় শুধু এই 'একখানা' মেয়ের বেলায়।

নিজের বুকে হাত ঠেকাল। বলল, যাদের জন্যে বাবুদের বলি রাজার দশা হয়।

গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল, কৌশিকের দরজা থেকে একটু দূরে। হন-হন করে চলে এল বেদান্ত। ভিতরে একটি নারীমূর্তি। অসহায় চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে কৌশিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

ওই বাড়িটার মধ্যেই তো ঢুকল ভদ্রলোক। বলে তো গেল 'এক্ষুনি আসছি'। তবে? এতো দেরি কেন?

প্রতীক্ষার প্রহর প্রতিটি লহমায় কুপিয়ে কাটে।...কী বলা যায় একে? মেয়ে? মহিলা? না কি যুবতী?

বেদান্ত হন্তদন্ত হয়ে চলে এসে একগাল হেসে বলে উঠল, আছেন?

বাঁচলাম বাবা। উঃ, যা ভয় ধরে গেছল। ভাবতে ভাবতে আসছি—এসে না দেখি গাড়ি খালি। সওয়ারি হাওয়া

যুবতী তার পানপাতার মত মুখের ওপর যেন আলগাভাবে ভাসিয়ে বসানো বড় বড় চোখ দু'টো তুলে বলল, হঠাৎ এরকম ভাবলেন কেন?

হঠাৎ কী? যা দেরি করে ফেললাম! একদম ভুলে গিয়েছিলাম, বুঝলেন? মানে বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা—চলুন চলুন।

দরজাটা খুলে ধরে।

যুবতী কিন্তু চট্ করে বেরিয়ে আসে না। ভাবটা, নিশ্চিত ছেড়ে অনিশ্চিতে ঝাঁপ দেওয়ার দ্বিধা। তবু তো গাড়ির মধ্যে বসে আছে। জানা লোকের গাড়ি:

কই, আসুন!

কোথায় যাব?

এই তো, আমার এই বন্ধুর বাড়িতে। এখানেই এখন কিছুদিন থাকতে হবে আপনাকে—বুঝলেন? যতদিন না আপনার ইয়ের মানে, আপনার আত্মীয়র খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

পানপাতা মুখে ভাসা-ভাসা চোখ আবার উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হল, আর আপনি?

আমি? আমি তো, মানে আমাকে তো আমার নিজের বাড়িতেই যেতে হবে।

আমায় রেখেই চলে যাবেন?

আহা 'রেখেই' কেন? বসব, চা খাব, ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, তবে তো!

তারপর রেখে দিয়ে চলে গিয়ে ভুলে যাবেন!

ভুলে যাব? ভুলে যাব মানে?

তা রাস্তার মাঝখানে গাড়ির মধ্যে বসিয়ে রেখেই তো ভুলে গেছলেন. আর এ তো একটা বাড়ির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যাচ্ছেন।

বেদান্ত বলল, দেখুন আমি হয়তো একটু ভুলো আছি, তবে পাষণ্ড নয়। বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল—তাই—তা বলে আপনাকে রেখে গিয়ে—

পানপাতা লজ্জিতভাবে বলল, আমায় মাপ করবেন। আমি বড় অকৃতজ্ঞ! আমি আপনার ওপর যে উৎপাত করেছি—

আঃ! এসব কথা কেন? চলুন তো।

অনিচ্ছা ভারাক্রান্তভাবে বেদান্তর সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়াল মেয়েটা কৌশিকের

গেট-এর সামনে। গেটটা বুগেনভেলিয়া গাছের শাখায় ঢাকা। শাখাগুলো উজ্জ্বল লাল ফুলে আচ্ছন্ন।

গতকাল এইভাবেই আর একটা গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ভয়ে ভয়ে, কিন্তু অনিচ্ছুকভাবে নয়। তখন একটা আশা ছিল, আশ্বাস ছিল। তবু কিছুক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিককেও।

বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় কী?

খুকু বলেছিল, তোর বাড়িতে তুই যাকে ইচ্ছে এনে রাখতে পারিস দাদা, বলার কিছু নেই। অধিকারও নেই। তবে মার অনুপস্থিতিতে আমি এতবড় একটা দায়িত্ব নিতে পারি না।

বাঃ, তোর আবার কী দায়িত্ব? কোনো একটা ঘরে ওর থাকা শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই তো হল। তারপর গোবিন্দ আছে, আর তার রান্নাঘর আছে।

বোকার মত কথা বলিস না দাদা। ঠেকে-ঠেকেও তোর শিক্ষা হল না! মেয়েটার পরিচয় জানিস?

বললাম তো ট্রেনে একসঙ্গে এসেছে। হাওড়ায় ওকে নিতে আসার কথা ছিল, কী জন্যে কে জানে আসতে পারেনি, তাই আমাকে ধরে পড়েছে, ওর সেই আত্মীয়র খোঁজ করে দিতে। তা ট্যাক্সি নিয়ে ঘোরাঘুরি তো করলাম ঢের, সেই কী এক রাস্তা, সে যে কলকাতা শহরের কোন্‌খান, তা জানি না। এখন ভদ্রলোকের মেয়েটাকে তো রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি না?

থানায় জমা দিয়ে আসা উচিত ছিল।

থানায়? চমৎকার! তারপর ওর কী অবস্থা হতে পারে জানিস কিছু?

সব জানি দাদা। চোখ-কান বুজে তো আর চলি না পৃথিবীতে। তবে ওই মেয়েকে বাড়িতে রাখার পর হঠাৎ যদি পুলিস এসে তোমায় থানায় নিয়ে যেতে চায় নারীহরণের দায়ে? সেটা অসম্ভব?

বেদান্ত বলল, 'অসম্ভব' বলে কিছুই নেই। হতেও পারে। তবু মানুষ মাত্রকেই যদি অবিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তো বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না।

খুকু বলল, ঠিক আছে, তুমি তোমার বেঁচে থাকার মানে খুঁজতে বসো—আমি আর তোর ভগ্নীপতি আমাদের দর্জিপাড়ার বাড়িতে চলে যাই।

কী মুস্কিল! তোদের যাওয়ার কথা উঠছে কেন? ও তো আর থাকতে আসেনি! দু'-একদিন হয়তো—

কিন্তু খুকু মায়ের মেয়ে। কাঠকবুল। হয় এস্পার, নয় ওস্পার।

অতএব গেট থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল বেদান্তকে তার ঝঞ্ঝাটটি ঘাড়ে নিয়ে।

ইস্, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মেয়েদের একশো হাত দূরে থাকব। কোথা থেকে যে কী ঘটে। খুকু আমার নিরুপায়তাটা বুঝল না। মেয়েটা যখন গাড়ির অত লোকের মধ্যে আমাকেই ধরে বসল, তখন আমার কী করাব ছিল? ছুঁড়ে ফেলে দেব?

মা যে সেই কী একটা বলেন, 'নিয়তি' না কি, আমারও এটা তাই। ভাবল বেদান্ত। আর গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবতে লাগল, পর পর ঘটনাটা কী ঘটেছিল।

সেই তো শনিবাব দিনকে, মার কাছে বেনাবসে গেলাম—

হ্যাঁ।

যেমন হঠাৎ হঠাৎ মার কাছে বেনারসে চলে যায়, বেদান্ত তেমনি গিয়েছিল। যেমন দু'দিন ধরে চারবেলা মার কাছে মার হাতের রান্না, প্রসাদের প্যাঁড়া আর বিশ্বনাথের গলির 'মালাই' এবং তার সঙ্গে মায়ের গঞ্জনা, ধিক্কার আর বকুনি খেয়েটেয়ে ফিরে আসছিল, নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে।···

অসুবিধের মধ্যে, মাত্র দু'দিনের মেয়াদে যাবার দরুন, ট্রেনে বার্থ রিজার্ভেশান করে উঠতে পারেনি। তাই বাধ্য হয়েই ফার্স্ট ক্লাস টিকিট পকেটে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে হয়েছিল।

যাকৃগে, একটা রাতের তো মামলা, ভেবে বেদান্ত আর 'বার্থ-বার্থ' করে ছুটোছুটি করেনি। ভেবেছে এত লোক এইভাবে যাচ্ছে, আমারই বা এত কী? যথেষ্ট সময় থাকতেই এসেছিল, উঠে বসেছিল একটা কামরায়। আর ভাগ্যবান বলেই বোধ হয়, উঠেই জানলার ধারের একটা সীট পেয়ে গিয়েছিল। একটা রাত বসে কাটানো আর এমন কী?

কিন্তু কে জানতো সেই একটা রাত্রিই একাধিক সহস্র রজনীর ধাক্কা ধরবে!

ট্রেন ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে হুড়মুড়িয়ে উঠে আসার দলের মধ্যে যখন ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি, তখন সেই ঠেলাঠেলি থেকে কষ্টে আত্মরক্ষা করে এদিকে এগিয়ে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে উঠল, আমায় একটু জানলার ধারে বসতে দেবেন?

প্রস্তাব শুনে হাঁ করে তাকাল বেদান্ত।

পানপাতার মত মুখ, সেই মুখের ওপর ভেসে-থাকা আঁকা ছবির মত বড় বড় দুই চোখ, শ্যামলা রং, লম্বা ছাঁদের গড়ন। বয়েস বত্রিশও হতে পারে, বাইশও হতে পারে।

কান মূলে প্রতিজ্ঞা ছিল, 'মেয়েদের ব্যাপারে আর নয়'! কিন্তু ঠিক এই ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা অটুট রাখতে কী করা যায় ভেবে পেল না বেদান্ত বাগচী। তাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসুন।

মেয়েটার গায়ে একটা হাল্কা স্কার্ফ জড়ানো ছিল। সেটাকে ঈষৎ আলগা করে, একটুক্ষণ হাঁকিয়ে নিয়ে, আস্তে বলল, আপনি বাঙালী দেখেই এমন অন্যায় আবদার করতে সাহস করলুম।

বেদান্ত মনে মনে বলল, তবু ভালো যে বুঝেছ এটি অন্যায় আবদার। মুখে শুধু বলল, না না।

তখনো সারাগাড়ি জুড়ে ঠেলাঠেলির কলরোল চলছে। ভীষণ ভারি ভারি সব মালমোট নিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় গাড়ি রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত।

অন্যায় আবদারকারী মেয়েটি তার ছড়ানো স্কার্ফ নিয়ে বেশ একটু ছড়িয়েই বসেছিল, বেদান্তর পাশে রাখা ছোট্ট সুটকেসটা প্রায় তার আঁচল-চাপা পড়ে গিয়েছিল। একটু জিরিয়ে পরিস্থিতি দেখে অপরিচিতা ছড়ানো স্কার্ফ-আঁচল সরিয়ে সুটকেসটা তুলে ধরে বলল, এটা আপনার?

হুঁ।

নিজের কোলে গুছিয়ে বসিয়ে নিয়ে জিনিসটাকে, নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে বলল, বসুন।

জায়গা অবশ্যই অঢেল নয়, বসলে রীতিমত ঘেঁষাঘেঁষিই হবে। বেদান্ত আত্মস্থভাবে বলল, ঠিক আছে।

ঠিক আছে মানে? সারারাত দাঁড়িয়ে যাবেন নাকি?

থাক না, পরে যা হয় হবে।

তার মানে, আমাকেই উঠে যেতে বলছেন। ঠিক আছে, আমি আর কোথাও জায়গা করে নিচ্ছি, আপনি নিজের জায়গায় বসুন।

বেদান্ত একটু হাসল, বলল, এখানে কারো কোনো নিজস্ব জায়গা নেই। বসে আছেন, বসে থাকুন নিশ্চিন্ত হয়ে।

নিশ্চিন্ত হতে পারলে তো।

অসুবিধেটা কী ?

'পানপাতা' চোখের ইশারায় তার পাশের লোকটিকে দেখাল। বিপুল গোঁফদাড়ি সম্বলিত বিশালকায এক অবাঙালী প্রৌঢ় ভদ্রলোক। বেদান্তর স্কন্দে স্যুটকেসটা তুলে নেওয়া বাবদ যে ইঞ্চি কয়েক জায়গা বার হয়েছিল, সেটুকুকে প্রায় দখল করে ফেলনেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঢুলতে শুরু করেছেন। এবং ঢুলতে ঢুলতে ঢলে পড়বেন এটাই স্বাভাবিক।

ইশারায় অবস্থাটি দেখিয়ে 'পানপাত' আস্তে বলল, আপনি একটু পার্টিশানের ভূমিকা নিতে পারেন।

চমৎকার।

বেদান্ত মনে মনে বলল, আমাকে হঠাৎ কী পেলে হে মহিলা? আমি তোমার অন্যায় আবদার সইব, তোমার বিপদকালে বিপদবারণ হব। মানে কী ?

কিন্তু মনে মনে কী না বলা যায় ?

তাছাড়া বিপদের সঙ্কেত পেয়ে তার নিজেরই বিবেকের কামড় এল। সত্যিই বটে, লোকটা এইদিকেই ঢুলছে।

ভাইসাব।

বেদান্ত তার কাঁধে একটা আঙুলের টিপ দিয়ে বলে, মেহেরবান করকে থোড়া "জাগা" দিজিয়ে।

লোকটা চোখটা না খুলেই বিড়বিড় করে কী বলল।

অতএব আঙুলের খোঁচাটা আর একটু জোরালো করতে হলো। এবং তাতে আধখোলা চোখদুটো পুরো খুলল। অগ্রাহ্যভরে কী একটা বলতে যাচ্ছিল; বোধ হয় বেদান্তর চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সামলে নিল। সুকান্তি সুপুরুষ দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখলে একটু সমীহ আসতে বাধ্য।...যৎসামান্য সরে বসল।

মেয়েটা নিজেকে আরো গুটিয়ে নিল।

বেদান্ত সেই ফালি জমিটুকুর মধ্যেই নিজেকে ভরে ফেলে চুপচাপ বসে থাকল।

গাড়ি চলতে থাকল। এবং পার্টিশানের দেয়ালে ধাক্কা লাগতে লাগল।

প্রায় সারাগাড়ি জুড়েই ঢুলুনির দৃশ্য আর নাকডাকার শব্দ। হঠাৎএকসময়—হ্যাঁ, আচমকাই একসময় পার্শ্ববর্তিনী চাপা গলায় বলে উঠল, শুনুন।

বেদান্ত ঘাড় ফেরাল, আমায় কিছু বলছেন ?

হ্যাঁ। বলছি—আমি যে একা যাচ্ছি, এটা যেন গাড়ির কেউ জানতে না পারে।

বেদান্তর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল।

কী বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝছি না।

মানে, একা যাচ্ছি বুঝতে পারলে বাজে লোকেরা জ্বালাতন করতে পারে।

বেদান্ত গম্ভীরভাবে বলল, একা বেরোবার রিস্ক যখন নিয়েছেন, তখনই তো এটা ভাবা উচিত ছিল।

মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, খুব নিরুপায় না হলে—

কিন্তু আমার পক্ষে কী করা সম্ভব ?

কিছু না। শুধু এরকম ভাব দেখাবেন, আমি যেন আপনার সঙ্গেই এসেছি

আপনার কথাটথাগুলো বেশ অদ্ভুত।

আবার নীরবতা, আবার সরবতা।

অদ্ভুতই। তবু আপনি বাঙালী বলেই—

এতবড় গাড়িখানায় আর বাঙালী নেই, এটা কি আর হতে পারে ?

মেয়েটা চুপ করে থাকল।

এখন জানলা বন্ধ।

কাজেই জানলার বাইরে মুখ বাড়াবার উপায় নেই। চেয়ে আছে মুখ নিচু করে নিজের পায়ের দিকে।

বেদান্ত মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে।

এরকম সৌজন্যহীন কথা বলা তো তার ধাতে নেই। নেহাৎ 'মেয়ে' বলেই নিজেকে কঠোরকঠিন করবার চেষ্টা করছিল। পারল না। একটু পরে নিজেই বলে উঠল, আমি যে বাঙালী সেটা কে বলে দিল আপনাকে ?

মেয়েটা একটু নড়েচড়ে বসলো। বললো, প্রথমটা চট করে আমারও সে ভ্রম হয়েছিল, ভ্রম ভাঙলো আপনার কথায়।

কথা ? তখন আবার কী কথা বললাম ?

মেয়েটা হাসল—বলল, বাঙালীর নিজস্ব কথা।···বিশাল বিশাল প্যাকিং বাক্স নিয়ে একগাদা লোক ঢুকে আসছে দেখে আপনি বলে উঠলেন, 'সেরেছে।' ·একথা আর কে বলতে পারে বাঙালী ছাড়া ?

বলেছিলাম নাকি ?

হাসল বেদান্ত, অসতর্কে লোকে কত কী-ই করে বসে, বলে বসে, তাই না ?

গাড়ির দুলুনি, মাঝে মাঝে ঝাঁকুনিও।

বেদান্তর এপাশের সেই বিশালকায় প্রৌঢ় মাঝে-মাঝেই ঢুলে ঢুলে বেদান্তর গায়ের ওপর পড়ছেন, বেদান্ত আঙুলের খোঁচা দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। আর ভাবছে, বেদান্ত যদি 'পার্টিশান ওয়ালের' ভূমিকাটা না নিত, এই মহিলার কী অবস্থা হতো !

তবে বেদান্তর স্পর্শটা তো বাঁচানো যাচ্ছে না। অবস্থা যখন চিঁড়ে-চ্যাপ্টা।

খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু মনে মনে হাসল ও। আমার তো আর একগাদা দাড়িগোঁফের জঙ্গল নেই এবং গায়ে বোটকা গন্ধ।

হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে একটু সাহায্য ভিক্ষা করছি। যখন নেমে যাবেন, আমাকে ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে যাবেন না।

বেদান্ত গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, আর তারপর ?

তারপর আপনার ছুটি। স্টেশনে লোক থাকবে।

ও, আচ্ছা !

কিছুক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ হঠাৎ একটা কথা, আচ্ছা প্লাটফর্ম টিকিট কাটবার জায়গাটা কোথায় ?

কেন ? হঠাৎ প্লাটফর্ম টিকিটে কী দরকার পড়ল ?

না, মানে ইয়ে, ও লিখেছে ওইখানে থাকবে। নাহলে ভিড়ের মধ্যে বুঝতে পারা যাবে না।

বেদান্তর মুখে আসছিল, 'ও'-টি কে ?

বলল না। তবে বলার ভঙ্গীতে মনে হল, বোধ হয় 'কেউ'।

কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় এবং অনির্দিষ্ট জায়গায় কোথাও কোনোখানে কী সেই 'ও'টিকে দেখতে পাওয়া গেল ?

সারা প্লাটফর্ম তো চষে ফেলল বেদান্ত সেই পানপাতা-মুখ আর ভাসা ভাসা (ক্রমশ জলে ভাসা) চোখ মেয়েকে নিয়ে। যাকে দেখলে বোঝা যায় না বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ না বাইশ-তেইশ।

এভাবে একটা অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে আসা উচিত হয়নি আপনার। বলল বেদান্ত।

মেয়েটার দুর্গতি দেখে রাগও হচ্ছে, আবার অসহায়তা দেখে মায়াও হচ্ছে।

মেয়েটা শুধু চোখ তুলে তাকাল।

ঠিক আছে, যেখানে যাবার কথা, ঠিকানাটা বলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

ঠিকানা?

মেয়েটা আস্তে আস্তে বলল, ঠিকানা জানি না।

ঠিকানা জানেন না?

বেদান্ত প্রায় ফেটে পড়ল, যে আপনাকে স্টেশনে রিসিভ করতে আসবে, তার ঠিকানা জানেন না? বুঝতে পারছি না, কে কোন্ ধাপ্পাবাজের কবলে পড়েছে, আপনি না আমি? জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হচ্ছি, তিনি আপনার কী রকম আত্মীয়?

আত্মীয় কিছু নয়। মেয়েটা একটু ঢোক গিলে বলল, বন্ধু।

ওঃ, বন্ধু! মানে ভবিষ্যতে পরমাত্মীয় হবার আশা রাখেন, কেমন?

মেয়েটা বেদান্তর উষ্মা দেখে এতোর মধ্যেও একটু হেসে ফেলল।

বেদান্ত বলল, বন্ধুত্বের সূত্রটা কী? সহপাঠী? পাশের বাড়ি? বৌদির ভাই? মাসির দেওর? পিসির ভাগ্নে? বাবার বন্ধুপুত্র? দাদার বন্ধু? দিদির বন্ধুর দাদা? শুনি, শুনি।

ওঃ, আপনি তো কম রাগী নন? যাক গে, আপনাকে আর ভোগাবে না, আপনি নিজের গন্তব্যে চলে যান।

আর আপনি?

ভাগ্যে যা হয় হবে।

বেদান্ত রাগের গলায় বলল, এতক্ষণের পর আপনাকে ভাগ্যের হাতে সমর্পন করে যাব? জানতে চাই, আপনি কিসের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিত ছিলেন, আপনাকে রিসিভ করতে স্টেশনে লোক থাকবে? নিশ্চয় কোনো চিঠি?

হুঁ।

তা সে চিঠিতে ঠিকানা নেই?

মেয়েটা আস্তে বলে, আছে। তেরোর তিন নীলমণি সরকার লেন।

আর?

আর কিছু না।

তা কলকাতা-কলকাতা কত? কোথায় সেই আনলাকি 'তেরো' নীলমণি কার লেন? কলকাতার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোন্ প্রান্তে?

কী করে জানব? আমি কলকাতার কিছু চিনি? সেই পাঁচ-ছয় বছর

বয়েসে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

'চলে যেতে হয়েছিল'—এর মধ্যে যেন একটা বেদনার আভাস।

বেদান্ত একটু নরম গলায় বলল, বেনারসে কোথায় থাকতেন?

হাউস কটোরা।

ও:! আমার মা বেনারসে থাকেন, অহল্যাবাইয়ের কাছে।

আপনার মা বেনারসে থাকেন?

হঠাৎ ভারী উজ্জল দেখায় মেয়েটার মুখ।

হুঁ। মায়ের কাছেই এসেছিলাম। ফিরছি।

মেয়েটা বলল, আগে জানলে বেশ আপনার মাকে দেখতুম। কাশীতে একা থাকেন?

হ্যাঁ, আমার ওপর রাগ করে।

হেসে ফেলে মেয়েটা।

আপনার মত সোনার চাঁদ ছেলের ওপর রাগ করে। বিশ্বাস হচ্ছে না।

অবিশ্বাসের কী আছে? বাইরের থেকে যাকে যেমন দেখা যায়, সে ঠিক তেমন নাও হতে পারে।...যাক, বেনারসে আপনার কে আছেন?

মামা-মামীমা।

তাঁরা আপনাকে একা ছাড়লেন?

হাসল একটু, দেখে কি মনে হচ্ছে, কেউ ছেড়েছে? বলে-কয়ে এসেছি?

তার মানে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছেন?

মানেটা তাই দাঁড়াচ্ছে বটে।

অথচ যার ভরসায় অকূলে ঝাঁপ দিয়েছেন তিনি বেপাত্তা, কেমন! আশ্চর্য।

মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল। মুখে রাগ-অপমানের জালা, দেখুন আমাকে নিয়ে আপনাকে এতক্ষণ ভুগতে হচ্ছে, আপনার পক্ষে বিরক্তি আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব কিছু না জেনে কারুর সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক নয়। আমি বলছি, এবার আপনি—

আমি সরে পড়ি, কেমন? আচ্ছা গেলাম।

বেদান্ত বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে একটু এগিয়ে যায়।

মেয়েটা একটুক্ষণ প্রায় স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে থেকেই হঠাৎ হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল।

বলল, আমায় মাপ করুন, ওর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আপনাকেই আমার ভার বইতে হবে।

ট্যাক্সিতে উঠে বসার পর বেদান্ত বলে উঠল, অনেকবারই একটি নাম শুনছি, সেটা হচ্ছে—'ও'। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাম অবশ্যই আছে, সেটা জানতে পারি কী?

নাম? নাম—শিশির। শিশির চক্রবর্তী।

যাক, তবু অন্ততঃ নামটাও জানা গেল।

মনে মনে বলল, যা দেখছি, সেই 'কী জাতি কী নাম ধরে, কোথায় বসতি করে, আমি তো চিনি না তারে, চেনে মোর দুনয়ন।'—সেই গোছের।

মুখে বলল, তবে ধামটা জানতে পারা যাচ্ছে না। আচ্ছ'—ইস্, এতক্ষণ মনে পড়েনি—

বলেই বলল, তাই ব' কী হবে কে জানে। বলছিলাম, আপনার সেই চিঠির খামটা যদি দেখাতেন, হয়তো পোস্ট অফিসের ছাপ থেকে জোনটা ধরতে পারতাম। তবে আমাদেব স্বাধীন দেশের ডাকঘরগুলো তো একদম কালিমাহীন। ডাকঘবের ছাপটাপ দেওয়া হয় বোধ হয় জল দিয়ে। অন্ততঃ আসল জায়গাটায়। কোথা থেকে আসছে এবং কোন্ তারিখে আসছে, ধরে কার সাধ্য। তবু দেখতে পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম—

মেয়েটা ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিত গলায় বলে, খামটা তো রাখিনি।

খামটা রাখেননি?

না।

সাধে বলছিলাম, আপনার সবটাই কেমন অদ্ভুত, রহস্যাচ্ছন্ন। চিঠির খামখানা তাড়াতাড়ি ফেলে দেবার কী দরকার হচ্ছিল?

বাড়ির লোকের চোখে পড়াব ভয়ে।

ওঃ, চিঠিটাও তাহলে ছিঁড়ে ফেলেছেন নিশ্চয়?

তা নয়। ওটা এসেছিল আমার এক সহপাঠিনীর বাড়ির ঠিকানায়। সেটা হঠাৎ দেখতে পেলে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই—

ও।

একটা প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে। 'সহপাঠিনী' আছে যখন, তখন 'পাঠ'-এর ব্যাপার আছে, অথবা ছিল।

একটু পরে বেদান্ত আবার কথা বলল, বেনারসেই পড়াশুনা করেছেন?

পড়াশুনো! মাত্র স্কুলের গণ্ডিটা পার হওয়াকে যদি পড়াশুনো করা বলেন,

তো করেছি। ওখানের কন্যাকুমারী বালিকা বিদ্যামন্দিরে।

বেদান্তর মুখে আসছিল, মহানুভব শিশির চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপটা কতদিনের, কী সূত্রে? কিন্তু ভদ্রতায় বাধে, তাই চুপ করেই থাকে।

কিন্তু মেয়েটা কী ভেবে নিজেই হঠাৎ বলে উঠল, শিশির আমার সহপাঠিনীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়। ওঁরা কখনো কখনো বেনারসে আসে, সেইটুকুই পরিচয়। দুর্গাপুরে কাজ করে—

হাতের ব্যাগ খুলে একটা ভাঁজকরা কাগজ বার করে বলল, পড়ে দেখুন, যদি এটা থেকে কিছু সন্ধান করতে পারেন—

সেরেছে। আমি আপনার লাভ-লেটার পড়ব কী?

লাভ-লেটার। হুঁঃ, এতো সাহস হবে? নেহাৎই কেজো চিঠি, পড়লে কিছু এসে যাবে না।

তা হোক। পরের চিঠি পড়তে আছে নাকি?

নেই, তাই না? আহা! আমার মামাকে যদি এই সৎ উপদেশটি দিতে পারতেন?

আপনার মামাকে? ও হো হো।

হেসে ওঠে বেদান্ত প্রায় হা-হা করে সেই তার দেবদূতমার্কা হাসি।···বুঝেছি। তাই সহপাঠিনীর ঠিকানায় আশ্রয় নেওয়া। বাস্তবিক, এক-একজনের এই একটা ব্যাড হ্যাবিট এতো বেশী থাকে।

পরের চিঠি পড়া হল না।

তবু কথায় কথায় জানা হয়ে গেল কিছু কিছু।

জানা গেল, মেয়েটির বাপের দেওয়া নাম মুক্তি। তবে মামা-মামীর ওই নামটা না-পছন্দ। তাই তাঁরা বলে থাকেন, মুক্তো।

জানা গেল, শৈশবে মা-বাপ-হারানো এই ভাগ্নীটাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন বটে এবং খেতে পরতেও দেন অবশ্যই, নচেৎ বেঁচেবর্তে আছে কী করে। তবে সেটা উসুল করেও নিতে ছাড়েন না।

তা সেটা কিছু নয়, আসলে এখন মামা তাঁর এক সদ্য বিপত্নীক বেহারী বন্ধুর ভাঙা হৃদয় আর ভাঙা সংসার আস্ত করে তোলবার মহৎ ইচ্ছায় এই যুবতী ভাগ্নীটিকে কাজে লাগাতে চান এবং সেই চাওয়াটি পূর্ণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

বেহারী?

তাতে কী? বাঙালীর থেকে ভাল বাংলা বলে।

বিপত্নীক?

তাতে কী? মুক্তি কখনো 'দোজপক্ষে বিয়ে'র কথা শোনে নি?

বয়েস?

পুরুষের আবার বয়েস! স্বাস্থ্যটি দেখোনি? সাতটা বাঘে খেতে পারে না। এখনো রোজ একশটি ডনবৈঠক দেয়, মুগুর ভাঁজে।

আর মুক্তোই কি কচি খুকি? বয়েসের গাছ-পাথর আছে?

প্রধান ব্যাপারটা ভাবছ না তুমি আহ্লাদী মেয়ে?

লোকটা যে টাকার কুমীর।

সেই টাকার মালিক হয়ে বসবে তুমি। একেবারে সর্বময়ী কর্ত্রী। ছেলে নেই। শুধুই পাঁচটা মেয়ে, তাদের মধ্যে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে, একটা আরা জেলায়, আর একটা বালিয়া জেলায়। বাপ সাতজন্মে আনে না। আগের গিন্নী থাকতেই আনত না তো নতুন গিন্নীর সংসারে!

আর তিনটে মা-মরা মেয়ে আছে বটে, ছয় আট আর দশ মত, তা তাদেরই বা বিয়ে দিয়ে বাড়িছাড়া করতে কতক্ষণ?

তারপর থেকে তো এই নতুন গিন্নীর অগাধ সুখের জীবন। টাকার গদিতে শোবে তুমি, টাকার বালিশে মাথা রাখবে। বিশ্বনাথ গলিতে আর দশাশ্বমেধ রাস্তায় দু-দুটো বেনারসী শাড়ির দোকান লোকটার। এবেলা ওবেলা বেনারসী পরবে।

তাছাড়া একা থাকার কষ্টও সইতে হবে না মুক্তিকে। ভাবী বর মামা-মামীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাঁদেরও নিয়ে গিয়ে কাছে রাখবে।

বিশাল বাড়ি, অগুনতি ঘর, অসুবিধে কিছু নেই। ছোট ছোট মামাতো ভাইবোনেরা তো 'দিদি' বলতে অজ্ঞান, তারাও বাঁচবে। এমন পাত্রের নামে নাক তুলছে মুক্তি!

ঠিক এইভাবেই অবশ্য বলেনি মুক্তি। তবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দাঁড়িয়েছিল এইরকম। পরবর্তী ইতিহাস তো আগেই বলা হয়েছে।

কৌশিকের বাড়িতে প্রথমটা একটু আড়ষ্ট হয়েই থেকেছিল মুক্তি। কিন্তু চিত্রার কথার দাপটে সেই আড়ষ্ট ভাঙতে বেশী দেরি লাগে নি।

তাছাড়া ওদের বাচ্চাটি। সেই তো একাই একশো! সংসারে যে কোন রকম বেপোট বেমক্কা অবস্থা ঘটুক, বিরোধ-বিরুদ্ধতা, মনোমালিন্য, অসুবিধে,

অস্বস্তি, লজ্জা, সঙ্কোচ—একখানি মনোমুগ্ধকর শিশু থাকলে অর্ধেক সমস্যার ফয়সালা।

বাড়িতে নতুন বৌ এলে, সে একটা শিশু পেলে বর্তে যায়। তার মাধ্যমেই অনেক কিছু সহজ।

মুক্তি অবশ্যই এখানে কনে-বৌয়ের ভূমিকায় আসে নি। তবে চিত্রা আর কৌশিক আড়ালে হাসাহাসি করে, শেষ পর্যন্ত দেখো, ওই 'নীলমণি সরকার লেনটি' কল্পলোকেই থেকে যাবে। এবং—

কিন্তু বেদান্ত বাগচী তো আর ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।

মুক্তিকে রেখে দিয়ে চলে গিয়েই সে হদিস মেলার সম্ভাব্য সব লাইনগুলোয় তল্লাসী চালাবার একটি ছক করে ফেললো এবং একবেলায় যতটুকু এগোনো সম্ভব তা এগিয়ে, আবাব সন্ধ্যার পর এসে হাজির হল।

কৌশিক বলল, এসেছিস। থ্যাঙ্কিউ।

চিত্রা বলল, বাঁচলাম বাবা!

বেদান্ত চিত্রার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন, আপনারা কি ধরে নিয়েছিলেন, ওই ওয়ারিশবিহীন মহিলাটিকে আপনাদের স্কন্ধে চাপিয়ে সরে পড়েছি?

চিত্রা মুচকি হেসে বলল, এমন বোকার মত কথা ভাবতে যাব কেন? দামী রত্নটিকে ব্যাঙ্কের লকারে রেখে গিয়েছেন, অতএব নিশ্চিন্ত। কিন্তু রত্নটি যে দিশেহারা। লকারকে তেমন সেফ্ ভাবছেন না। তাই সারা বিকেল ঘন ঘন পথপানে আঁখি, দৃষ্টিতারকা বাতায়নেই নিবদ্ধ। এবং—

যাক্, 'এবং'টা বাকী রাখুন মিসেস। সাহিত্যিকের ঘর করে করে ভাষার উৎকর্ষ তো ভালই দেখছি!

চিত্রা হেসে উঠল, তবে তো আপনি খুব বুঝেছেন! এ ভাষা কি ওই অতি আধুনিক লেখক কৌশিক রায়ের? 'বাতায়ন' 'দৃষ্টিতারকা' এসবের ব্যবহার জানে ও? এ হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম বঙ্কিমী ভাষা। যাক, আসলে মহিলা একটু আড়ষ্ট।

কৌশিক বললো, সেটাই স্বাভাবিক। তার জন্যে তুমি দোষ দিতে পার না। পরিস্থিতিটা ভাব। মাত্র একবেলার পরিচয়—

চিত্রা কটাক্ষ করে বলে, আর বাগচীমশায়ের সঙ্গে বোধ হয় যুগ-যুগান্তরের?

তোমার ফাজলামি রাখো। মহিলাটিকে খবর দাও, তাঁর চেনাজন এসে গেছেন!

চেনা ?

বেদান্ত বলে উঠল, এত সহজে চেনাজনের দাবি করতে বসব ? কে যে কাকে চিনেছে, সেটাই প্রশ্ন।

চিত্রা বলে উঠল, কেউ যে কাকেও চিনিনাকো সেটাই মস্ত বাঁচন।

তা বটে। বেদান্ত হেসে উঠল, তা বটে। তা নাহলে নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কি-নাচন। তাই না ? যাক—মহিলা আপনাদের বেশ অস্বস্তি ঘটিয়েছেন মনে হচ্ছে !

তাহলে তো আপনি ভীষণ বুঝদার ! অত্যন্ত সভ্য শান্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। মনের মধ্যে যে এত উচাটন, ধরতে দিচ্ছিলেন নাকি ?

তবু তো ধরে ফেলেছেন।

হাসল বেদান্ত।

চিত্রা বলল, সে আলাদা কথা।

কৌশিক বলল, কারো কারো 'এক্সরে আই' থাকে। চিত্রা সেই চক্ষুর অধিকারিণী ! যাক—ডাকো তাকে চিত্রা। উঃ, গুণ্ডাটা এই ক'ঘণ্টার মধ্যে ওকে এত ভজে ফেলেছে ! এখন বোধ হয় তাকে নিয়েই ব্যাপৃত।

চিত্রার পিছু পিছু চলে এল মুক্তি। কোলে চিত্রার ছেলে। যার নাম দিয়েছে গুণ্ডা !

বেদান্ত বলে উঠল, বাঃ, আপনাকে তো এরই মধ্যে বেশ চিনে নিয়েছে !

বেদান্তকে দেখে মুক্তির মুখে যে আলো জ্বলে উঠেছে তা চাপা থাকে না।

সেই আলো-আলো মুখে বলে ওঠে, দেখুন তো কী অন্যায়। এত সুন্দর আর মিষ্টি ছেলের নাম কিনা গুণ্ডা !

কৌশিক বলল, নামকরণটা যে ভুল হয় নি সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

চিত্রা বলল, আচ্ছা, আমি চায়ের জলটা চড়িয়ে আসি !

বেদান্ত বলল, প্রস্তাবটা সুন্দর, কিন্তু আবার আপনি খাটতে যাবেন ?

মুক্তি হাসি-হাসি মুখে বলল, আপনার কোথায় কী আছে, আমায় একটু বলে দিলে আমি বানিয়ে আনতে পারি।

চিত্রা বলে উঠল, বলে দেবো না ভাবছেন ? আমায় তো চেনেন না। এরপর দেখবেন, 'আপনি' থেকে 'তুই'-তে নামব, এবং আপনার হাতের চা ছাড়া খেতেই পারব না।

কৌশিকের এখন মনের মধ্যে ইঞ্জিন চলছে, বার বার ইচ্ছে হচ্ছে বলে, তোমরা ও-ঘরে গিয়ে বসলে পারো। ও-ঘরে হাওয়া বেশী—কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কেউই কৌশিকের সদিচ্ছেকে ধর্তব্য করবে না। আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলবে। এবং কে জানে অপমানবোধ করবে কিনা। উঃ, ভদ্রতা বজায় রাখার যে কী দায়

অবশ্য এমন অলস আড্ডা দিতে যে ভালো লাগে না তা নয়। কিন্তু সেটা সময়বিশেষে। এখন আড্ডা দেওয়া যেন পিঠে বৃষ্টির ছাট পড়া অবস্থা।

তবু ভদ্রতা আর সৌজন্যের খাজনাটা যোগানোটাই সবচেয়ে জরুরী। অবশ্য যদি 'উন্নাসিক' 'অভদ্র' ইত্যাদি বিশেষণগুলোকে ভয় করতে হয়। না করলে খাজনা যোগাবার দায় নেই। কিন্তু কৌশিক ঘরসংসারী মানুষ, গেরস্থবাড়ির ছেলে, ওর দায় আছে। তাই হেসে বলে, অভ্যাসটা অত খাবাপ করে ফেলবে? আর যখন 'নীলমণি সরকার লেন' এসে হাজির হবেন? তখন?

'লেন'টাই এসে হাজির হবে?

বেদান্ত কপালে হাত ঠেকায়, হায়, তেমন ভাগ্য যদি হতো। তাকেই খুঁজে বার করতে হবে। এই নিন, বহুচেষ্টায় এই জিনিসটি আবিষ্কার করা হয়েছে, এখন এই পথ-অরণ্যের মধ্যে থেকে নীলমণিকে আবিষ্কার করুন। আমার তো একটু দেখতে গিয়েই মাথা ঝিমঝিম করে এল। যা ক্ষুদে ক্ষুদে টাইপ। ভরসা শুধু আপনি সময়-টময় রয়েছে।

বাড়ির ধর- একটা শ্রীহীন চেহারার চটি বই, 'কলিকাতার পথ পরিচয়'।

পরদিন সকালেই এসে হাজির বেদান্ত। আর এসেই বলে ওঠে, মিসেস রায়, এ-ঘরে আড্ডা জমালে কৌশিকটার তো জীবন মহানিশা। চলুন আপনা ওই বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

শোনামাত্রই মিসেস মিস্টারের চোখে চোখে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় ঘটে

অথচ নিজেরাই কাল বলাবলি করেছে, নাঃ, কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। বেদান্তকে তো এখন রোজই আসতে হবে। দেখি কী ভাবে বলা যায়।

আজ কিন্তু যখন সম্পূর্ণ নিজেদের সুবিধেজনক ব্যবস্থাটি আপনিই হয়ে গেল তখন কৃতজ্ঞতার বদলে চোরাগোপ্তা কৌতুকহাস্য। মানুষ এমনই মজার জীব।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বেদান্ত বলল, পেলেন খুঁজে?

মুক্তি মাথা নাড়ল।

ওইরকমই ব্যাপার আমাদের। সবই আধা-খ্যাঁচড়া। ঘটা করে না দেওয়া হয়েছে 'কলিকাতার পথ পরিচয়'।...দেখেছেন ভাল করে? কোনো

লেন থেকে বাই লেন—

মুক্তি কিছু বলার আগে চিত্রা বলল, সারাদিনই তো ওইটা নিয়ে পড়ে আছেন বেচারী। আমি তো বলছিলাম, একদিনেই চোখ খারাপ হয়ে যাবে আপনার।

তাই তো। মুস্কিল। আচ্ছা মিসেস রায়, একটা কাজ করলে কেমন হয়?

বলুন।

মনে হচ্ছে ওই নীলমণিটনি পুরনো কলকাতার ব্যাপার। ওটা নর্থের দিকেই হবে। ওদিকের ডাকঘরগুলোয় খোঁজ নিয়ে দেখলে হয় না? ডাকপিয়নদের তো সর্বত্র যেতে হয়। বলতে পারবে।

চিত্রা বলল, আইডিয়াটা মন্দ নয়। তবে কাজ ছেড়ে গাড়ি নিয়ে ঘুরলেও কতদিন লাগবে সেটাই ভাববার। তাছাড়া—হেসে উঠে বলল, কেবলমাত্র নর্থই বা কেন? সাউথে কোথাও একটি 'নীলমণি' থাকতে পাবে না?

হুঁ। আচ্ছা মুক্তি দেবী তো বলেছেন, ওই 'তেরোর তিনটা' একটা মেসবাড়ি। তাহলে কলকাতায় কোথায় কী ক' মেস আছে খোঁজ করলে হয় না?

মুক্তি নীরবই ছিল। এখন একটু হেসে বলল, হয়। তবে খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজতে বসলে যা হয় তাই হবে।

চিত্রা বলল, তা যা বলেছেন। আচ্ছা আপনারা এখন ছুঁচ খুঁজুন, আমি ততক্ষণ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি। বাগচীমশাই পালিয়ে যাবেন না যেন। একসঙ্গে খাব ঠিক করেছি।

সেরেছে। ইতিমধ্যে ঠিকও করে ফেলেছেন!

হ্যাঁ এটুকু স্বাধীনতা নিতেই হল। কারণ ইতিপূর্বে তো আপনি আর আসেন নি। দুপুরটা ফাঁকি দিয়েছেন। আপনার গেস্ট। আপনি তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসবেন তো।

কী যে বলেন? আমার আবার কে? আমরা সব্বাই আপনার গেস্ট। যাক কী রেঁধেছেন বলুন, আগে থেকে জেনে খিদে বাড়াই।

আপনার যত চালাকি। কতই খাইয়ে লোক!

আহা বেশী না হোক, একটু ভালমন্দ তো ভালবাসি। তা মা রাগ করে কাশী গিয়ে বসে থাকা পর্যন্ত সেদিকে নিল্। আমাদের ঠাকুর নির্দেশনায় আর পরিচালনায় যা 'প্রোডাকশন' তা না বলাই ভাল।

চিত্রা হেসে বলল, বলে দেব।

বলুন না। যদি রাগের চোটে কিছু সুরাহা হয়। হবে না। আসলে 'মগজ' বলে তো খুব বেশী কিছু নেই!

চিত্রা চলে গেলে মুক্তি বলল, এইভাবে খোঁজা সম্ভব?

বেদান্ত বলল, তবে কীভাবে যায়, বাতলান!

আমি কী বলব?

ইস্, এত খারাপ লাগছে। 'ফোন'টা জানতে পারলে একটা চিঠি ড্রপ করে দেওয়া যেত।

কিন্তু জানা নেই তো সেটা।

অতএব 'এই থাকলে এই হতো' ছাড়া আর বেশী কিছু এগোয় না।

এটা সেই প্রথম দিনের সংলাপ।

তারপর দিনের পর দিন কতগুলো দিন পার হয়, তেরোর তিন নীলমণি সরকার লেনের শিশির চক্রবর্তীর কোনো হাদস হয় না।

এদিকে ক্রমশ সংলাপের বদল ঘটতে থাকে।

যা দেখছি বোধ হয় রাস্তার নাম পাল্টে গেছে। যাক বাড়ি বসে বসে আর কী করবেন, চলুন কোথাও একটু বেড়িয়ে আসবেন।...মিসেস রায়, চলুন না।

কিন্তু মিসেস রায়ের কী এত সময়?

অথবা মিসেস রায় কি এত শস্তা? তবে সে প্রশ্ন তোলে না চিত্রা। বলে, খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু মরবার ফুরসত নেই ভাই।

অতএব যার মরবার ফুরসৎ আছে, তাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়া। সেজেগুজে বেরোয়। জামাকাপড় জুতো ছাতা দেদার জমে উঠেছে।

জমছে অবশ্য প্রথম দিন থেকেই।

ওকে এ-বাড়িতে রেখে দিতে এসে বেদান্ত বাগচী নিরুপায় গলায় বলেছে, শুনুন মিসেস রায়, দেখছেন তো ভদ্রমহিলা ঘরপালানে মেয়ে, একবস্ত্রে চলে এসেছেন—তো ওইসব বস্ত্রটস্ত্র চাই তো সবই?

ওর নিরুপায় ভঙ্গী দেখে চিত্রা কষ্টে হাসি চেপে বলেছে, হ্যাঁ, সে তো চাই-ই। মহিলাদের তো আবার অনেক কিছুই চাওয়ার থাকে। তা সে নিয়ে আপনি আর মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? আর একটি ভদ্রমহিলা তো রয়েছেন বাড়িতে।

সে তো ঠিক। সে তো ঠিক—

বেদান্ত কুণ্ঠিত গলায় বলেছে, তবে দয়া করে যদি এইটা রাখেন!

পকেটে যা ছিল সব বার করে টেবিলে রেখেছে।

এমা এ কী?

বাঃ, দোকানে-টোকানে যেতে হলে তো এসব লাগবেই। এখন যা রয়েছে রেখে গেলাম, পরে আরো যা লাগবে—বিল কাটবেন।

তখন হেসেছিল একটু।

চিত্রা বলল, মহিলাদের শাড়ি-জামা-ব্যাগ-চটির ব্যাপারে লাগার কোনো লিমিট আছে বাগচীমশাই! আপনি আপনার বান্ধবীকে কোন্ স্কেলে সাজাতে চান বললে—

আমার বান্ধবী?

বেদান্ত প্রায় ঠিকরে উঠেছিল, তার মানে? গিঁ স্ট্রটা কি আপনি বিশ্বাস করেন নি?

কী মুস্কিল! 'বান্ধবী' হতে কতক্ষণ? জন্ম-জন্মান্তরেরও হতে পারেন।

বেদান্ত হেসে ফেলেছিল, সে গুড়ে তো বালি মিসেস রায়। মাঝখানে এক অভেদ্য দেওয়াল 'নীলমণি সরকার লেন'।

চিত্রার হাসি তখন আর বাঁধ মানেনি অবশ্য।

তখন মুক্তিকে স্নানের ঘরে ঢুকিয়ে রেখে এসেছে চিত্রা নিজের একপ্রস্থ ধোপ্ শাড়ি-জামা দিয়ে।

হাসিটা অতদূর পৌছবে না তাই সাহস।

সত্যি, দুঃখ হচ্ছে আপনার জন্যে। তা টেবিলে কত রেখে গেলেন? দেখে যাবেন তো?

'বলে যাবেন' না বলে 'দেখে যাবেন' বলল, কিঞ্চিৎ সৌষ্ঠব রাখতে।

আপনিই দেখুন। বেশী নেই।

উঠে পড়েছিল বেদান্ত।

তার মধ্যে চিত্রা তাড়াতাড়ি গুণে নিয়ে বলল, সাতশো আশি—

ইস্, মাত্র। তা শাড়ি-টাড়ির তো অনেক দাম। আপাতত একসেট হবে?

ইয়ারমার্কা হাসি হেসে বলেছিল চিত্রা, কনে সাজাবার মত হলে হবে কিনা জানি না। তবে লেখকের বৌয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার মত হবে। এক কেন, একাধিকই হবে।

নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না!

হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল বেদান্ত।

তার পর থেকে কারণে অকারণে ক্রমেই উঠছে। চিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে মার্কেটিং করতে বেরোয়। জবরদস্তি করে দু-চারখানা শাড়িও গছায়।

আপত্তি করলে রাগ, দুঃখ, অভিমান।

কৌশিক, তোর বৌকে আমি দু-একটা শাড়ি উপহার দিতে পারি না?

ব্যাপারটা বুঝে ফেলতে দেরি হয় না কৌশিকের। কলমের মাথায় টুপি পরিয়ে ফেলে হেসে বলে, অফকোর্স। দু-একটা কেন, দু-দশটা দিলেও আপত্তি করব না। আমার কিছু ভার লাঘব হবে।

ঠিক আছে। মিসেস রায় শুনলেন তো!

শুনলাম। দেখো, শেষে আবার 'প্রেমোপহার' ভেবে মেজাজ খারাপ করতে বসবে না তো?

সে ভয় নেই।

কৌশিক চশমার ফাঁকে কৌতুকহাসি হাসে, জানছিই তো ওটা নিত-কনের ব্যাপার।

বেদান্ত বসে পড়ে কপালে হাত দিয়ে বলে, হায় বন্ধু! তবু যদি না মাঝখানে ওই হতভাগা শিশির চক্রবর্তী থাকতো!

প্রথম প্রথম মুক্তি চিত্রার ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইতো। তবু অস্বস্তিটা কমে।

চল গুণ্ডা, বেড়াতে যাই।

নিয়ে যেত, দেদার খেলনাপত্তর নিয়ে বাড়ি ঢুকতো গুণ্ডা।

কিন্তু ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কি আর সব সময় হুটহুট নিয়ে বেরোনো যায়? তার নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে।

মুক্তি বলে, শুধু শুধু আবার বেড়াতে যাব কী! বেড়ানো মানে তো রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা!

বেদান্ত বলে, তা সেটাও তো দরকার। ধরুন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কোনো রাস্তায় আপনার 'নীলমণি সরকারে'র দেখা পেয়ে যেতে পারেন!

ওঃ বাবা! আপনারা দেখছি লোকটার নাম ভুলিয়ে ছাড়বেন। আমিও হয়তো কোনদিন বলে বসব নীলমণি সরকার!

রেগে গেলেন? আচ্ছা সাবধান হবো। আসলে কী জানেন? ওইটাই এখন জপমন্ত্র হয়েছে কিনা। হঠাৎ হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলে বসি, ও মশাই, নীলমণি সরকার লেনটা কোথায় বলতে পারেন? তেরোর তিন

বাই এক—।

আবার কখনো বলে, সত্যি, আমি তো আর আপনার শিশির চক্রবর্তীকে চিনি না। হয়তো এমনও হতে পারে, তার সামনে দিয়েই রোজ আসা-যাওয়া করছি।

সেই অদেখা শিশির চক্রবর্তীকে খোঁজার জন্যে বহুবিধ পদ্ধতির পরিকল্পনা চলছে।

মাঝেমাঝেই চিত্রা আর কৌশিক বুদ্ধি যোগায়।

কৌশিক বলল, গুড গড। ও মুক্তি দেবী, আপনি যে সেই সেদিন বললেন, ভদ্রলোক দুর্গাপুরে কাজ করেন। তা কী চাকরি আর কোন্ ডিপার্টমেন্ট জানতে পারলেই তো ব্যাপারটা জলের মত সোজা হয়ে যেত। ইস্, এটা এতদিন ভাবা হয় নি।

কিন্তু জলের মত 'সোজাটা' কি এতই সোজা ?

একেই তো কী চাকরি, কোন ডিপার্টমেন্ট এসব কিছুই জানতো না মুক্তি। দৈবাৎ চিঠি দিলে সেই বান্ধবীর কাছে দিয়ে আসত, সে পাঠিয়ে দিত। তাদের আত্মীয় তো, ঠিকানা জানে। মুক্তি আবার ডাকটিকিট, কী ডাকের খাম পাবে কোথায় ? মামার কাছেই তো বলতে হবে !

তখন ?

খাম কী হবে ? কোথায় চিঠি লিখবি ? কী দরকার ? এসবের জবাব দিতে হবে না ?

ওঃ, সত্যিই অসহ্য অবস্থা। স্রেফ জেলখানার কয়েদী।

আচ্ছা ধরুন, কাউকে দুর্গাপুরে পাঠিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হল শিশির চক্রবর্তী নামের ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করতে। প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় বা প্রত্যেক অফিসে অফিসে খোঁজ করতে পারলে হয়তো—

হায়, সে পথেও কাঁটা।

শিশিরের সেই চিঠিটায় (যেটা লাভলেটার নয়, নেহাতই কেজো চিঠি) হতভাগা যে লিখেছিল, সাত চেষ্টাতেও এখানে কোনো কোয়ার্টার্সের ব্যবস্থা করতে না পারায় এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য চেষ্টায় ছিলাম—ঈশ্বরের অগাধ কৃপায় 'ভিজাগাপত্তমে' একটা কাজ পেয়ে গেছি। কোয়ার্টার্স মিলেছে। অবশ্য নিজেকে বিবাহিত বলে লিখতে হয়েছিল আবেদনপত্রে। সেই ভরসাতেই তো তোমায় চলে আসতে বলছি।

অতএব ?

অতএব দুর্গাপুরের প্রশ্ন নেই।

ও হো হো, হ্যাঁরে বেদান্ত, কাগজে একটা 'অ্যাডভার্টাইজ' করা উচিত ছিল না কি ?

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলমে ?

দে দে, লিখে দে, আমি দিয়ে দেব। কালই দৈনিক 'নবদিগন্ত'র লোক আসবে আমার কাছে লেখা নিতে।

চিত্রা বলল, সত্যি, এটা কেন এতদিন আমার মাথায় আসে নি ?

অতএব বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরী হল।

শিশির চক্রবর্তী—যেখানেই থাকো এই ঠিকানায় শীঘ্র যোগাযোগ করো। মুক্তি।

ওরে বাবা মুক্তি শিউরে উঠল, আমার নাম দিয়ে ? তাহলেই তো আমার বারোটা বেজে যাবে। কার চোখ থেকে কার চোখে পড়বে—

আহা, আপনার মামা কি আর বেনারসে বসে এই'দৈনিক নবদিগন্ত'পড়ছেন ?

কলকাতায় ওঁর আত্মীয়র অভাব নেই। আর ওঁর ভাগ্নী-নিরুদ্দেশের খবরও নিশ্চয় কারো জানতে বাকি নেই।

তাহলে নৈর্ব্যক্তিক ভাষাই ব্যবহার করা হোক।

নীলমণি সরকার লেনের শিশির চক্রবর্তী, নিম্নলিখিত বক্স নম্বরে আপনার খবর জানান। বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এইরকমই একটা বিজ্ঞাপন বেরোল দিন দু'তিন—শুধু নবদিগন্তেই নয়, আরো কয়েকটি দৈনিকে। কিন্তু কোথায় কী ? কেউ আসে না। কোনো চিঠিও না।—

বেদান্ত হতাশ হয়ে হয়ে এসে বলে, আর কী করা যায় বলো তো মুক্তি ?

হ্যাঁ, 'আপনি আজ্ঞের' স্টেজ পার হয়ে এখন 'তুমি' আর নাম ধরে ডাকার পর্যায়ে এসে পৌচেছে।

মুক্তিও হতাশ হয়।—কী বলবো বলুন ?

কী আর করা। বেচারী মন-ভাঙা-মুক্তির মন ভাল করতে তাকে নিয়ে গিয়ে সিনেমা দেখাও, 'মুক্তাঙ্গনে' থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যাও, 'ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে যাও!

চিত্রাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হয় কখনো কখনো—কখনো নিরুপায় হয়ে একাই।

খুকু একদিন তেড়ে উঠে বলল, দাদা, তুই সেই কী করে বেড়াচ্ছিস ?

কী আবার করে বেড়ালাম ! বলল বেদান্ত অবহেলাভরে

সেই রেলগাড়িতে ঘাড়ে-এসে-পড়া মেয়েটাকে নাকি এখন ঘাড় থেকে মাথায় তুলে শহর চষে বেড়াচ্ছিস ?

উঃ, তোর ভাষাটি কী মারকাটারি খুকু ! তোর 'ও'র কাছে শিখেছিস বুঝি ?

আচ্ছা ঠিক আছে। আমায় যতই অগ্রাহ্য করো, মাকে তো আর করতে পারবে না ! মা আসছেন।

চমকে উঠল বেদান্ত, মা আসছেন মানে ? কে বলল ?

বলবে আবার কে ? মা নিজেই চিঠি দিয়েছেন !

কই, দেখি চিঠি ?

তোমায় নয়।

বেশ বাবা, না হয় তোরই হল, পড়ে শোনা

আমাকেও নয়, মা তাঁর জামাইকে দিয়েছেন।

ওঃ, তার মানে জামাই তাঁর 'শালার' অধঃপতনের কাহিনী বিবৃত করে মাকে চিঠি দিয়ে আনাচ্ছেন।

খুকু দমে না।

এমনিতেই দমবার মেয়ে নয়, তায় আবার এখন পৃষ্ঠবল, মা আসছেন। বললো, তা উপায় কী ? তুই এই বুড়োধাড়ি বয়েসেও এক-একটা কেলেঙ্কারি করে বেড়াবি, লোকের কাছে মাথা কাটা যায় না আমাদের ? পরে মা দুষবেন না, তোরা কই আমায় জানাস নি !

দায়িত্বজ্ঞান টনটনে। তা আসছেন কবে মা ?

পরশু।

কোন্ গাড়িতে ?

তা জানি না।

চমৎকার ! স্টেশনে যেতে হবে না ?

সে তোর বোনাইকে জিগ্যেস করগে।

দয়াময়ী বোনটি, ওই বোনাইকে জিগ্যেস করার পাটটা তুমি রাতারাতি চুকিয়ে রেখো ! কাল সকালে আমায় জানিও প্লীজ !

স্বভাবগত হাল্কা চালের কথা। খুকু আর খুকুর বরের নাকি এতে অপমান

বোধ হয়। অনেকবারই নিজের বাড়িতে চলে যাবার সংকল্প করে, মায়ায় পড়ে পারে না। দাদাকে দেখবে কে ?

তাছাড়া বাগচী আর্ট প্রেসটারই বা কী হবে ? অনাথ হয়ে পড়বে না ? বাগচী তো উড়ছেন।

বোনকে ঠাট্টা-তামাসা করে দাবিয়ে দিলেও মায়ের আসার খবরে একটু দমে গেল বেদান্ত। অথচ এই কিছুদিন আগেও তো মাকে বলে এসেছে, বেশ, তোমার যদি এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা হয় তো আমিও আর আসছি না। দেখি কতদিন পুত্তুরকে না দেখে থাকতে পারো।

ইস, আজ-কালকার মধ্যেই যদি সেই কালপ্রিট শিশির চক্রবর্তীটার সন্ধান পেয়ে যাওয়া যেত। যার জিনিস তার হাতে তুলে দিয়ে ফ্রী হয়ে যেত বেদান্ত। তারপর দেখা যেত মা'র মেয়ে-জামাই মাকে কত কব্জা করতে পারে।

কিন্তু তাই কি আর হবে ? কিন্তু যদি হয় ? ভাবতেই হঠাৎ বুকের মধ্যেটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠল।

* * *

ওদিকেও কিন্তু ঠাট্টা-তামাসার চাষ চলছে। চলছে লেখক আর লেখক-গিন্নীর মধ্যে।···প্রেমিকের তো পাত্তা নেই। তোমার সখী কি বড্ড বেশী মন-ভাঙা হয়ে গেছেন।

আমার সখী ?

আহা, না হয় তোমার ছেলের 'আন্টি'। তা কী মনে হচ্ছে ?

মনে আবার কী হচ্ছে। যা হবার তাই হচ্ছে। কোথায় সেই মেসে থাকা অভাগা শিশির চক্রবর্তী ? ভগবান জানেন কেমন চেহারা-চরিত্র, এই তো ব্যবহারের ছিরি। আর কোথায় তোমার সেই গুণের নিধি রূপের কার্তিক বন্ধুটি। হুঁ।

ইস, তুমি আমাকে প্রেমে অবিশ্বাস এনে দিচ্ছ।

যা ঘটে এবং ঘটেছে, তাই বলছি। আর সত্যি বলতে, ওই শিশির চক্রবর্তীর সঙ্গে খুব যে একটা ভাসাভাসি প্রেম হয়েছিল, তা মনে হয় না। সুযোগও তো পায়নি। ওই তো বাঘা গার্জেন। ছেলেটাই হয়তো ওর প্রতি মমতার বশে এগিয়ে এসেছিল। আর মুক্তিও যাকে বলে 'সমুদ্রে তৃণখণ্ড'। সেই ভাবে তাকে আঁকড়েই অকূলে ঝাঁপ দিয়েছে। অথচ সে হয়তো এখন—

তাকে আঁকড়ে নয়, তার নামটাকে আঁকড়ে —বলেই কৌশিক এদিক ওদিক

তাকিয়ে বৌয়ের কোমরটা জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে বলে, সত্যি, তুমি না মাইরি, যদি কলম ধরতে, আমাকে ডুয়ো দিয়ে কেটে বেরিয়ে যেতে পারতে আহ কী ক্ষুরধার ভাষা, কী অবাধ প্রকাশভঙ্গী, কী সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, আর—

থাক। ঢের হয়েছে। এখন বলো, তোমার বন্ধু কাল থেকে আসছে না কেন?

কাল থেকে মানে? কাল আসেনি, সেটাই বল। 'আজটা'তে' এখ . পালিয়ে যায় নি?

গুণ্ডার আন্টি তো তখন থেকে তাকে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে গল্প শোনাচ্ছে।

দেখো ভাবছি, শালা বেদান্তটাকে বলি—

ফের?

আচ্ছা বাবা আচ্ছা। তোমার বাগচীমশাইকে বলি, ওসব খুঁজে বেড়ানোর ছলনা করে আর পথে পথে ঘুরে বেড়াস নে বাবা। এবার ঘরে ঢোক।

বাগচীর বাড়িতে প্রতিকূল বাতাস প্রথম দিনেই তো বহিরাগতকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করেছিল।

সে তো ওর ছোট বোন।

ছোট বোন বলেই কি তার প্রতিরোধকে 'ছোট' করে দেখতে হবে?

চিত্রার কথায় কৌশিক বলে ওঠে, আচ্ছা কাকিমা তো রয়েছেন, মানে ওর মা। রাগ করে কাশী না বৃন্দাবন কোথায় যেন গিয়ে বসে আছেন—

কাশী—কাশীই তো! মা'র কাছ থেকে ফেরার পথেই তো বেদান্তর মুক্তিলাভ।

মার্ভেলাস! এখন ওর মা'র ঠিকানাটা যোগাড় করে ফেলতে পারলে ব্যাপারটা সুপথে এসে যায়।

কী করে?

কেন, মুক্তির একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো তুলিয়ে ডাকের খামের মধ্যে ভরে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে চিঠি লিখে দিই, 'কাকিমা' আপনি নেই, বেদান্তটা বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায়, তাই ওকে জোরজার করে সামান্য রাজী করিয়ে একটি কনে যোগাড় করে ফেলা হয়েছে—এই ফটো। আপনি যদি ছবিটি পছন্দ করেন, তাহলে চলে এসে হাল ধরুন। মেয়ে বেনারসেরই, ভাল ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

আইডিয়াটা মন্দ নয়। ছবি দেখে অপছন্দ হবার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া

ভাল ব্রাহ্মণ, বেনারস ইত্যাদি। ঠিক আছে, ওকে নিয়ে তাহলে সামনের 'জয়া স্টুডিও' থেকে ফটো তুলিয়ে আনব।

যাক, মোটামুটি সমস্যার সমাধান। কী বল? এখন পাত্রপাত্রী কী বলেন দেখা যাক!

চিত্রা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, আহা, কী আবার বলবে? বলবে, আঁচাবো কোথায়?

ওঃ, সাধে বলি, এমন প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী সহজে মেলে না!

* * *

'এখানে' যখন বেদান্তর মাকে কী করে আনানো যায় সেই চিন্তা চলছে, 'ওখানে' তখন সেই ঘটনাটি ঘটে বসে আছে।

মা কোন্ গাড়িতে আসছেন না জানায় গাড়ি নিয়ে স্টেশনে না গিয়ে বেদান্ত মায়ের এতদিনের বন্ধ করে রাখা ঘরটা ঝাড়মোছ করছে, সহসা সিঁড়ির তলা থেকে মায়ের কলকণ্ঠের ধ্বনি, গাড়ির সময় জানাব কী করে শুনি? টিকিটই ঠিক হয়নি। যেই হাতে পেয়েছি, সেই গাড়িতে চড়ে বসেছি। তা একজন পরিচিত লোক আসছিল, তার সঙ্গটাই ধরে ফেললাম।

বেদান্ত হাতের ঝাড়ন নামিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিনিশিং টাচ দিয়ে ফেলে নীচে নেমে আসছে—দেখল মা উঠছেন। তাড়াতাড়ি প্রণাম করে বলে উঠল, কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ?

মা সতেজে বললেন, কেন, হঠাৎ এসে তোকে কোনো অসুবিধেয় ফেললাম?

বেদান্তর মনের মধ্যে ধুকপুকুনি, তবু গম্ভীর গলার ভান করে বলে, তা একটু ফেললে বৈকি।

কী? কী বললি? আমি এসে তোকে অসুবিধেয় ফেললাম?

বেদান্ত খুকুর দিকে একটু চোরা কটাক্ষ' নিক্ষেপ করে বলে, তা ফেললে না? বেশ মনের আনন্দে যা-ইচ্ছে-তাই, মানে যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছিলাম—

মা ছেলের হাস্যোজ্জ্বল আর খুকুর বেজার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বললেন, তা সে-গুণে তো তোমার ঘাট নেই বাছা। যাক চানটা করে আসি, গা ঘিনঘিন করছে।

রেলগাড়ি তো বটেই, ট্যাক্সি চড়লেও মা'র গা-কেমন করে। হোক না চকচকে গদি, কে না চড়ছে ওই গদিতে? রুগী, আঁতুড়, গুণ্ডা, কসাই—সব নয়? নিজের চক্ষে দেখেছেন তিনি, কাটা মুরগী নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। রাম

রাম! চলে গেলেন নাইতে। এই যে এলেন, নেহাৎ নিরুপায় হয়েই না? মহিলা চিরদিনই নিরীহই ছিলেন, এই শুচিবাই ঢুকে পর্যন্ত দুর্দান্ত হয়েছেন।

আসলে এবার বেদান্তকে ফেরত দেওয়া পর্যন্তই তাঁর দারুণ মন-কেমন করছিল। অবস্থা প্রায় 'একবার ডাকিলেই খাইতে যাইব' গোছের। জামাইয়ের চিঠি পেয়ে ছুতোটা লুফে নিলেন।

ছেলেকে কি তিনি সত্যি অবিশ্বাস করেন?

তা করেন। তা বলে চরিত্রহীন, স্বভাব খারাপ, বয়ে যাওয়া বলে নয়—বোকা, কাণ্ডজ্ঞানহীন আর লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞ বলে। কে জানে কোথাকার কোন্ 'অজ্ঞাতকুলশীলা' (জামাইয়ের ভাষায়) তাঁর ছেলেটাকে ধোঁকা দিয়ে কী সুবিধে বাগিয়ে নিচ্ছে! নেয়ে আসি, জেরা করি—মিছে কথা অবিশ্যি বলবে না আমার সঙ্গে।

শাওয়ারের নীচে মাথা পেতে 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে' আওড়াতে লাগলেন।

* * *

দাদাবাবু আপনার ফোন!

কথাটা কিছুই অভাবিত অস্বাভাবিক নয়। তবু শুনেই বেদান্ত নামের বুড়োধাড়ি ছেলেটার বুকের মধ্যে স্রেফ হাতুড়ি পড়ে। আর কেউ নয়—সে। কাল থেকে যাওয়া হয়নি। অথচ কালই একটা নতুন সূত্র ধরে খুঁজতে যাবার কথা ছিল। বেলেঘাটার দিকের এক বাস—কনডাকটারকে জিগ্যেস করায় বলেছিল, নীলমনি, না নীলকান্ত সরকার লেন? আমারই তো বাসা সেখানে? তা থাকলেও থাকতে পারে। হোটেল তো আছে একটা! ওরিয়েন্ট হোটেল! মাঝে মাঝে খেতে যাই।

তা হোটেল যদি থাকে, মেসও থাকতে পারে। 'নীলমণি' আর 'নীলকান্ত' গুলিয়ে যেতেও পারে। বেলেঘাটাকে কী নর্থ ক্যালকাটায় ফেলা যায় না!

আশায় বুক বেঁধে যাবার কথা ছিল কাল। কিন্তু ওই মা আসছেন খবরে মাথা গুলিয়ে গেল। মনে হল, বুঝি সেই মুহূর্তেই মা এসে পড়ছেন। মায়ের জন্যে গোছগাছও ছিল কিছু।

আহা, বেচারী মুক্তি! কাল থেকে অপেক্ষা করে করে বোধ হয় আজ মরীয়া হয়েই অসম সাহসিক একটা কাজ করে বসেছে।

কাঁপা হাতে রিসিভারটা তুলে নিয়ে হ্যালো করার আগেই কৌশিকের গলা শোনা গেল, এই, কাকিমার—মানে তোর মা'র বেনারসের ঠিকানাটা বল তো!

আবার হৃদ্‌কম্প।

যাঃ! কিছু একটা হচপচ হয়ে বসে আছে নির্ঘাৎ। মুক্তির সেই মামাটা হয়তো কোনো সন্ধানসূত্রে—বেদান্ত'র মার কাছে গিয়ে—

কই বল, কাগজ-কলম হাতেই আছে!

বেদান্ত আস্তে বলল, হঠাৎ মা'র ঠিকানা?

আছে দরকার, বল না।

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, মা আজই সকালে এখানে এসে গেছেন।

অ্যাঁ, তাই নাকি?

কৌশিকের স্বর উল্লসিত। একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। তাই।

মানে?

মানে কিছু না। যাক, রাগ ভেঙেছে মা'র?

এখনো জানি না। এসেই তো চানের ঘরে।

ঠিক আছে। বিকেলে থাকবেন?

থাকবেন অবশ্যই। কিন্তু রহস্যটা কী?

গিয়ে ভেদ হবে। ও. কে.।

ছেড়ে দিল ফোন বেদান্তকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে।

যাঃ, হয়ে গেল যবনিকা পতন! নাটক শেষ। সব শেষ।

কে জানে মা'র সঙ্গে মুক্তির সেই বেনারসী মামাটাও এসে হাজির কিনা! কে জানে বিকেলবেলা তাকেই নিয়ে আসবে কিনা!

এইরকম সব কার্যকারণহীন এলোমেলো চিন্তা পাক খেতে থাকে মনের মধ্যে। যার অন্তরালে একটা গভীর গহ্বরের শূন্যতা।

মুক্তিকে এবার হারাতে হবে ভাবতে ভাবতে হারানোর বেদনাটা যেন পাঁজরের মধ্যে ছুরি বেঁধায়। আর তারপর হঠাৎই একটা প্রশ্ন যেন চোখ তুলে তাকায়। হারানোর ব্যথায় কাবু হচ্ছি? কিন্তু মুক্তিকে আমি পেলাম কবে? পাওয়ার পরই তো হারানো! না পেতেই তো নয়। কবে আমি জানতে পেলাম, মুক্তি আমার? আমার এতদিনের অর্থহীন এই জীবনটার অর্থ?

আমি তো শুধু মুক্তিকে সমর্পণ করে মুক্তি পাব বলেই কোন এক অজ্ঞাত অপরিচিত হতভাগা শিশির চক্রবর্তীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কই, কোনোদিন তো ঘোষণা করে বলে উঠতে পারিনি, মুক্তি এসো, খোঁজাখুঁজির প্রহসন বন্ধ হোক।

তোমাকে আমি ছাড়ব না। একশোটা শিশির চক্রবর্তী এলেও তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।···মুক্তি, আর আমি যুক্তিতর্ক সভ্যতা-ভব্যতা ওসবের ধার ধারছি না। তুমি আমার—ব্যস, এই আমার শেষ কথা।

নাঃ, একথা বলে উঠতে পাবে নি কোনোদিন বেদান্ত নামের বুদ্ধুটা। বলে ওঠার কথা খেয়ালও হয় নি। সে শুধু আপাতসুখের সরোবরে নিমগ্ন থেকেছে—এই দুজনে একটা লক্ষ্যে বাইরে বেরিয়ে পড়ার সুখে, এই-ওই লক্ষ্যটার উপলক্ষে কিছুক্ষণ অন্তত পরস্পরের সান্নিধ্যের সুখে। এইটুকুই 'পরম পাওয়া' বলে ভেবেছে।

এই ব্যর্থ খোঁজাখুঁজিটা যেন বেদান্ত বাগচী নামের লোকটার কাছে একটা উৎসবের সমারোহ। মনের অগোচরে পাপ নেই। বেদান্ত সেই পাপী মনকে চোখ রাঙিয়ে সুপথে চালিত করবার চেষ্টা করেনি। বেদান্তর মন ভেবেছে, যেন সহজে খুঁজে পাওয়া না যায়। যেন এই আবেশময় রঙিন দিনগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাবানের ফেনার মত বাতাসে মিলিয়ে না যায়। মিলিয়ে গেলেই তো হাতছাড়া হয়ে গেল ছাড়পত্রটি।

এই ছাড়পত্রটির জোরেই তো এই খোঁজা-খোঁজা খেলার ফাঁকে জীবনের মানে খোজার অবকাশ মিলে যাওয়া।

'ওর মন ভাল নেই'। ওকে তবে নিয়ে যাও ভাই সেই সব জায়গায়, যেখানে গেলে মন ভাল হয়। সিনেমা, থিয়েটার, ম্যাজিক, দোকান, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর—আরো কত উপাদান ছড়ানো আছে শহরে মানুষের ভাঙা মন ভাল করতে। তা এইভাবেই তো সেই বিষণ্ণ বেদনার মুখে ফুটেছে আলো-আহ্লাদ।

দু'-হাত ভরে জিনিসপত্র নিয়ে যখন বাড়ি ঢুকে ডাক দিয়েছে, গুণ্ডা—গুণ্ডার সর্দার, কোথায় আপনি? এই দেখুন আপনার জন্যে দোকান লুঠ করে কী সব আনা হয়েছে। মুক্তিকে দেখে তখন মনে হয়েছে একটি সদ্য কিশোরী।

চিত্রা বলেছে, গুণ্ডার আন্টিই গুণ্ডার বারোটা বাজিয়ে দিল।

যেন ওই দু'হাতভরা জিনিস সওদা করার রসদটা গুণ্ডার আন্টিরই ভাঁড়ার থেকেই এসেছে। কিন্তু তেমন নির্লজ্জ কথাটা তো আর মুখ ফুটে বলতে যায় না সভ্য মানুষরা। তাই আন্টির নামেই দোষারোপ ছেলের বারোটা বাজিয়ে দেবার।

আড়ালে অবশ্য কৌশিক বলে, কাণ্ডজ্ঞানহীনটা শুধু তোমার ছেলেরই বারোটা

বাজিয়ে দিচ্ছে না, তার আন্টিরও দিচ্ছে। ভবিষ্যতে যদি সত্যিই সেই নীলমণি সরকার লেনের শিশির মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন, তখন? সেই বেপরোয়া অভ্যাসটির ঠেলা সামলাতে পারবেন?

কিন্তু ওসব তো আড়ালের কথা। সামনে তো শুধুই আহ্লাদ আমোদ হৈ-চৈ। এই যে আজকের দিনটিকে পরিপূর্ণতার অমৃত স্বাদে ভরিয়ে তুলে, আবার আগামী দিনটিকে কী দিয়ে ভরানো যায় মনে মনে তার কল্পনা, এই মাদকতাময় সুখটি নিয়েই তো কাটছিল দিন রাত্রি সকাল সন্ধ্যা। কে তোয়াক্কা করে ভবিষ্যতের।

পরের বাড়িতে দায় চাপানো? তাতেও দায় নেই।

কৌশিকের বৌ এমন ভাব দেখায়, যেন এই বেওয়ারিশ একটা মেয়ে পেয়ে সে বর্তে গেছে। বর্তে হয়তো যায়ই লোকে, যদি সেই পাওয়াটাকে সম্যক কাজে লাগানো যায়, এক্ষেত্রে তো ঠিক তেমনটি হয় না। বেওয়ারিশকে যে তার বেওয়ারিশটি খুঁজতে বেরোতে হয়। তবু সংসারকর্মে দক্ষ মুক্তি জোরজার করে অনেক কিছুই করে দেয় চিত্রার। আর গুণ্ডার ভারটি তো বারো আনাই বহন করে।

ভিতরে ভিতরে সকলেরই জানা এটা অস্থায়ী, এ ছন্দ ক্ষণ-মুহূর্তের। তবুও সেই প্রজাপতির পাখনার নীচে আশ্রয় নেওয়া। ভয়ের অনুভূতি প্রাণটাকে গ্রাস করে ফেলছে। কৌশিক কেন মা'র কাছে আসতে চায়।

বেদান্তর মনে হল, তাকে বোধ হয় একটা ভয়ঙ্কর শাস্তির মুখে দাঁড়াতে হবে। আর সেই মুহূর্তেই মনে হল, আমি কী বোকা—আমি কী বোকা। আমি কেন পৃথিবীর সামনে মাথা তুলে বলতে পারিনি, 'জাহান্নমে যাক শিশির চক্রবর্তী, আমি মুক্তির মালিক।'

* * *

রূপক—যার গল্পে এ-রকম ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, লোকটাকে রাজ-আদেশে শূলে চড়ানো হচ্ছে, হঠাৎ আকস্মিক এমন কিছু ঘটল যে শূল থেকে নামিয়ে তাকে হাতী চড়িয়ে রাজ্য প্রদক্ষিণ করিয়ে কপালে রাজতিলক এঁকে দিয়ে সিংহাসনে বসানো হল। রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা।

তা সেকালে নাকি হ'তো এমন। কিন্তু একালে হয়? কিন্তু হলো। একালেই হলো। বেদান্ত বাগচীর ভাগ্যে হল। শূলে চড়বার অপেক্ষার মুহূর্তে হাতীতে চড়ে বসবার যোগ।

*　　　*　　　*

কৌশিক আসার খবরে বেদান্ত হাওয়া ভয় তাকে গ্রাস করে বসে আছে।

বেদান্তর মা কৌশিকের বৌয়ের কাছে কৌশিকের ছেলেবেলার কিছু ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেশ করে এবং ওর ছেলে আর 'গুণ্ডা' হবে না—বলে তাকে 'আপ' করে দিয়ে আসল কথায় এলেন।

এই ছবি মেয়ের ? তা এ-তো খাশা মেয়ে !

হ্যাঁ, ফটো একখানা নিয়ে এসেছে এরা। শহর বাজারে কী না হয়। একটি তাৎক্ষণিক ফটোর স্টুডিওতে গিয়ে তৎক্ষণাৎই একখানা ফটো তুলিয়ে এনেছিল যুক্তির।

চিত্রা বলল, সেই জন্যেই তো—এখন ধরে বেঁধে একটা বিয়ে দিতে পারলে—

মেয়ে কোথাকার বললে ? কাশীর না ?

হ্যাঁ।

তা বাপের নাম ?

কৌশিক তাড়াতাড়ি বলল, মা-বাপ ছেলেবেলায় মারা গেছেন।

তা নয় গেছেন, কিন্তু নাম পরিচয় কুল শীল গণ গোত্র রাশি ক্ষণ এসবগুলোকে তো আর মেরে রেখে যান নি বাপু!

সে-সব ? একটু জেনে বলতে হবে।

তা সেখানে থাকতো কোথায় ?

চিত্রা তাড়াতাড়ি হাল ধরল। থাকতো মামারবাড়ি, চিত্রাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। মামা-মামীর দুর্ব্যবহারে কাতর হয়ে কলকাতায় চলে এসে তাদের কাছে আছে। এখন চিত্রারা ওর বিয়ের জন্যে—

বেদান্তর মা হঠাৎ বলে ওঠেন, খুকু বুঝি এই মেয়ের কথাই জানিয়েছিল ?

খুকু ! জানিয়েছিল ! এই মেয়ের কথা !

চিত্রার পায়ের তলার মাটি সরছে।

হ্যাঁ, আমার মেয়ে। লিখেছিল, কোথাকার একটা মেয়েকে নিয়ে নাকি বেদান্ত খুব ঘুরছে। তাহলে বোধ হয় এই মেয়েই।

চিত্রা পর্যন্ত হালে পানি পায় না।

শুকনো গলায় বলে, 'খুব ঘুরছে' বলে কিছু না। মানে—

বেদান্তর মা বলেন, মানে আমি বুঝে নিয়েছি বাছা। তা যাক, ছবি দেখে

তো আমার বেশ পছন্দ হচ্ছে, এই মেয়েকেই আমি বৌ করব।

* * *

হতভাগ্য শিশির চক্রবর্তীর তাহলে ভূমিকা শেষ? মঞ্চ থেকে অপসারণ? বাড়ি ফেরার সময় কৌশিক হেসে হেসে চিত্রাকে বলে কথাটা। আবার বলে, আমার কিন্তু ঘোরতর সন্দেহ, আদৌ কেউ ছিল কিনা মঞ্চে।

না না, ছিল। চিত্রা বলল, অত কিছু বানিয়ে বলবার মত না মেয়েটা অনেস্ট।

ঠিক আছে। তবে হয়তো নায়কটি নিজেই নায়িকাকে জলে নামিয়ে দিয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে 'আমিও আসছি' বলে উল্টোমুখে দৌড় দিয়েছেন।

তা হতে পারে। প্রেম করাটি যত সহজ, দায়িত্ব নেওয়াটি তো আর তত সহজ নয়।

একটু পরে কৌশিক আবার কথা বলে, আচ্ছা আমরা আসব জেনেও শালা কেটে পড়ল কেন বল তো

উঃ, অসহ্য। আবার?

দোহাই তোমাব চিত্রা, কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত আমায় একটু বাক্-স্বাধীনতা দাও। গাড়োলটাকে প্রাণভরে বারকতক 'শালা' বলে নিই।

তোমার গল্পের নায়কদের তো যথেচ্ছ বাক্ স্বাধীনতা দিয়ে আশা মেটাচ্ছ তবু হচ্ছে না। এক এক সময় তো পড়তে পড়তে কান লাল হয়ে যায়। ভেবে পাই না, এসব শব্দটব্দগুলো শিখলে কোথা থেকে?

লেখককে সব কিছু শিখতে হয় মহিলা। এবং ঘরে বসেই। নরকের বর্ণনা দিতে কি আর দান্তেকে নরকে ছুটতে হয়েছিল?

ঠিক আছে, চালিয়ে যাও। তবে খবরদার, কখনো গুণ্ডার সামনে এসব স্বাধীনতা ভোগ করতে বসবে না।

মাথা খারাপ। তখন শালার বদলে ব্যাটা বলব। তা ব্যাটা বোধ হয়—ইয়ে কাট মেরেছে। চিরকালের নার্ভাস তো।

ভয়টা কিসের?

কেন? ভেবে মরেছে আমি ওর মা'র কাছে ওর নামে নিন্দে করতে গেছি।

ধ্যেৎ। এমন অদ্ভুত কথা ভাবতে যাবেন কেন?

ওই স্বভাব। যখনই ফেঁসে বসে, তখনই নানান উল্টোপাল্টা ভাবনা করতে বসে। চিরকালই তো ফেঁসে আসছে।

যাক, এবারে তাহলে সে অধ্যায়ে ইতি।

চিত্রা হেসে ফেলে বলে, এখন থেকে স্রেফ মুড়ি সেলাইয়ের কারবার। তার-পর চিত্রা বলল, বাগচীর মা যে এতো সহজে রাজী হবেন ভাবি নি।

আমিও ভাবি নি। বোধ হয় ভাবলেন, আর কুল-শীল-জাত-গোত্তর নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করে কাজ নেই। ছাড়া গরুকে যদি কোনমতে একবার গোঠে পুরে ফেলা যায়—ওই মেয়েটার সঙ্গেই যখন লটকেছে।

বোঝা গেল, এই খবরটি পেয়েই উনি ছুটে এসেছেন।

বেদান্তর মা অবশ্য ছেলেকে পেড়ে ফেলে জেরা করতে বসলেন না। প্রথমে গাল-গল্পের পথে রইলেন। কৌশিককে এতোদিন পরে দেখতে পাওয়াজনিত আহ্লাদ ব্যক্ত করে, তার ছেলেটির এবং বৌটির অশেষবিধ প্রশংসা করে এবং ঠিক এই সময়টিই কী রাজকার্য পড়েছিল বেদান্তর—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তৎপরে 'এখন খেতে বসবি, না আবার এখন গায়ে জল ঢালতে যাবি' প্রশ্ন করে, সহসা মনে পড়ার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা—একটি ভাল মেয়ের খবর পেলাম, আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেল। খাসা বাঙালীয়ানা ভাব, পানপাতার মতো মুখটি, চোখ দুটি বড় বড়, আমি তো কথা দিলাম বৌ করবো বলে।

আকাশ কোথায় ছিল? তাই এমন সহসা বেদান্তর মাথার ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে বসল!

একেবারে কথা দিলাম!

কোথা থেকে জুটল এই দিব্যি বাঙালীয়ানা মেয়ে? নির্ঘাৎ খুকুর শ্বশুরবাড়ির গুষ্টির কোনো হাঁদা আর খেঁদি মেয়ে। স্রেফ খুকু আর তার বরের ষড়যন্ত্র।

রাগ-উত্তেজনা চাপতে পারে না বেদান্ত। বলে ওঠে, একদম কথা দেওয়া হয়ে গেল? আমি তোমায় বলেছি, বিয়েয় রাজী? ওসব বিয়ে-ফিয়ে থাক এখন!

এখনো থাকবে? মা না মরলে আর টোপর পরবি না? কিন্তু আমি আর শুনছি না। নিত্যি একটা করে কিম্ভূতকিমাকার কাণ্ড করে বেড়াবি, লোকে নিন্দে রটাবে, বলবি বিয়ে করব না—ছাড়ো ও কথা, বিয়ে তোমায় করতেই হবে।

নিন্দে রটনাটা স্রেফ মা'র ওই মেয়ে-জামাইয়ের কাজ।

ওঃ! তবু বেদান্ত মিনমিনে গলায় বলল, বাঃ, আমায় একবার দেখাবারও দরকার মনে করলে না?

মা গম্ভীরভাবে বলেন, দেখে অপছন্দ হবার মেয়ে নয়। তা দেখো—দেখে নাও, ফটো রেখে গেছে।

তাক থেকে ফটোটা পেড়ে ছেলের দিকে বাড়িয়ে ধরেন তিনি। মুচকে হাসাটা ছেলের চোখে পড়ে না।

মুক্তির সেই তাৎক্ষণিকের ছবি।

বেদান্তর মাথায় নেমে আসা সেই আকাশটা আবার উঁচুতে উঠে গিয়ে বি আলো আর হাওয়ার স্রোত বইয়ে দিল!

কৌশিকের সেই 'রহস্যে'র হদিস পাওয়া গেল তাহলে। আশ্চর্য, ঠিক যখনি ভাবতে শুরু করেছিল বেদান্ত—আর এ রকম একটা অর্থহীন খোঁজাখুঁজি নয়, এবার ঘোষণা করে বলে ওঠা যাক, মুক্তি তোমায় ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, ঠিক তখনি এই অনুকূল যোগাযোগ! এ স্রেফ চিত্রার কারসাজি।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উপচে ওঠে।

মা ছেলের মুখের দিকে তাকান।

মা কষ্টে হাসি চেপে রাগের গলায় বলেন, কী, এমন মেয়ে তোমার পছন্দ হব না?

বেদান্ত ছবিটা ফেরত দিতে ভুলে গিয়ে নেহাৎ হেলাফেলা গলায় বলল, খু খারাপ নয়!

কেবলমাত্র 'খুব খারাপ' নয়? কী চাও তুমি?

আচ্ছা বাপু না-হয় 'খুব ভালো'—হল তো?

তাহলে পাকা কথা দিচ্ছি?

বেদান্ত তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, আহা, আমার জন্যে যেন সেটি বাকি রেখেছ?

এই বুড়োধাড়ি বয়েসে বাগচীবাড়ির বেদান্তর যে মনে এমন রং ধরবে, যে রঙে আকাশ বাতাস পৃথিবী ক্ষিতি অপ মরুৎ তেজ সব আলোর জোয়ারে ভাসবে, কে জানতো! সেই রঙের জোয়ারে ভাসছে সে।

হঠাৎ খেয়াল হল, কিন্তু মুক্তি? মুক্তিকে আমি হিসেবের বাইরে রাখছি কেন? সে যখন বলে উঠবে, 'ছি ছি, তুমি এমন—এমন বিশ্বাসঘাতক' তখন? যদি বলে ওঠে, নিশ্চয় ওই বেলেঘাটার নীলকান্ত সরকার লেনে পাওয়া যেত তাকে। সঠিক খবরটি পেয়েই তুমি আর খোঁজা-খোঁজা-খেল খেলতে গেলে না!…যাবে কী? তলে তলে যে তুমি এই অভিসন্ধি নিয়ে—

বেদান্তর চোখ থেকে আলোটা নিভে এল। নাঃ, মুক্তির কাছে মুখ দেখানো যাবে না। কিন্তু মুখ দেখাতে যাবার আর উপলক্ষ্য কী!

* * *

ঘাড়ের ওপর গুম করে একটা কিল পড়ল। কৌশিক বলে উঠল, আঃ!

একটা দায় শোধ করেই তো আবার একটার দায়।

জনপ্রিয় লেখক কৌশিক রায়কে সারা বছরই প্রবল বিক্রমে তার জনপ্রিয়তার ঋণ শোধ করে চলতে হয়। এর সঙ্গে আবার এই বন্ধুঋণ শোধের দায় এসে চেপেছে।

চিত্রাই অবশ্য ঘর-সংসারের সবই ম্যানেজ করে, লেখক স্বামীর গায়ে সাংসারিক কোনো দায়ের আঁচড়টিও লাগতে দেয় না। কিন্তু সংসারের গণ্ডির বাইরে কিছু বাধলেই তো মুস্কিল। এই গতকাল পুরো বিকেল-সন্ধ্যেটা গেল বেদান্তর মায়ের কাছে গিয়ে। মহাপাল্লায় পড়ে যেতে হয়েছিল। এতদিন পরে দেখা, না খাইয়ে ছাড়বে না, গল্পেরও শেষ নেই। যে সব পুরনো লোকদের কৌশিক ভুলেই গেছে, নতুন করে আবার তাদের চেহারা-চরিত্রগুলো মনে পড়িয়ে দিলেন শৈশব-বাল্যের পাড়ার পাতানো কাকিমা।

তখন কি বেজার লাগছিল!

তা কিন্তু নয়। ভালই লাগছিল। খুবই ভাল। বরং মনে হচ্ছিল, যেন একটা জীবন থেকে কী অদ্ভুত ভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। সেই বিস্মৃতির বিরাট ফাঁকটা কিছু কিছু ভরে উঠছিল কাকিমার গল্পের মধ্য থেকে। কিন্তু এখন, আজ সকালে লিখতে বসে মনে হচ্ছে, ইস্ কাল সন্ধ্যাটা পুরোপুরি কী অকারণেই খরচ হয়ে গেল!

বেশ গুছিয়ে লিখতে বসেছে। ঘাড় নীচু। হঠাৎ পিছনদিক থেকে সেই ঘাড়ে ধাঁই করে এক রদ্দা।—শালা, তুমি তলে তলে এই মতলব ভাঁজছিলে!

বেদান্তর বাক্-স্বাধীনতা হরণের কারো শাসন নেই। কাজেই সেটা অবাধ আছে।

উঃ।

কৌশিক ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, জানিস আমার স্পণ্ডিলাইটিস আছে।

তোর মত চব্বিশ ঘণ্টার লেখকদের তো থাকবেই ওসব। শালা, তুমি কাল আমার মার কাছে গিয়ে কী করেছ?

কৌশিক অবহেলায় বলে, কী আবার করেছি? মুক্তির সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করে এসেছি।

খুব উচ্চাঙ্গের কাজ করেছ। তা মুক্তির মতামত নিয়েছিলে?

ছাড। ওর আবার মতামত নেব কী? এমন ভাল পাত্র, অমন ঘর, স্নেহময়ী শাশুড়ী—

এইগুলোই সব?

বেশ, তুই তাহলে নিজেই জিগ্যেস করগে যা। আমায় লিখতে দে।

জাহান্নমে যা। সেই বিনিয়ে বিনিয়ে গল্প তো?

হ্যাঁ, তাই। তুই যাবি? দেখগে যা, তোর প্রেয়সী বোধ হয় রান্নাঘরে বসে কুটনো কুটছে।

* * *

হ্যাঁ, কুটনো কুটছিল মুক্তি।

চিত্রা বলছিল, কী সুন্দর মিহি বাঁধাকপি কুচোতে পারিস তুই মুক্তি! শাশুড়ী মোহিত হয়ে যাবে।

মুক্তি বলল, মগজটা তো বাঁধাকপির মতোই, তাই এসবই ভাল হয়।

বেদান্ত ততক্ষণে চলে এসেছে এদিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

চিত্রা বলল, এবার থামা, হাত কাটবি।

আঃ চিত্রাদি, তুমি না এমন।

বেদান্ত অবাক হয়ে তাকাল। ওই ঝলমলে মুখে রাগের চিহ্ন কোথায়? মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহতের ভাবই বা কোথায়?

মুক্তি।

চিত্রা সরে পড়েছে, তাই এমন আবেগ-গভীর ডাক।

মুক্তি উত্তর দেয় না, শুধু চোখ তুলে তাকায়।

মুক্তি, বিশ্বাস করো আমি এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলাম না।

জানি।

মুক্তি, তাহলে?

মুক্তি হঠাৎ একটু হেসে ফেলে বলল, তাহলে আর কী। আবার বঁটিতে মন দেয়।

মুক্তি!

বলো।

একটা কিন্তু অসুবিধে হয়ে গেল।

অসুবিধে?

হ্যাঁ। আর তো দু'জনে বেরিয়ে পড়ার কোনো উপলক্ষ থাকল না।

মুক্তি কিছু বলতে যাচ্ছিল, গুণ্ডা ছুটে এসে পিঠে পড়ল, আন্টি—আন্টি!

ওরে ওরে, বঁটি বঁট। ছাড।

ইস্, ছাড়বই না, কাকু কী মজা! কী মজা! আন্টির সঙ্গে তোমার বিয়ে—তুমি টোপর পড়বে!

দু'জনে বেরিয়ে পড়ার আর কোনো উপলক্ষ রইল না, এটা বেদান্তর ভুল আক্ষেপ। বরং উপলক্ষ বাড়ল।

বিয়ের মার্কেটিং বলে কথাটা নেই? এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু'পক্ষের দায় বেদান্তরই নয়? আর কনের কোন্ জিনিসটা তাকে বাদ দিয়ে কেনা যায়? গহনা শাড়ি জামা জুতো ছাতা ব্যাগ প্রসাধন দ্রব্য এবং আরো অনেক—মাপ চাই না, পছন্দ চাই না, ভাল-মন্দর বিচারে পরামর্শ চাই না?

মায়ের হুকুমেই বেদান্তর এই অভিযান।

চিত্রাকে অবশ্য বার বার অনুরোধ করে সঙ্গে যেতে। চিত্রা ঝেড়ে জবাব দেয়, আমি সঙ্গে গেলে ওই বুদ্ধুটি নিজের 'পছন্দ'র কথা ব্যক্ত করবে? মোটেই না। চিনলাম তো এতদিন ধরে।

অতএব নিরঙ্কুশ। শুধু দু'জনে গাড়ি চড়ে শহর চষা।

বেদান্তর মা মেয়ে-জামাইয়ের বেজার মুখ 'দেখতে না পাওয়ার' ভানে মহোৎসাহে ছেলেকে হুকুম দিচ্ছেন, আমার চিরকালের সব সাধ—এইসব লিস্ট করে দিচ্ছি, কিপ্‌টেপনা করবে না।

বেদান্ত ভাবে, কী আশ্চর্য, মা এতো সব জানলেন কবে। কোথা থেকে।

গাড়ির সামনের সীটে দু'জন। চালক আর সহযাত্রিনী। গাড়ির পিছনের সীট বোঝাই বাক্সো-প্যাকেটে। শেষ কাজটা রয়েছে গহনার ডেলিভারি নেওয়া। শহরের সেরা অলংকার ব্যবসায়ীর কাছেই অর্ডার।

দোকানে আসার পথে মুক্তি বলে ওঠে, তোমরা এতো কাণ্ড করছ! আমার ভয় করছে—। খারাপ লাগছে।

খারাপ লাগছে?

লাগছেই তো! কোনো মানে হয় এতো খরচা করার? এই খরচায় পাঁচ-দশটা গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যেতো।

গরীবের মেয়ের কথা তুলছ কেন? এমন আহ্লাদের সময়?

মুক্তি আস্তে বলল, মেয়ে তো গরীবেরই। অথবা কারুরই নয়। প্রায় বেওয়ারিশ। কী ভাবে, কত অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছি। সে তুমি ধারণা করতেও পারবে না। তাই এখন এতো বেশি বেশি দেখে যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে— ভয় হচ্ছে।

ছাড়ো তো ওসব বাজে কথা। এখন বল হনিমুন করতে কোথায় যাব আমরা?

তুমিই জানো।

বাঃ, এরপর তো সব কিছু তোমাকেই জানতে হবে।

মুক্তি হেসে ফেলল, এর 'পর' থেকে তো? এখনো পর্যন্ত জানাটা তোমার দায়িত্ব।

বেদান্ত স্টিয়ারিঙে চোখ রেখে নিশ্চিন্ত গলায় বলল, প্রথমেই অবশ্য যাব বেনারসে। তোমার মামারবাড়ি। প্রণামী-ট্রনামী নিয়ে।

ধ্যাৎ!

ধ্যাৎ কী? এটাই তো ঠিক হবে। ওনাদের ব্যবহারের সমুচিত জবাব হবে। এটা আমি স্থির করে রেখেছি। হঠাৎ একদিন রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে তুমি কি হারিয়েই থাকবে নাকি? আবার আলোয় ঝলসে উঠবে না?

কি জানি, তোমার এইসব কথায় আমার বুক কাঁপে!

তুমি যে কী—খ্যাঁচ্ করে থামিয়ে ফেলতে হলো গাড়ি। হঠাৎ লাল আলো জ্বলে উঠেছে।

সামনে অগাধ গাড়ি। কে জানে কতক্ষণে ওই বিরাট বাহিনী অপসৃত হবে.

বেদান্ত এই সুযোগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, বুকটিকে একটু শক্ত করো হে রমণী। অত কাঁপতে দিও না। বেনারসে তো আমাদের যেতেই হবে। মা'র যে ওখানেও কম করে ডজন দুই ঠাকুরের কাছে মানত আছে—কবে এই শুভদিনটি আসবে। সেই সব মন্দিরে পুজো চড়াতে যেতে হবে না? তাছাড়া তোমার সেই সহপাঠিনী বান্ধবীর সঙ্গেও তো দেখা করা উচিত। অবশ্য রদবদল দেখে তিনি—ও কি, কী হলো?

গাড়ি থেমে যাওয়া থেকেই মুক্তি যেন কেমন অন্যমনা হয়ে জানলার বাইরে তাকাচ্ছিল। সেটা দেখলেও তেমন খেয়াল করেনি বেদান্ত, আপন আহ্লাদে

কথা কয়ে যাচ্ছিল। দেখল মুক্তি হঠাৎ মাথা নিচু করে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

কী হলো? চোখে কিছু পড়ল?

হ্যাঁ, চোখে কিছু পড়েছে মুক্তির। ভয়ঙ্কর কিছু। তাই মুক্তি চোখ ঢেকে ফেলে রুদ্ধকণ্ঠে বলছে, গাড়িটা চালিয়ে দাও—জোরে চালিয়ে দাও—জোরে চালিয়ে দাও।

কিন্তু কী করে চালিয়ে দেওয়া যাবে এখন?

কেউ ছুরি উঁচিয়ে মারতে আসছে দেখেও জোরে ছুট মারার উপায় নেই এখনো চলার আদেশের সাঙ্কেতিক আলোটি জ্বলে ওঠেনি। অতএব খেতেই হবে ছুরি।

না, হাতেটাতে বোমা-ছুরি কিছুই ছিল না লোকটার। খুব নিরীহ চেহারা খুব সাধারণ বেশবাস। অনেক গাড়ির পাশ কাটিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে এসেছে বেদান্তর গাড়ির ধারে।

অবাক গলায় বলে উঠেছে, মুক্তি! অবাক, ব্যাকুল—আবার যেন হতাশ করুণ।

সিগারেটটা জ্বালানো হয়নি। জ্বালাবার আগেই ফেলে দিয়েছে বেদান্ত স্টিয়ারিঙে হাত দিতে হবে, সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বলে, উঠে আসুন।

উঠে আসব? আ মানে—আমি?

বেদান্ত একটু অদ্ভুত হাসি হেসে বলল, আসবেন বৈকি। আপনাকেই তে আসতে হবে।

গাড়ির স্রোত ঠেলে আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছে।

তাই কথা চালানো যাচ্ছে। গাড়ির গতির মতই ধীরগতিতে বলল বেদান্ত. কোথায় ছিলেন এতদিন?

লোকটা ব্যাকুলভাবে অস্ফুটে আর প্রস্ফুটে অনেকগুলো কথা বলে উঠল যার মর্মার্থ, কী পাগলের মত খুঁজেছে সে মুক্তিকে।

মুক্তি নির্বাক, মুক্তির দৃষ্টি লক্ষ্যহীন ভাবশূন্য।

বেদান্ত বলল, কিন্তু মুক্তি, তোমার নীলমণি সরকারকে জিগ্যেস করছ না সেদিন হাওড়া স্টেশনের ব্যাপারটার কী হলো?

লোকটা হতচকিত হয়ে বলল, কী নাম বললেন? আমার নাম শিশির চক্রবর্তী!

ওই হোল আর কি। একই কথা। কী হোল, সেটাই প্রশ্ন।

লোকটা বিষণ্ণ গলায় বলল, অদৃষ্ট। আগের রাত্রেই হঠাৎ মা মারা যাওয়ার খবরে গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে হোল।

মুক্তি এখন চোখ ফেরাল। তাই ওর মাথার চুলগুলো এমন খোঁচা-খোঁচা, যার জন্যে মুখের চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা শ্রীহীন গ্রাম্য ভাব।

বেদান্ত একটা হোঁচট খেল—গাড়িতে নয়, মনে।

মা মারা যাওয়ার খবরে। ইস্, ভাগ্যিস। আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল, প্রেয়সীকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে মনের দুঃখে মাথা মুড়িয়ে বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন নাকি।

ভাগ্যিস বলে ফেলেনি।

আস্তে বলল, গ্রামটা কোথায়?

বর্ধমান জেলায়। রেলস্টেশন থেকে অনেক দূরে। চোদ্দ মাইল হাঁটতে হয়। কোনো গাড়ি পাওয়া যায় না।

কিন্তু এসব প্রশ্নগুলো কি বেদান্তকেই করতে হবে? মুক্তির কণ্ঠনালিতে কি কেউ সীসে ঢেলে দিয়েছে?

বেদান্ত বলল, খবরের কাগজ-টাগজ যায় না বোধ হয়।

না:। ডাকঘরও তো বহুদূরে। হাটবারে হাটবারে কে একজন একটা কাগজ এনে পড়ে শোনায়, তাতেই যা খবর। সাতদিনের বাসি খবর।

আবার একটা প্রায়-জ্যামধরা রাস্তা। কিছু না, একটা ঠেলাওলা রাস্তায় আড়াআড়ি বেকায়দা হয়ে যাওয়ায় তার মালপত্র ছড়িয়ে পড়ে গেছে। অতএব জমে উঠেছে দু'একটা গাড়ি, দু'একটা রিকশা, কিছু মানুষ।

ওর মা মারা যাওয়ার খবরে ওকে চোদ্দ মাইল রাস্তা ভেঙে গ্রামে চলে যেতে হয়েছিল, বেদান্তর শুনে পর্যন্ত মনটা কেমন একটু নরম হয়ে গিয়েছিল। এখন শুনল, সে-গ্রামে খবরের কাগজ যায় না। হাটবারে-হাটবারে সাতদিনের বাসি খবর।

মন আরো নরম হয়ে গেল।

সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, সেই অবধিই গ্রামে ছিলেন? কলকাতায় আসেননি আর?

মাথা নাড়ল লোকটা।—কলকাতায় আসিনি, বেনারসে গিয়েছিলাম।

বেনারসে। মুক্তির গলা থেকে এতক্ষণে অস্ফুটে একটা কথা ফুটল।

ওর গলার স্বরেও একটু প্রাণের আভাস।—আর কোথায় যাব বলো? জানি তো কলকাতায় তোমার কেউ নেই।… কিন্তু মন্টি বলল, তুমি সেই যে তিন মাস আগে রাত্রে বেনারস ছেড়ে চলে এসেছ, আর কোনো খবর নেই।

ওঃ, সেই অবধি আমাদেরই মতো এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

আপনাদের মতো মানে?

বলছি—আগে আপনারটাই শুনি।

তারটা সে এলোমেলো ভাবে শোনালো। রোগা কালো, খোঁচা-খোঁচা চুল মাথা, বেচারা শিশির চক্রবর্তী।

বেনারস থেকেই তাকে চলে যেতে হয়েছিল বাঙ্গালোরে। গরীবের কাছে সকলের ওপর হচ্ছে চাকরি। নতুন চাকরি, জয়েনিং ডেট পার হয়ে গেছে—

জানেন, মাকে পুড়িয়ে এসেই পাঁচ মাইল হেঁটে পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম টেলিগ্রাম করে অবস্থা জানাতে। তারপর বেনারস থেকেই—শুনলে বিশ্বাস করবেন না, বাঙালী অফিসার, চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, আশা করি দ্বিতীয়বার আর মা মরবেন না! এই পৃথিবী।

তারপর আর কী? তারপর এই ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে খুঁজতে ওর এক বন্ধু নাকি চিঠিতে লিখেছিল, কবে কোন্ কাগজে শিশির চক্রবর্তীকে উদ্দেশে করে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—তা জগতে কত শিশির চক্রবর্তী আছে। ঠিকানাও ঠিক ছিল না, তবু আশা—

ঠিকানা ঠিক ছিল না।

বেদান্ত বলে উঠল, আপনার সেই বন্ধুর মেসের ঠিকানাটা কী বলুন তো?

ওর ঠিকানা, তেরোর তিন নির্মল সরকার লেন। আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে—

থাকগে, পাঠভ্রম।

বেদান্ত বলে উঠল, মুক্তি, তোমার নীলমণি শেষটায় 'নির্মল' হয়ে গেল। হায় হায়! ও মশাই, শিশিরবাবু, আমরা এই একশো দশদিন ধরে ওই নীলমণিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!

লোকটা এতক্ষণ পরে যেন পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে দেখার অবকাশ পেল। দেখল গাড়ির সীট বোঝাই বস্তুপুঞ্জে। দেখতে পেল মুক্তির রাজেন্দ্রাণীর মতো মূর্তি। আস্তে বলল, আমায় খুঁজে বেড়িয়েছেন? কী অদ্ভুত! কিন্তু

আপনি—মানে ইয়ে, মুক্তির কে ?

দেখতেই পাচ্ছেন, ড্রাইভার !

লোকটা ওর বলার ভঙ্গিতে একটু যেন হেসেই ফেলল। বলল, কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে ?

বিয়ে ! িয়ে আর হলো কখন মশাই ? বিয়ের বরই তো নো-পাত্তা ! তাকে গরুখোঁজা করে খুঁজতে খুঁজতে—যাক এতদিনে আশা হচ্ছে--আরে আরে, গয়নার দোকানটা যে ছাড়িয়ে আসছি।—

* * *

অতএব বিয়েটা হচ্ছে ! বেশ সমারোহ সহকারেই হচ্ছে। কোথায় ?

কেন, শহরে ভাড়াটে বিয়েবাড়ির অভাব ? তারা শুধু বাড়িই নয়, নাপিত থেকে পুরুত, বরণডালা থেকে 'কলাতলা' পর্যন্ত সব সাপ্লাই করতে পারে। কলকাঠিটি নাড়লেই হলো।

* * *

কৌশিক বলল, লোকটা কি পাগল হয়ে গেল ?

চিত্রা বলল, পাগল নয়, বদ্ধ উন্মাদ।

বেদান্তর মা আবার কাশী যাওয়ার সময় বলে গেছেন, এই শেষ! কাশীর মাটিতেই মাটি হতে চাই !

বেদান্তর বোন বলল, তখনই বলিনি, দাদা একটা জোচ্চোর মেয়ের পাল্লায় পড়েছে ! এই তো, গহনা-কাপড়েব গাদা গেঁটিয়ে নিয়ে কেটে পড়বে। হয়তো এই ব্যবসা।

বেদান্তর ভগ্নীপতি বলল, হুঁ বাবা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পরের বিয়ে করা বৌকে ভাগিয়ে এনে যা ইচ্ছে চালাচ্ছিলি—চালালেই হলো। এখন মানে মানে ছেড়ে দিতে হলো কিনা। না দিলে লোকটা পুলিস-কেস করে ছাড়তো না ? লোক দেখিয়ে আবার তার সঙ্গে বিয়ের নাটক করা হচ্ছে। লোকে যেন ঘাস খায়।

আর শিশির চক্রবর্তী এবং মুক্তি ঘোষাল ?

প্রথমজন হাতজোড় করেছিল, কাতর অনুনয় করেছিল, বলেছিল, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। সে সানন্দে মুক্তিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেবে। মুক্তিকে তার এই সাজানো সিংহাসন থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের কুঁড়েঘরে পুরে ফেলতে হলে জীবনে স্বস্তি পাবে না।

কিন্তু স্বত্তি জিনিসটায় বুঝি আর কারো দাবি নেই। বেদান্ত বলেছিল, নিজের ক্লেম ছেড়ে দিয়ে স্টেজ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইছেন? আচ্ছা মহাপুরুষ ব্যক্তি তো আপনি মশাই! কিন্তু তা হয় না।

কেন হয় না?

বলি আমারও তো বিবেক বলে একটা জিনিস থাকতে পারে। আর থাকলে তার দংশনও থাকবে।

অভাগা শিশির চক্রবর্তী। হতাশ গলায় বলল, এতো সুখ, এতো ঐশ্বর্য, এমন রাজার মতো চেহারার বর—এইসব থেকে বঞ্চিত করে মুক্তিকে নিয়ে গিয়ে—না না, আমায় ছেড়ে দিন।

বলেন কি মশাই, এতোদিন ধরে গরুখোঁজা করে খোঁজার পর হাল ছেড়ে দেবার মুখে ভগবান ব্যাটা যদি মিলিয়েই দিলেন, আর ছাড়ি? ঘটনাটা ঘটে গেলে কী হতো বলুন তো?

ভালই হতো।

শিশির চক্রবর্তী বলল, সেটাই ঠিক হতো। এ আমার অসহ্য লাগছে। আমি যদি পালাই!

বেদান্ত বাগচী বলল, তাহলে আবারও সেই পুরনো পালায় নামতে হবে। আবার গরু খুঁজতে বেরোতে হবে। ডবল করে আর খাটাবেন না মশাই।

অতএব আর কী!

ছাড়ান-ছোড়ান যখন নেই, তখন গরীব বেচারা শিশির চক্রবর্তী, ঘরের অভাবে যে বিয়ে করতে পেরে ওঠেনি, আর এখন একখানা ঘরের কোয়ার্টার পেয়ে ধন্য মনে করছিল, তাকে সোনার টোপর মাথায় দিতেই হচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে এতো? বরের মখমলের বরাসন পর্যন্ত না হয় চলতে পারে, কিন্তু কনের সর্বাঙ্গের ওই রত্নালঙ্কার-ভার! ওগুলো নিতে পারা যাবে না, দাদা!

না পারেন, গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে যাবেন। বলেই একটু অলৌকিক হাসি হেসে বলেছিল বেদান্ত বাগচী, বুঝতেই তো পারছেন মশাই, আপনার অদর্শনকালে ফাঁকা পেয়ে আমি আপনার প্রেয়সীটির প্রেমে পড়ে বসেছিলাম। এগুলো তার স্মৃতিচিহ্ন বলেই মেনে নিন।

শিশির চক্রবর্তী গরীব হতে পারে, একটু মুখ্যুসুখ্যুও হতে পারে, কিন্তু বোকা নয়। তাই বেদান্তর চোখের দিকে না তাকিয়েই বলে, কিন্তু ব্যাপারটা কী

একতরফা হতে পারে? আপনাকে এই ক'দিন দেখে আমিই প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। আর—

আর কিছু নয়—আর কিছু নয়, ও ঠিক হয়ে যাবে। এইতো, আমি তো—

*   *   *

আর ওই দু'জনের দ্বিতীয়জন?

এখনো যে মুক্তি ঘোষাল? সে কী বলে?

সে তার একমাত্র বান্ধবী চিত্রার কাছে বলেছে, কী জানি, বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। হয়তো ভালোই হচ্ছে। সারাজীবন এই প্রাণ হাঁফিয়ে তোলা দুরন্ত ভালবাসার ভার কী বইতে পারতাম!

কিন্তু দু'জনে দু'জনকে কী বলল? বেদান্ত আর মুক্তি?

বলবে আবার কখন? কথা বলার সময় আছে বেদান্ত বাগচীর? তার মাথায় দু'-দু'টো মা বাপ মরা অসহায় জীবের বিয়ের ভাবনা। নিঃশ্বাস ফেলারই সময় নেই।

বিয়ের রাতে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নে তার উৎসাহ দেখার মতো। আয়োজন মনে রাখার মতো। মুখে কথার বিরাম নেই, হাসিরও অভাব নেই।

নেমন্তন্ন খেয়ে এসে চিত্রা শাড়ি-গহনা ছাড়তে ছাড়তে বলে, উপন্যাসের প্লট প্লট করে ভাবো, তোমাব বন্ধুকে নিয়ে একটা লেখো না? ভালো প্লট হবে!

কৌশিক বলল, দূর, ছাড়ো ওর কথা। শালা একটা রাবিশ। শালা উদোম হয়ে মহানুভবতা দেখাতে বসলো। ধ্যেৎ!

চিত্রা কানের ফুলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে খুলতে বলল, মহানুভবতা দেখাতে বসলো কেন? ওটাই তো ওর স্বভাব।

স্বভাব নয়, রোগ।

কৌশিক রেগে রেগে বলে, ওই রোগেই জীবনটা স্রেফ বরবাদ করে দিল। অথচ দেখো, ওই শিশির চক্রবর্তী না কে, ও তো দাবি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেই চেয়েছিল। যাকগে, মরুকগে—

বাল্যবন্ধুর বুদ্ধিভ্রংশতায় মর্মাহত কৌশিক বলে ওঠে, ভাবনার কিছু নেই। আবার কিছুদিন পরেই ঠিক দাঁত বের করে এসে বলবে, আবার ফেঁসে গেছি ভাই। কী একখানা উপন্যাসের প্লট রে!

চিত্রা এখন সব ছেড়ে নাইটিটা পরে পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে বিছানায়

এসে বসে বলল, নয়ই বা কেন? তোমরা ওই ফেঁসে যাওয়াটাই দেখো, ফাঁসার কারণটা ভেবে দেখেছ কোনোদিন?

কারণ? কারণ আবার নতুন কী? সেই আদি ও অকৃত্রিম। মেয়েমানুষ দেখলেই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য!

কী আশ্চর্য, তুমি এই কথা বলছ?

চিত্রা তার স্বভাবগত ঝঙ্কারের ভঙ্গিতে না বলে গাঢ় গভীরভাবে বলল, তোমার বন্ধু, তুমি ওকে বুঝতে পার না?

অনেক আলোয় ঝলমলে বিয়েবাড়ির জৌলুসের পর এই আলো-নিভানো শান্ত ঘরটা কেমন গাঢ় গভীর লাগছে বলেই কি চিত্রার এই পরিবর্তন?

বলল, শুধুই 'মেয়েমানুষ দেখলেই'। ছিঃ, কী বলছ? লোকটা তাকিয়ে দেখে কারুর দিকে? তাহলে তো আমার মতো একখানা সুন্দরী মেয়ে একা ওর সামনে দাঁড়াতেই ভয় পেতো গো! ও-লোকের সঙ্গে আমি একা একটা ঘরে রাত কাটাতেও পারি, বুঝলে?

অ্যাঁ! তাই নাকি?

কৌশিক অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ওর পিঠটা ছুঁয়ে বলল, সত্যি পার?

নিশ্চয়। পুরুষের লোভের নির্লোভের চোখ বুঝতে মেয়েদের দেরি হয় না।

চিত্রা শান্ত গভীর গলায় বলল, চিরকালের বন্ধু—বুঝতে পার না লোকটা কিসে কাণ্ডজ্ঞান হারায়? ওর সারাজীবনের ফেঁসে যাওয়ার ইতিহাস তো আমার তোমার কাছেই শোনা!

কৌশিক বলল, আরে আরে, বলো তো শুনি তুমি তার মধ্যে থেকে কোন্ রহস্য আবিষ্কার করে রেখেছ! তাহলে না-হয় ওকে নিয়েই একটা গল্প ধরে ফেলি!

নাঃ।

চিত্রা শুয়ে পড়ে হাই তুলে বলে, ও তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে

অসমাপ্ত কাজের বোঝার চিহ্ন ফাইলগুলোকে গাদা মেরে টেবিলের একধারে ঠেলে রেখে সামনেটার টুকিটাকি জিনিসপত্র সাফ করতে করতে রত্নাকর চশমার কোণ দিয়ে একবার পম্পার টেবিলটার দিকে তাকাল।

যেমন রোজ হয়। যাকে বলে 'নীট অ্যাণ্ড ক্লীন'। এছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না পম্পার সেদিনের কাজ সাঙ্গ করে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ার সময়।

তবে টেবিলের কাজ সাঙ্গ হলেও, দেখা যাচ্ছে পম্পা তার ঢাউশ হাতব্যাগটা নিয়ে খুব ব্যস্ত। তার গায়ে 'ঘরদোর' অনেক। জিব টেনে টেনে প্রত্যেকটা চেম্বার খুলে খুলে দেখছে, ঢাউশের গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াচ্ছে তো হাতড়াচ্ছে।

রত্নাকর ভাবল, মেয়েদের এই হাতব্যাগের মধ্যে যে কী থাকে, আর কী না থাকে! বেশি সংসারী-মার্কা মেয়েগুলোর তো মাঝে মাঝে ব্যাগগুলো এত ঢাউশ হয় যে বাজারের থলির কাজ করে।

রত্নাকরের বউদি তো তার 'শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়ে'র চাকরি সেরে বাড়ি ফেরার সময় শেয়ালদা বাজার থেকে সস্তার বাজার করে ফেরে। 'সস্তার বাজার' তো এইসব গিন্নীমার্কা মেয়েদের কাছে পরম প্রেমাস্পদের থেকেও আকর্ষণীয়। দরকার না থাকলেও বউদি একবার একটু ঘুরবেই বাজারটা। তা সবকিছুই ওই হাতব্যাগের মধ্যে।

একদিন বউদি তার সর্বংসহা ব্যাগটির মধ্যে দু'কিলো বাঁধাকপি আর গোটা আষ্টেক কচি শশাও এনেছিল। কৌশলে কী না হয়, কপিটাকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে দিব্যি কব্জা করে ফেলে শশাদের গায়ে গায়ে শুইয়ে এনেছিল। আর একদিন একটা 'সুন্দরবনের তরমুজ'।

এ গল্প শুনিয়ে পম্পাকে বেদম হাসিয়েছিল রত্নাকর। পম্পা বলেছিল, এক্ষেত্রে তো আর ওই 'খণ্ড-খণ্ড'র কৌশল খাটানো যায়নি?

তা অবশ্যই নয়। কোন একটা কৌশল প্রয়োগ করেছিল। তরমুজ অটুটই ছিল। আর সাধের সুন্দর পলিথিনের ব্যাগটিও অটুটই ছিল।

রত্নাকর পম্পার হাসি দেখে বলেছিল, হবে হবে। ভবিষ্যতে আপনার এ মনোভঙ্গী আসবে। এখনই তো দেখি, এই একখানি ঢাউশ বয়ে বেড়ানো। কত ঘরদোর কত বড় গহ্বর! কী কাজে লাগে এত?

পম্পা বলেছিল, বোঝানো যাবে না।

এখন পম্পার ব্যাগ হাতড়ানো দেখে রত্নাকর কয়েক ফিট এগিয়ে এসে হাসির আলো মুখে ছড়িয়ে বলে উঠল, কী খুঁজছেন? মাথাধরার ট্যাবলেট? লণ্ড্রীর রসিদ? বদল দেবার শাড়ির ক্যাশমেমো? চশমার প্রেসক্রিপশন? পুরনো বান্ধবীর ঠিকানা? ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কার্ড, না কি—থেমে গেল।

পম্পা বলল, থামলেন কেন? চালিয়ে যান। আপনার অনুমান-শক্তির বহরটা দেখা যাক।

নাঃ, আর কী কী থাকা সম্ভব মনে বা মাথায় আসছে না। আপনিই বলুন।

পম্পা এখন ব্যাগ হাতড়ানো বন্ধ করে ফেলে তার মুখটা বন্ধ করে ফেলতে ফেলতে বলল, এমন কিছু না।

এত হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন, আর এমন কিছু না?

না, মানে এখন মনে হচ্ছে বোধ হয় বাড়িতেই ফেলে এসেছি।

রত্নাকরের হঠাৎ মনে হল বলে ওঠে, 'এখন' কিছুই মনে হয়নি তোমার। তখন কিছু খুঁজছিলেও না। এটা শুধু সময়ক্ষেপণের ছল। এই অভাগা রত্নাকরের সঙ্গে একসঙ্গে বেরোবে বলে এবং সেটা সে হতভাগাকে জানতে দেবে না বলেই তোমার এই বৃথা ছল।

কিন্তু বলে ওঠা তো যায় না।

অধৈর্য হয়ে অকালে উদ্ঘাটন করতে বসার চেষ্টা মুখ্যমি। কুঁড়িকে ফুল হয়ে ওঠবার জন্যে সময় দিতে হয়। অতএব রত্নাকর অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, টেবিলটাকে সবদিন এরকম সাফসুতরো করে ফেলেন কী করে বলতে পারেন?

পম্পা হেসে ফেলে বলল, এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

আমার তো দারুণ শক্ত মনে হয়। সময় হয় না তো।

পম্পা মুখ টিপে হেসে বলল, বার-আষ্টেক চা আর গোটা-কুড়ি-তিরিশ সিগারেট ধ্বংসালে অবশ্য সময় একটু কমে যাবেই।

তা এসব না হলেই বা এনার্জি আসবে কী করে?

পম্পা এখন শুধুই একটু হাসল। বলে তো ওঠা যায় না, আমার তো আসে। আমাদের মেয়েদের।

তাই হাসির পর বলল, ইচ্ছে করলে এর ডবল কাজও করতে পারেন আপনি।

ইচ্ছে করলে! মাই গড! এই গোয়ালের মধ্যে ডবল মাপে কাজ করতে ইচ্ছে হতে যাবে আমার? না না, আপনি আমাদের মত অকর্মাদের খুব অনিষ্ট

করছেন।

অনিষ্ট।

তাছাড়া আবার কী? হঠাৎ কখন কার নজরে পড়ে যাবে, একজনের যদি হয়ে ওঠে, আর একজনেরই বা হবে না কেন?

বললেন তো গোয়াল। এখানে কে কার কাজের হিসেব করছে। আপনি চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও আপনার যথাসময়েই প্রমোশন-ট্রমোশন হবে, যথানিয়মেই মাইনেকড়ি বাড়বে। 'নিদ্রিত ভগবানের' কাজ-কারবার তৈ তো নয়।

আরেব্বাস! জ্ঞান তো বেশ টনটনে! তবে এত খেটে মরেন কেন?

পম্পা হেসে বলে, স্বভাবের দায়।

হুঁ। বেশি সিনসিয়ারদের এইরকম দশাই হয়। অথচ—

ওরা এখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে করিডোরের ভিড়ের চাপের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির দিকে আসছে। ভিড়ের জন্যে একটা জানলার ধারে এসে দাঁড়াল।

গরমকাল, বেলা বড়। তাই এখনও আলোর সমারোহ। জনাকীর্ণ কলকাতার উদ্দাম গতির ওপর কে যেন একটি মোহময় ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে। তবে বড় ক্ষণস্থায়ী। যেমন ক্ষণস্থায়ী এই ভিড় থেকে গা বাঁচিয়ে এই জানলা ঘেঁষে দাঁড়ানোর সময়টুকু।

পম্পার মুখে-চোখে এই কনে-দেখা আলোর একটি অনির্বচনীয় মায়া। মুখট কিন্তু সে রত্নাকরের দিকে না তুলে বাইরের দিকে ফিরিয়েই বলল, অথচ কী?

অথচ অকারণ। সবটাই শখ। এই চাকরি, এই খাটুনি।

পম্পা আস্তে বলল, আপনার এ ধারণা ভুল। এটাই আমার বাঁচার একমাত্র উপায়। চলুন।

হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই চলতে হবে, নেমে যেতে হবে। এই মিনিটখানেকের একত্র দাঁড়ানোটুকুও যে লোকের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, তা না তাকিয়েও বুঝতে পারা যাচ্ছে।

ভিড়ের চাপেই এগোনো, তবু একসঙ্গেই এগোনো। গেট থেকে বেরিয়ে একটু গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রত্নাকর। একটু হতাশ গলায় বলল, ওঃ, আপনার যে আজ থানায় রিপোর্টের দিন। রথ এসে দাঁড়িয়ে আছে। মনে ছিল না।

পম্পা একটু ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ, দারোগা সাহেবের আইনের নড়চড় নেই

আপনার বাড়িতে জানেন ?

তা জানেন বৈকি। ওঁরা বিচক্ষণ লোক, কাজের খুঁত রাখেন না। আগে গাড়ি নিয়ে ওখানে মাকে খবর দিয়ে দেওয়া হয়—'এসেছি, নিয়ে যাচ্ছি।'

একটু হাসল, সেই সঙ্গে কুটুমবাড়ির বাগানের ফল-টল, কুটুমবাড়ির গরুর দুধের মিষ্টি-টিষ্টি প্রেজেন্ট করে আসাও হয়। অর্থাৎ নাগপাশের বন্ধন।

রত্নাকর একটু কঠিন আর তীব্র গলায় বলে উঠল, আপনার উৎসাহ দেখলে তো মনে হয় না নাগপাশ!

পম্পা বলল, যা দেখা যায়, সেটাই কি সব ?

তারপর দ্রুতপায়ে অপেক্ষমাণ গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

ড্রাইভার দরজা খুলেই দাঁড়িয়েছিল, লম্বা সেলাম করল। পম্পা উঠে বসার পর দমাস শব্দ করে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। এগিয়ে গেল।

ওই শব্দটা যেন রত্নাকরের মাথায় ধাক্কা দেয়, বুকে ধাক্কা দেয়।

প্রতি সপ্তাহের ব্যাপার, অনিবার্য এবং অমোঘ, তবু রোজই রাগে গা রি-রি করে তার।

পম্পাকে নজরবন্দী আসামীর সঙ্গে তুলনা করে রত্নাকর। আর পম্পার এই দামী গাড়ি চড়ে বলতে গেলে রাজকীয় ভ্রমণটিকে বলে, আসামীর সপ্তাহে সপ্তাহে থানায় উপস্থিতি পেশ করতে যাওয়া।

ওই যাওয়াটার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে দেখে রত্নাকর ভাবল, হুঁ, বিচক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। নাকি খুব পুরনো ড্রাইভার, তবু একা আসে না। গাড়ির মধ্যে যথানিয়মে পুরনো দাসীও বসে। পম্পা তার পাশে গিয়ে বসল। আজ শনিবার সন্ধ্যায় যাবে, কাল রবিবার পুরো দিন-রাত্তিরটা থাকবে, সোমবার সকালে ওখান থেকেই নেয়ে-খেয়ে অফিসে চলে আসবে। এই মস্ত গাড়িখানাই পৌঁছে দিয়ে যাবে। ওই দাসীটিও সঙ্গে থাকবে। এই রুটিনই চলছে।

* * *

রত্নাকরের অফিসটা সরকারী এবং কেন্দ্রের অধীন। তাই ছুটিছাটার নিয়ম সেই 'কেন্দ্র নির্দেশিত'। শনিবার হলেও হাফ-ডের ব্যবস্থা নেই। মাসে একটা ছুটি দিয়ে চারটে হাফ-এর শোধ।

এই নিয়ে তার বউদির প্রতি শনিবারেই আক্ষেপ। একটা দিনও দুই ভাইকে একসঙ্গে গুছিয়ে চা-টা দিতে পাই না! বুড়ো ভদ্দরলোক কখন এসে বসে থাকে, তাকে টাঙিয়ে রাখতে মায়া হয়!

লতিকার 'শ্যামনগর বালিকা বিদ্যালয়ের' শনি-রবি দুদিন ছুটি। তাই তা: এত বাহাদুরি। অন্যদিন তো স্কুল সেরে আর বাজার সেরে, ফিরতে সন্ধ্যে।

সুধাকর খালিগায়ে একটা লুঙ্গিমাত্র পরে সকালের খবরের কাগজটা এই অকালে পড়ছিল। তার দিকে একটি কটাক্ষপাত করে রত্নাকর বলল, ত 'বুড়ো ভদ্দরলোককে' আর এক কাপ চা দেওয়া হবে তো!

না দিলে ছাড়বে? লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, পেলে তো দশবার খায় অফিসেও তো হয়ে যায় বারকতক।

রত্নাকর বলল, কাজটা খুব ঠিক করে না দাদা।

তোমার দাদাব কোন্ কাজটাই বা খুব ঠিক? লতিকা ঝঙ্কার দিল. সবই যা-তা।

রত্নাকর বলল, সব সময় অবশ্য তোমার সঙ্গে একমত হতে পারি না, তবে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। বুঝলে হে 'শ্যামনগব বালিকা বিদ্যালয়', সম্পূর্ণ স্বমত। এই যেমন তোমাকে এই যথেচ্ছ বাকস্বাধীনতা দেওয়া। এটা কি আর খুব ঠিক?

লতিকা চড়াগলায় বলল, দেওয়া মানে? স্বাধীনতা কি একটা মেঠাই? যে হাতে তুলে দেবে? দেয় কেউ কখনো তা? ওটি অর্জন করবার জিনিস, বুঝলে? এবং করেছি।

ও! তাহলে আর কিছু বলার নেই। তবে দাদা, তোমার বেঠিক কাজের লিস্টটি নেহাত ছোট নয়। এই যে তুমি এই খোলা বারান্দায় খালিগায়ে একটা লুঙ্গি পরে বসে আছ, এটা কি খুব ঠিক?

দেখছ তো? লতিকা বলল, দেখ! আমি তো বলি—শুধু এই অসভ্যতার জন্যেই তোমাকে আমার ডিভোর্স করা উচিত ছিল। করিনি নেহাত দয়া করে। আবার বলে কি জানো? বেটাছেলের আবার খালিগায়ে লজ্জা কী? বেটাছেলে বলে সাতখুন মাপ! তাদেরই শুধু গরম লাগে!

সুধাকর বলল, আরে বাবা, কথা তো দিয়ে রেখেছি বাড়িতে ভাদ্দরবউ এলে খুব সভ্য হয়ে যাব। সব সময় ধবধবে গেঞ্জি, পাটভাঙা পায়জামা, প্লেটে ঢেলে ঢেলে চা খাওয়া নয়—মানে একজন সভ্যভব্য ভদ্দরলোক।

রত্নাকর বলল, তাব আগে এসব করা চলবে না?

আহা বুঝছিস না, অনেক দিনের অভ্যেস, একটা উপলক্ষ-টুপলক্ষ দেখে ছাড়লে মনে একটা দায়িত্ববোধ আসে।

তাহলে হে 'শ্যামনগর বালিকা', তোমার আর সভ্যভব্য পরমগুরু কপালে নেই।

কেন, কেন? সুধাকর বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস হবে না কেন? তুমি যখন কথা দিয়েছ। তবে বউদির ভাগ্যে বাড়িতে ভাদ্দর-আশ্বিন-কার্তিক কোন বউই মাথা গলাতে আসবে না।

বারান্দা থেকে ঘরে চলে আসে রত্নাকর, পিছনের প্রতিক্রিয়াটা না দেখেই। বিয়ে সম্পর্কে কোনদিনই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না তার, শুধু আর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েই ছিল প্রশ্ন। তবে তার জন্যে বিরাট কিছুরও চিন্তা ছিল না। দাদা বউদির জীবনটা কী সুখহীন?

ওই 'সস্তায় বাজার' করতে পেলে রাজ্যজয়ের সুখে সুখী ডেলি প্যাসেঞ্জারী করা দিদিমণি মহিলাটি আর সন্ধ্যাকালে খালিগায়ে লুঙ্গি পরে বসে সকালের খবরের কাগজখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে মাঝে-মাঝেই 'দেশের কী অবস্থা হলো' বলে আক্ষেপ করে ওঠা পুরুষটি—এদের সাবাক্ষণ সর্বাঙ্গবেই যেন সুখের হিল্লোল, পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা।

মা থাকতে এত লক্ষ্য পড়ত না। এবং 'দাম্পত্যজীবনের' সুখ-সন্তোষ নিয়ে মাথা ঘামাবারও বয়েস অথবা খেয়াল হয়নি। খেয়াল হয়ে পর্যন্তই দেখেছে রত্নাকর—দেখছে ভারী সুখী তার সম্পূর্ণ এরা।

কই, এদের তো তুচ্ছ মনে হয়নি। ভেবেছে কী ক্ষতি যদি এদের মতই হই, এই সংসারেরই তো ছেলে আমি। আবো অনেক 'বেশি'র এমন 'ক দরকার? তবে চিন্তা এই, লতিকার মত সবসময় আহ্লাদে-ভাসা-মেয়ে কি সর্বদা মেলে? তবু ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না। অতএব সেই সাহসেই লতিকা আহ্লাদে ভেসে ভেসে তলে তলে দেওরের জন্যে কনের চিন্তা করছিল।

হঠাৎ রত্নাকর আজ সেই আহ্লাদটির ওপর একখানা পাথর ফেলে দিয়ে চলে এল।

হয়ত এর কিছুই হত না। হয়ত কোনো একদিন দাদা-বউদির পছন্দ করা কোনো এক মেয়েকে বিয়ে করতে টোপর পরে বেরিয়ে পড়ত। এবং হাজার হাজার সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের সাধারণ সুপাত্ররা যেভাবে সকল প্রকার গতানুগতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যেই পুলকের উপাদান আবিষ্কার করতে করতে বিগলিত চিত্তে বাসরে গিয়ে বসে, সেইভাবেই বসত। যদি না—

হ্যাঁ, যদি না কোনো এক শুভ কি অশুভ লগ্নে পম্পাকে দেখত।

কী অদ্ভুত আশ্চর্য। এই অফিসেই নাকি কাজ করছে পম্পা অনেকগুলো দিন। শুধু ডিপার্টমেণ্টের পার্থক্যে দেখা হয়নি। সহসা একদিন সেই পার্থক্যটা ঘুচে গিয়ে একই ঘরে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসতে হল পম্পা আর রত্নাকরকে।

নিজের ঘরে এসে রত্নাকর আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে মনে মনে বলে উঠল, পম্পা—পম্পা! মাত্র বছর দেড়েক আগেও তোমার সঙ্গে দেখা হল না কেন আমার? তখন তো তুমি এমন দুর্লভ হতে না?

অন্ধকারেই উঠে বসল। মনে-মনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, কিন্তু এখনই বা তুমি এমন দুর্লভ হবে কেন? কেন বোকার মত একটা পাগলামির পাল্লায় পড়ে থেকে জীবনটাকে বরবাদ করতে থাকবে?

এমন হয় নাকি? না, না। এ হতে পারে না। এ চলতে দেওয়া যায় না। কেনই বা দেব? পম্পা—পম্পা! আমি কি বুঝতে পারি না? পম্পা—'বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?'

পম্পা তুমি যে আমায় ভাবালু করে ছাড়ছ দেখছি।

রত্নাকর ঘর থেকে উঠে চলে যাবার পর সুধাকর বোকার মত একটু তাকিয়ে থেকে লতিকাকে বলল, এটা কী হল?

লতিকা ভুরু কুঁচকে বলল, ঠিক বুঝলুম না। এই তো ওর এবারের প্রমোশানটার পর থেকেই কনে খোঁজাখুঁজি করছি, জানে না নাকি? তা আপত্তির ভাব তো দেখিনি বাবা!

সুধাকর একটু ভেবেচিন্তে বলল, ছবি-টবি পছন্দ হয়নি বোধ হয়।

ছবি! কার ছবি?

ওই যে কনেদের।

লতিকা বিরক্তগলায় বলল, ছবি আবার কে দেখিয়েছে? আবার কনেদের! একে ওকে বলছি তো সবে। এখনো ছবি-টবি আসে নি।

ওঃ, বুঝেছি। হেসে উঠল সুধাকর।

লতিকার ভুরুটা আরো কুঁচকে গেল, কী বুঝলে?

বুঝলুম তোমার এই গয়ংগচ্ছ দেখে দেবর লক্ষণের হতাশা এসে গেছে। তাই একটু শুনিয়ে দিয়ে গেল।

তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনিই বুঝে ফেলা!

কেন, ভুলটা কী হল?

সে কি আর তুমি বুঝবে! স্বর অন্য।

সুধাকর আবার একবার হেসে ওঠে, তাহলে আর কিছু না, তোমাকে রাগাবার জন্যে—

লতিকার কোঁচকানো ভুরু সোজা হল না। একটু গুম হয়ে বলল, বোকা-বোকা কথা বোলো না। আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপার অন্য।

অন্য মানে?

মানে কোনোখানে প্রেম-ট্রেমের গাড্ডায় পড়ে গেছে হয়তো!

কী আশ্চর্য! এটা আবার কী সূত্রে ভাবতে বসলে?

দেখো এই একটা জায়গায় মেয়েদের চোখ 'এক্সরে আই', বুঝলে? ওসব সূত্র-টুত্রর দরকার হয় না।

সুধাকর বৌয়ের গুম হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, দাঃ! তোমার কথাবার্তা আজ এমন উল্টোপাল্টা যে? ছোট ভাইয়ের ব্যাপার, বলি কোন্ লজ্জায়, তবু না বলেও পারছি না, ওইসব ইয়ে-ফিয়ে যদি হয়েই থাকে, তাহলে তো বরং ব্যাপারটা এগিয়েই আসছে। নাটক-নভেলে তো লেখে—'প্রণয়ের পরিণামই পরিণয়'!

লতিকা বলল, নাটক-নভেল পড়লে কবে যে এইসব পাকা-পাকা কথা শেখা হয়েছে?

তার মানে? আমি কখনো নাটক-নভেল পড়িনি?

দেখলুম না তো কখনো।

ওঃ, দেখা! কেন, তোমার দেখার আগে কি আমি—কী বলে নিরক্ষর ছিলুম?

আমার দেখার আগে? সেই তামাদি কালে? তা তখন বোধ হয় এই থিয়োরিই ছিল।

কী আশ্চর্য! এখনই বা নয় কেন? তখন বরং লোকের লজ্জা-টজ্জা ছিল, মুখ ফুটে বলত না। এখন তো সে বালাই নেই। তুমি একবার জিগ্যেস করলেই তো পারো।

কী জিগ্যেস করব?

কী আবার? ওই কথাটা। তোমার তো দেখি, মুখে কিছু আটকায়-কাটকায় না। সোজাই জিগ্যেস করবে।

লতিকা মুখটিপে হেসে বলে, অর্থাৎ সোজা জিগ্যেস করব, মূর্খ, তুমি কি

প্রেমে পড়িয়াছ ?'

মূর্খ। মূর্খ কেন ?

কেন নয় ? মুখ্যুরাই প্রেমে পড়ে।

যাচ্চলে, একতরফা চালিয়ে যাচ্ছ তো বেশ। আসলে হয়তো কিছুই না তোমার কল্পনা।

তা হলেই ভাল।

সুধাকর নিশ্চিন্ত হবার একটা পথ পায়। বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইই হবে। কী একটু বলে গেল, হয়তো ঠাট্টাই, আর তুমি অমনি ভেবে বসলে—যাকগে, একটা কাজ বরং করো, চটপট গোটাকতক সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে যোগাড় করে ফেলে দ্যাওরকে দেখিয়ে দাও। ব্যাস, লেগেই যাবে একটা। তারপর লেগে যাও কোমর বেঁধে'

লতিকা খুব নিরীহ গলায় বলল, ইস। সত্যি, এটা তো আগে ভেবে দেখিনি। তা এমন চটপট গোটাকতক সুন্দরী মেয়ে কোন্ মার্কেটে মিলবে বলো তো ? গড়িয়াহাট ? না নিউ মার্কেট ? না কি বাগড়ি মার্কেট-ফার্কেটে ?

যাচ্চলে, তুমি যে দেখছি সবটাই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিচ্ছ।

লতিকা অবাক হয়ে বলল, বুঝতে পারলে, অ্যাঁ। তা'হলে তো যত নীরেট ভাবি ততটা নয়।

যে লতিকাকে তার দ্যাওর নিতান্ত নীরেট বলে করুণা করে, সেও রত্নাকরের দাদাকে নীরেট বলে হাসে।

রত্নাকরই হঠাৎ এমন বাড়িছাড়া বা বাড়ির ঊর্ধ্বে 'এমন বুদ্ধিসম্পন্ন' হলো কী করে ?

না কি আসলে তা নয় ?

তারও বুদ্ধিতে ঘাটতি আছে।

না-হলে এমন ছুটকারী প্রেমে পড়ে বসে ?

এ বাড়িতে তিনটে মাত্র প্রাণীর সংসার হলেও খাওয়া-দাওয়া হতে বেশ রাত হয়ে যায়। এই সান্ধ্য চা-পানটা একটু হেভীই হয়ে যায়। সেই সময় কিছুক্ষণ পারিবারিক সুখালাপ, অতঃপর যে যার নিজ নিজ কাজে অনেকটা সময় কাটিয়ে নেয়।

সুধাকর প্রধানতই একপালা ঘুমিয়ে নেয়, লতিকা তার পরবর্তী দিনের গেরস্থালীর কিছুটা সামলে রাখে, কারণ তাকে তো ভোরবেলা 'শ্যামনগর' ছুটতে

হয়। কিছুটা রান্না সেরে ফেলে ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখে, কিছুটার হয়তো কুটনো কুটে রাখে, পুরুষ-দুটি যাতে এতটুকু না অসুবিধেয় পড়ে, তার ব্যবস্থা করে 'কাজের বুড়ীটাকে' পাখিপড়া করে শিখোয় এবং তাবপর নিজের পরবর্তী দিনের সাজসজ্জা, খাতা ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে ফেলে তবে টেবিলে থালা পাতে।

সারাদিন নিজে বাড়ি থাকে না বলে লতিকা একটা ফ্রকপড়া কাজের খুকী রাখা নিরাপদ মনে করে না। 'খুকী'র তরুণী হয়ে উঠতে কতক্ষণ? বিশেষ করে একটু ভাল খাওয়া পরার যোগান পেলে আর বৌদিমনির ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার অগাধ অবসর পেলে।

লতিকা তার কর্মক্ষেত্র 'শ্যামনগর' থেকে একটা বুড়ী সংগ্রহ করে এনে রেখেছে। একরকম নিশ্চিন্দি।

গ্যাসের উনুন জ্বালাতে পারে না? না পারুক। চা বানাতে পারে না? না পারুক। বাজার দোকান করতে পারে না? না পারুক। তবু তো বাড়িটা আগলে পড়ে থাকবে। হঠাৎ কোনোদিন পাড়ার কোনো মস্তানের সঙ্গে প্রেম করে কেটে পড়বে না তো। সুখের থেকে স্বস্তি ভাল বাবা। 'প্রেম' সম্বন্ধে লতিকা খুব সতর্ক।

ওদের কর্তা-গিন্নীর এই কর্মকাণ্ডের অবসরক্ষণে রত্নাকর বেশ খানিকটা সময় পায় পড়ার জন্যে। এই বয়েসের ছেলে অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে পড়ে থাকে? বন্ধুবান্ধব নেই? আড্ডা নেই? এমন প্রশ্ন কেউ কেউ করে বসে না তা নয়, রত্নাকরদের মামাতো বোনের বর কখনো কখনো আসে এ বাড়িতে বেড়াতে। অবশ্যই সস্ত্রীক তা সে এ প্রশ্ন তোলে।

রত্নাকর উত্তর দেয়, বন্ধু বান্ধব? আড্ডা? এসব কাল তো কবে শেষ হয়ে গেছে ব্রাদার! আপনি কী করেন অফিস থেকে এসে?

আমি? সর্বনাশ! আমি তো এক 'বস'-এর রক্তচক্ষু থেকে এসে আর এক 'বস'-এর রক্তচক্ষুর সামনে। তোমার তো এখনো ডানা কাটা পড়েনি।

রত্নাকর হেসে বলেছে, কাটা পড়ার পরই তো ব্যবস্থা বদলাতে হবে। এবং তাতে নিন্দে হবে, সত্যি কিনা? তার থেকে আগে থেকেই লোকের চোখে সইয়ে রাখাই ভাল।

নেহাতই লঘু কথাবার্তা। তবু এর মধ্যে থেকেও তো বোঝা যেতো, 'বিয়েটা' অবধারিত। এটাই ওই রত্নাকরের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিয়ের প্রতিবাদে কোনো কথা বলতে শোনা যায়নি। লঘু পরিহাসের ক্ষেত্রেও না। আজই

প্রথম শোনা গেল। আর সেটাই লতিকার বিচলিত এবং চিন্তিত হওয়ার কারণ।

কথাটা বলে এসে রত্নাকরও কি কিছু কিঞ্চিৎ বিচলিত হলো? তা নাহলে বইটা হাতে নিয়ে চোখ ফেলে ঠিকমতো অর্থগ্রহণ করতে পারছে না কেন? কেন মনে হচ্ছে, আমি যেন দুটো সরল মানুষের ওপর ঠাঁই করে একটা পাথর ছুঁড়ে এলাম।

বই রেখে আলোটা নিভিয়ে দিল। ভাবল, দেখি তো দাদার মত খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারা যায় কিনা! মাঝে-মাঝে তো লতিকাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বৌদি, বালিশে মাথা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নাক ডেকে ওঠা, এই অলৌকিক সাধনার রহস্যটি কী বল তো?

লতিকা বলে, নিজেই যে রহস্যের তল পাই না, তা আর অন্যকে বোঝাবো কী করে বল ভাই।

হ্যাঁ, এইরকম অতি সাধারণ কথাবার্তারই চাষ এ বাড়িতে, কিন্তু আহ্লাদের ঘাটতি ছিল না কোথাও।

তীক্ষ্ণধার রত্নাকরের ধারালো বাকভঙ্গীর আঁচ পেত সহকর্মীরা। এই পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় যেন কী ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। যেন নীরেট দেওয়ালে কোথাকার একটা অজানা জানলা খুলে গিয়ে অগাধ আলো এসে আছড়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে, কোথা থেকে যেন বানের জল ছুটে আসবার সাড়া আসছে।

ঘুম আসবার প্রশ্ন নেই। এলও না।

এখন রত্নাকর নিজের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘেন্না দিয়ে চলেছে—মুখ্যু, বুদ্ধু, বুরবাক। হঠাৎ দুম করে প্রেমে পড়তে গেলি কেন রে শালা?

বন্ধুবান্ধব আড্ডা ইত্যাদি খসে পড়ার পর থেকে বাক্যবিন্যাসে 'শালা'র প্রয়োগ আর বড় নেই। প্রথম প্রথম কাউকে কাউকে বলতো, কী রে শালা, সন্ধ্যে হলেই বৌ নিয়ে হাওয়া, নয় তো বৌয়ের আঁচলতলায় আশ্রয়? একেবারে গোল্লায় গেলি! বলতো, 'হায়া' না কি বলে, সেটা একটুও রাখবি তো। ছিঃ ছিঃ—পকেটে করে ধুনো আনিনি কেন তাই ভাবছি!

তা এসব ধুনো দেওয়া-দিইর কাল গত হয়ে গেছে। বেহায়াদের 'হায়ার' উদ্রেক করাতে পারেনি। কেউ কেউ বা এই জলদি পিতৃত্ব-গর্বে গরবিত হয়ে গিয়ে সারাক্ষণ তার পৃথিবীর পরম আশ্চর্য 'বাচ্চাটির গুণপণার কাহিনী বিবৃত করে, চলে আসার কালে বলে উঠেছে, চলে যাচ্ছিস? একটু চা খাওয়া

হল না। কি জানি মিসেস কোন্ কর্তব্যে ব্যস্ত আছেন। একটু বোস না, দেখি।

না, না। আজ দেদার চা খাওয়া হয়েছে। বলে চলে এসেছে। মনে মনে ঘেন্না দিতে।

এইভাবেই বন্ধুবান্ধবরা খশে গেছে।

অতঃপর বইয়ের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ।

কিন্তু কিছুদিন থেকে তার মধ্যেও আর যেন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না পারছে না মন বসাতে।

নিজেকে নিজে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে 'প্রেমে পড়তে গেলি কেন রে' বলার পরই কেমন অজানতে সেই 'কেন'র উত্তরটা এসে হাজির হচ্ছে।

কেন গেল?

লতিকার মত নীরেট মেয়েও যাকে 'মুখ্যুমির' পর্যায়ে ফেলে, তেমন মুখ্যুমি করতে গেল কেন?

যদিও এই চিরন্তন প্রশ্নের একটা চিরন্তন উত্তরও আছে। জেনে বুঝে 'পড়তে যাচ্ছি' ভেবে কেউ প্রেমে পড়তে যায় না। কোনো এক কৌতুকপ্রিয় অদৃশ্য শক্তি কেমন কলাকৌশলে পড়িয়ে ছাড়ে। প্রথমে টের পাওয়া যায় না 'পড়ছি'। তারপর যার যেমন ভাগ্য।

রত্নাকরের সেই প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ল। খুব বেজার ছিল মনটা শুনেছিল ডিপার্টমেন্ট বদল হয়ে এক মহিলা আসছেন রত্নাকরের ঘরে পাশাপাশি চেয়ারে বসতে।

'মহিলা' মনে করতেই রত্নাকরের মিসেস দত্তর চেহারাটি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কোনো এক সময় যিনি রত্নাকরের ঘরে কাছাকাছি বসে কাজ করেছিলেন।

উঃ, মহিলার সেই সারাক্ষণ ক্যাচোর-ক্যাচোর করে পান খাওয়া আর মিনিটে মিনিটে জর্দার কৌটো খুলে জর্দা খাওয়া অসহ্য। জর্দার গন্ধে ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত। মাথা ধরে যেত রত্নাকরের।

অথচ এখনো অবধি এমন ভাগ্য হল না রত্নাকরের যে অফিসে নিজস্ব একখানা ঘরের মালিক হয়ে স্বাতন্ত্র্য রেখে চলবার সুযোগ পায়।

যদিও রত্নাকরের টেবিলের পাশেই ছোট টুলের ওপর একটা টেলিফোন বসানো আছে, তবু তার মালিকানা-স্বত্বটা রত্নাকরের একার নয়, অংশীদারও আছে।

মিসেস দত্ত সেই রকম একটি অংশীদার ছিলেন। এবং তিনি সেই অধিকারের সদ্ব্যবহারও করতেন। রিসিভারটি তুলে একবার কানে চাপলেন তো হয়ে গেল। ঘণ্টা কাবার হয়ে যাচ্ছে ভ্রুক্ষেপ নেই।

ঘাড়ের কাছে সেই অহেতুক বাক্যলহরী, তার সঙ্গে জর্দার গন্ধ।…সেই স্মৃতিটাই রত্নাকরকে আগে থেকেই বেজার করে তুলেছিল।

আবার 'মহিলা'!

কিন্তু 'মহিলা'র জয়েনের দিন রত্নাকর সবে এসে বসতেই অফিসের ফাজিল কেষ্ট নামে খ্যাত দেবদুলাল দাঁত বার করে এসে বলে উঠল, উঃ মল্লিক!' লাক্ বটে একখানা আপনার। একেবারে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

রত্নাকর এই ফাজিলের কথায় সহজে অবাক হয় না। তবু তখন হল। বলল, মানে?

মানে বুঝতে পারবেন এক্ষুনি। এসেই কর্তার ঘরে ঢুকেছেন দেখা করতে। এলেন বলে। আহা, এমন একখানি সহকর্মিণী পাওয়া, লাক্ নয়?

দয়া করে আপনার দু'পাটি দাঁতের অন্তত: একপাটিও ঢাকবেন ঘোষাল।

দেবদুলাল এতে লজ্জিত হল না। বলল, দাঁতের পাটি তো আর জুতোর পাটি নয় ব্রাদার যে, দুটোকে দুঠাঁই করে রাখা যাবে।

তা হঠাৎ এমন আজেবাজে কথা নিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন? যান না, টেবিলে গিয়ে বসুনগে না!

বসব, বসব। ভাবছিলুম একবার নয় দর্শন করে যাই—

দর্শন হয়নি?

হয়েছে। চকিত চমকে একটিবার। ইস, ওই যে আসছেন।

একবার দেখে যাবার বাসনা প্রকাশ করেও চটপট পাশের দরজা দিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে কেটে পড়ল দেবদুলাল।

আর পরক্ষণেই রত্নাকরের মনে হল, দেবদুলালের মত গোলা লোকটার মুখ দিয়েও যে অমন একখানা কবিতা-ঘেঁষা লাইন বেরিয়ে পড়েছে, সেটা নেহাৎ অহেতুক নয়।

প্রথম দিন অবশ্যই সৌজন্য নমস্কারের বিনিময়। দু'একটি কথা। তারপর কেমন করে যে আলাপের ধারা এগিয়ে চলল!

কিন্তু পম্পা তো স্বল্পভাষিণীই।

নিজেকে ঘিরে যেন অদৃশ্য একটি গাম্ভীর্যের বলয় রচনা করে থাকে, তবু

রত্নাকরের ঔজ্জ্বল্য, রত্নাকরের প্রাবল্য তাকে তার সেই গাম্ভীর্যের বলয় ছিঁড়ে বার করে এনেছে।

সহকর্মী সমাজের চোখ এড়ায় না ব্যাপারটা। কারণ 'চোখ' বড় সর্বনেশে জিনিস। ওরা পম্পার আড়ালে রত্নাকরকে বলে, বড় আপসোস লাগছে মল্লিক! 'মিস' নয়, মিসেস্! সাধে কি আর আমাদের ফাজিলকেষ্ট বলে, 'নলেনগুড়ে বালি!'

পম্পার সৌন্দর্য নিয়ে প্রথম প্রথম যে রসালো আলোচনার ঢেউ বহেছিল, সেটা অবশ্যই কিছুদিন পরে থিতিয়ে গেল, কিন্তু পম্পাকে নিয়ে আলোচনাটা থিতিয়ে গেল না। কারণ পম্পা রায় শুধুই একটি গাম্ভীর্যের আবরণেই মোড়া নয়, একটি দুর্ভেদ্য রহস্যের জালে আবৃত।

এই অতি সাধারণ সাজে সজ্জিত সুন্দরী মেয়েটা সপ্তাহে পাঁচটা দিন অতি সাধারণীদের সঙ্গেই বাসের ভিড় ঠেলে, গলদঘর্ম হয়ে অফিসে আসে যায়। কিন্তু সপ্তাহের বাকি দু'দিন তার আচরণের হদিস মেলে না।

শনিবার দুপুরে ছুটি হবার পরই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়। মস্ত একখানা গাড়ি এসে অফিসের গেটের সামনা-সামনি হলেও রাস্তার ওপারে ফুটপাথের সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়। পম্পা গেট থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হয়ে গাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছোয়। পৌঁছবার আগেই গাড়ির উর্দিপরা চালক গাড়ি থেকে নেমে পড়ে, সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে পাশে দাঁড়ায়, সেলাম করে—পম্পা নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসে। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কৌতূহলের দৃষ্টি 'এক্সরে আই' তুল্য।

আবিষ্কার হয়ে গেছে গাড়ির মধ্যে একটি গিন্নীবান্নী মহিলা না কি মেয়েছেলে বসে থাকে!

আবার সোমবার সকালে অফিস বেলায় সেই গাড়ি, সেই ড্রাইভার এবং সেই 'গিন্নীবান্নী'টি। ঠিক এইভাবেই রাস্তার অপরপারে এসে দাঁড়ায় এবং মিসেস পম্পা রায় এইভাবেই দ্রুত রাস্তা পার হয়ে অফিসের গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েন। বিশেষের মধ্যে এই সোমবার সকালের বেশবাস কিছু-কিঞ্চিৎ জমকালো থাকে। অর্থাৎ শাড়িটা বেশী দামী, ব্লাউজটা অধিক সুন্দর। চুলেও যেন বিশেষ পারিপাট্য।

আসে, কাজের টেবিলে বসে পড়ে।

কারুরই এমন সাহস হয় না যে জিগ্যেস করে ওঠে, আচ্ছা মিসেস রায়,

উইকএণ্ডে আপনি কোথায় যান ?

সরাসরি প্রশ্নোত্তরের সুবিধে না থাকলেই জল্পনা-কল্পনার চাষ চলবে, এটাই স্বাভাবিক। রত্নাকরের অফিসের সহকর্মীরা সেই স্বাভাবিক কাজটাই করে।

ভদ্রমহিলার ব্যাপারটা কী মনে হয় বলুন তো ? এই নিয়মিত উইক-এণ্ডের ব্যাপারটা ?

ব্যাপারটাই ? আমার তো মনে হয়, তলেতলে সিনেমার সুটিং-ফুটিং করে। একটু দাঁড়িয়ে পড়তে পারলেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ড্যাংডেঙিয়ে রুপোলী পর্দায় ঝলসাবে।

হতে পারে। ঝলসাবেই না কেন ? রূপ তো যথেষ্ট। তবে সপ্তাহে ছুটো করে রাত বাইরে। এটা কী ধরনের সুটিং দাদা ?

মুচকি হাসির সঙ্গে জবাব, 'আউটডোর' হতে পারে।

হপ্তায় হপ্তায় আউটডোর ?

আহা, না হয় ইনডোরই হলো।…খ্যাঁকখেঁকে হাসির সঙ্গে জবাব, ডিরেক্টারের ফ্লাটে কি আর বাড়তি এক আধখানা ঘর থাকতে পারে না ?

তাই কী ? দেখে কিন্তু ঠিক সেরকম মনে হয় না।

দেখে, মানে বাইরেটুকু দেখেই আপনি নাড়িনক্ষত্র বুঝে ফেলতে পারেন ?

আমি কিন্তু একটা সোর্স থেকে অন্যরকম শুনছিলাম—

না কি ? না কি ? কী শুনছিলেন শুনি ?

একজন বলছিল মা বাপ ভাইটাই নাকি কলকাতার বাইরে কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, ডেলি প্যাসেঞ্জারী করার সুবিধে হয় না বলে, কলকাতায় কোন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়বাড়ি থাকে, তাই শনিবারটি এলেই চম্পট। ফের সেই সোমবার ভোরে—

কিন্তু 'মিস' তো নয়, মিসেস যে—মিস্টারটি কোথায় ?

কী আশ্চর্য। দেখে কি মনে হয়, মিস্টারটি আছেন ? সিঁথিতে তো সিঁদুর-ফিঁদুর—

ফোঃ। এইটুকু সম্বলে আপনার গোয়েন্দাগিরি। সিঁদুর আজকাল কটা মেয়ে পরে ?

তা যা বলেছ ভাই। আর মিস্টার মরলে বিধবাই বা ক'জন হয় ? খাওয়া-পরা, চাল-চলন কোনোখানেই তো বৈধব্যের ছাপ দেখি না।

তা'হলে বলছেন, বিধবা ?

বলছি !

আমার অবশ্য মাঝেমাঝে মনে হয়, ডিভোর্সি। বিধবাদের চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায়, যতই শাড়িচুড়ি পরুক।

চোখমুখ দেখে আবার কী বোঝেন আপনি ?

বুঝি হে বুঝি। বোঝা যায়। অবশ্য বরটার ওপর যদি ভালবাসা থেকে থাকে। তবে হ্যাঁ, ডিভোর্সি হওয়াও অসম্ভব নয়। বিধবা হলে মা-বাপ বা শ্বশুর-শাশুড়ী কি ওই রজনীগন্ধার গুচ্ছটিকে রাস্তায় একা চরে বেড়াতে দিতো ?

এখনকার মেয়েরাও 'দেওয়াদিইব' ধার ধারে নাকি হে ? সমাজ কোথায় গড়াচ্ছে ভেবে দেখেছ ?

গড়াচ্ছে অধঃপাতের দিকেই। এবং মিসেস রায়েরও 'রক্ষে' হবে বলে মনে হয় না। যা পৃথিবী !

তবে আমাদের রত্নাকরবাবুর সঙ্গে যেন বেশ আঁতাত হয়ে গেছে দেখছি। যদি বিধবা বা ডিভোর্সি হন মহিলা, ইয়ে পটে যেতেও পারে।

খি-খি, হ্যা হ্যা ! দেখব সবই।

এসব কথা অবশ্যই রত্নাকরের আড়ালে।

শুধু যে রত্নাকরের সঙ্গে মিসেস রায়ের আঁতাত দেখা যাচ্ছে বলে তা নয়, রত্নাকর মল্লিককে অফিসের সকলেই কেমন যেন একটু সমীহ-সমীহ করে। 'করে' মানে করতে বাধ্য হয়। লোকটা যেন বেশ একটু নাকউঁচু এবং 'ঠোঁটকাটা'। যা মনে আসবে, রেখে ঢেকে বলবে না। এই ধরনের ছ্যাবলা রসিকতা বা আলোচনা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। অনায়াসে এই আলোচনার নায়কদের হ্যানস্থা করে কথা বলে নস্যাৎ করে দিতে পারে। কথার কী মারকাটারি ভঙ্গী ! সব কথাই বলে কায়দা করে।

অতএব রত্নাকরকে কেউ তেমন পছন্দ করে না। এবং নিজ গোষ্ঠীর বলে মনেও করে না।

সবচেয়ে বড় 'মার', রত্নাকরের চেহারাখানা।

শুনতে তো পাওয়া যায় নেহাৎ সাধারণ গেরস্থবাড়ির ছেলে, চাকরীও তো এই। এমন কিছু আহামরি নয়। তো চেহারাখানা এমন 'আহামরি' গোছের হবার কী দরকার ছিল ?

মুখ তুলে ভিন্ন কথা কইবার জো নেই লোকটার সঙ্গে। জগবন্ধুবাবুর ফেয়ারওয়েলের সময় একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল, অফিসসুদ্ধ সকলের

মাথা ছাড়িয়ে ওর মাথাটা।

এত সব বিরক্তিকর কারণের ওপর আবার মিসেস রায়ের সঙ্গে চোখে চোখে হাসাহাসি।

রাগ করে বলবে না, রতনে রতন চিনেছে!

রত্নাকর যখন কিছুক্ষণ সেই গাড়িটার দিকে আক্রোশের দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতঃপর বাসে উঠে পড়ল, গাড়িটা ততক্ষণে শহর ছাড়ানো রাস্তায় এগিয়ে চলেছে।

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য যেতে হল না।

অফিসপাড়া থেকে উত্তরপাড়া আর কতটুকু?

অনেকখানি কম্পাউণ্ডে ঘেরা বনেদী চেহারার একখানা মস্ত বাড়ি। গাড়িবারান্দার নিচে গাড়িটা ঢুকে আসা মাত্র সদরের সিঁড়িতে দাঁড়ানো বুড়ো একটা লোক কোমর নুইয়ে প্রণামের ভঙ্গী করল। দারোয়ান নয়, পুরাতন ভৃত্য। দারোয়ান আছে একেবারে বাইরের গেটে।

আশেপাশে সামনে-পিছনে অনেকটা করে জমি। একদা যে বাহারি বাগান-টাগান ছিল তা বোঝা যাচ্ছে। আবার এও বোঝা যাচ্ছে, আপাতত সে বাগানে অযত্নের ছাপ। যদিও গাছেদের গোড়ায় গোড়ায় ভিজে মাটি মালীর কর্মনিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে। তবু যেন জৌলুসের অভাব। হঠাৎ এসে পড়লে, দেখলে মনে হবে যেন একটা বিষণ্ণ কাননের মধ্যে ঘুমন্ত এক রাজপুরী। রাজপুরীতে যেখানে যা থাকবার সবই আছে, নেই শুধু প্রাণের সাড়া।

হয়ত এই রূপকথাসুলভ তুলনাটা শুধু পম্পার মধ্যেই উদয় হয়। লোকে ভাবে, যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। কিন্তু পম্পা কী করে বুঝবে? পম্পা যখন দেখেছিল, তখনো তো বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে ডেকরেটারের কারুকার্যের ছাপ, টুনি বাল্‌বের ঝালর। তখন বাড়িটা বুড়ো গালে রুজ মেখে সুন্দরী হবার সাধনা করছে।

এখন অবস্থার বদল ঘটেছে। এখন যেন সবকিছুই ঝিমোচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। এই 'মহামায়া' ভবনের গেটটা দূর থেকে দেখামাত্রই পম্পার নিজেরও যেন ঝিমুনি আসে।

গাড়িটা গাড়িবারান্দার নিচেয় ঢুকে এল। যেমন আসে। পুরানো লোক তারাপদ কোমর নুইয়ে অভিবাদন করল। যেমন করে।

সঙ্গে আসা গিন্নীবান্নী পরিচারিকাটি নিজে নেমে পড়ে হাতটা বাড়িয়ে ধরল

পম্পাকে নামিয়ে নেবার জন্যে। যেমন ধরে। পম্পা সেই বাড়িয়ে ধরা হাতটাকে দেখতে না পাওয়ার ভঙ্গীতে নিজেই নেমে এল। যেমন আসে।

যেন ছকে বাঁধা এক নাটকের সাপ্তাহিক পুনরাভিনয়।

সব নিঃশব্দ। এ বাড়িকে 'ঘুমন্ত পুরী' না বলে কী আর বলবে পম্পা। গেট থেকে অন্দর পর্যন্ত ঢুকে যেতে মানুষের মুখ যে নেহাত কম দেখা যায় তা নয়। যারা আছে, এ সময় হয়ত প্রায় সকলের মুখই দেখা যায়। কারণ এই মহামুহূর্তটির জন্যে সকলেই তো উৎকণ্ঠ—অপেক্ষায় মিনিট গুনছে।

কিন্তু এরা কে? সকলেই প্রায় 'লোকজন' আর আশ্রিতজন। পম্পার সম্পর্কে প্রত্যেকের ভঙ্গীই সসম্ভ্রম সন্ত্রস্ত। যেন ভীষণ মাননীয় এক অতিথির আবির্ভাব ঘটল। অতিথি, তবে প্রত্যাশিত!

সকলেই অভ্যর্থনাসূচক কিছু এক একটা কথা বলে উঠল পম্পাকে দেখে, কিন্তু এত অস্ফুটে যে কী বলল বোঝা গেল না।

এ সমস্তই পরিচিত দৃশ্য। সাবেকি বড়লোকের বাড়ির যেমন গড়ন।

লম্বা হলঘর পার করে তবে ভিতরের ঘরে পা ফেলা যাবে। এই লম্বা হলটা বাদামী ছোপ ধরে আসা মার্বেলে মোড়া। কোণের দিকে দু'একটা ফাট ধরা। আর এই লম্বা জায়গাটার দেওয়াল ধারে ধারে বয়সের ভার বহন করে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো সব আসবাবপত্র। একদার বোলবোলাওয়ের সাক্ষ্য! কবেকার এই বাড়ি? 'মহামায়া' কার নাম? কর্তার ঠাকুমার না?

সুখদার মাকে হাত ধরতে না দিলেও সঙ্গে সঙ্গে যাবেই সে। এটা তার ডিউটি। আর পম্পারও ডিউটি শাড়ির আঁচলটা মাথায় টেনে ধীরে ধীরে তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।

অন্দরের চৌকাঠটা ডিঙিয়েই সুখদার মা থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, আগে গা হাত পা ধোবে, না আগে ওনাদের সঙ্গে দেখা করবে বউমণি?

যেমন বলে থাকে, লাইনটা মুখস্থ। প্রথম প্রথম বলেছিল 'বউরানী'।

পম্পার আপত্তিতে সেটা ছাড়তে হয়েছে। পম্পা বলেছে, 'বউরানী' আবার কী? কোন্ রাজ্যের রানী?

বোকাসোকা মানুষটা বলে ফেলেছিল, এই সমগ্র রাজ্যটারই তো বউরানী। সবই তো তোমার।

পম্পা বলেছিল, না বাপু না। রানী-টানী শুনতে অস্বস্তি লাগে। বউদিদি বলাই তো বেশ ভাল। আর পম্পা বোধ হয় হঠাৎ অসতর্কে একটা স্বগতোক্তি

করে বসেছিল, 'রাজা কোথায় তার ঠিক নেই, রানী।'

আস্তেই বলেছিল, তবু বোধ হয় সুখদার মা'র কান এড়ায়নি। তাই এক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর আস্তে বলেছিল, খোকাকে কোলেপিঠে ক মানুষ করেছিলুম, কদাচ তো দাদাবাবু বলিনি! বউদিদি আর কী বলব—বউমা বলব! না করোনি।

এরপর আর 'না' করে পম্পা কোন্ মুখে?

সুখদার মা দ্বিতীয় মুখস্থ লাইনটা বলল, একবার নয় ঝাঁকি-দর্শনটা দিয়ে এস হা পিত্যেশ করে বসে আছে বুড়োবুড়ী।

অতএব মাথার আঁচলটা আর একটু টানা। পায়ের ভার আর একটু ল করে আরো শব্দহীন পদক্ষেপ।

বেশিক্ষণ যেতে হল না। সিঁড়ি উঠতেও হল না। দোতলার ঘরট সবই এখন তালাবন্ধ হয়ে আছে। ভাগ্য-বিড়ম্বিত দুই বুড়োবুড়ীর এখন এক তলাতেই স্থিতি।

কিন্তু সত্যিই কি ওঁরা খুবই বুড়োবুড়ী? পঞ্জিকা, ক্যালেণ্ডার, জন্মপত্রিকা— এরা তো সেকথা বলে না। তবু বসে আছেন দুটি নিতান্তই অক্ষম বুড়োবুড়ী।

বয়েসটাকে চড়চড়িয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছে দেবার একা কলকাঠি আছে 'একজনে'র হাতে। তিনি ইচ্ছেমত সেই কলকাঠিটি নেড়েচে কৌতুকে বিভোর হন। অনেকরকম কর্মচারী আছে সেই 'একজন'টির তারাই কাজ এগিয়ে দেয়। যেমন দিয়েছিল এদের সেই লাগামছাড়া উল্লা উল্লসিত উৎসব রজনীর পরের দিন।

যারা সেদিন এদের দেখেছিল, তারা এখন দেখে ভাবে, সত্যিই কি এরা তাঁরা কালো চশমা পরা হুইল চেয়ারে বসে থাকা এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকই কি সেদিনে সেই প্রভাতসূর্য রায়? আর কপালে রেখা পড়ে যাওয়া, ঝুলে পড়া ভঙ্গ মহিলাটিই একদার পূর্ণিমা রায়? নামের সঙ্গে যার চেহারার ছিল আশ্চ সামঞ্জস্য!

বিশেষ করে সেই দিনটির কথাই বলতে হয়—সেদিন বেশেবাসে, চলনেবলনে, কর্মতৎপরতায়, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় আর হাস্য-পরিহাসে ঝকঝকে উচ্ছল, বেশ কিছুদিন চল্লিশ পার করে আসা যে রমণী প্রায় পূর্ণ যুবতীর মতই ঝলসে বেড়াচ্ছিল, এ কী সে? নাকি তার কঙ্কাল? তার প্রেতচ্ছায়া?

সেদিন ওই বিরাট কমপাউণ্ডে এহদ্দ ওহদ্দ প্যাণ্ডেল করা হয়েছিল।

মানুষজন আসছে-যাচ্ছে, খাচ্ছে, দেখা করছে, সবকিছুই সুশৃঙ্খল। আলাদা ালাদা বিভাগ করে, আলাদা তোরণ করে।

পূর্ণিমা রায়কে দেখা যাচ্ছে সমস্ত তোরণে তোরণে। সব বিভাগে বিভাগে। াার তার সঙ্গে কথার ফুলঝুরি ছাভিয়ে ছড়িয়ে।—কী ব্যাপার? না খেয়ে পালিয়ে াচ্ছেন যে? তাড়া আছে! রাখুন তো আপনাব তাড়া। দেখি কেমন যান! ামায় চেনেন না?

এই যে এতক্ষণে আসা হল গিন্নীর! সারাদিন কী এত কাজ তোর? এই াখ, এই সাদা বেনারসীখানা বউবরণ করতে কর্তার কাছে বাগিয়েছি, ঝলি? বোকা ভদ্দরলোকটিকে বুঝিয়েছি, এখন শাশুড়ী হচ্ছি, বঙচঙে পরব াকি? এখন ভাল ভাল সাদা রঙের শাড়িটাড়ি দরকাব।

আবার হেসে উঠে বলে ওঠা, ওই বলে তো বাগালাম, তা বলে কি এখুনি ঙিনগুলোকে বাতিল করে দেব নাকি? ইস! এত বোকা নই বাবা! বউ সে ভাববে, একটা বুড়িসুড়ী শাশুডী! ওর মধ্যে নেই আমি। একবার াডলেই ছাড়া।…তোদের জামাইবাবু বলে কিনা, যা দেখছি, বউ এলেই তার ঙ্গে সখী পাতিয়ে ফেলে তুমি এরপর উড়ে বেড়াবে! দেখি তো শহরের হাটে-াজারে।… আমিও বলেছি, বেড়াবই তো। চিরদিন তোমাদের এই বনেদী-াড়ির খাঁচায় বন্দী হয়ে বসে ছোলা খাচ্ছি আর 'হরেকেষ্ট' বলছি। এবার ছবল পাব। পাসটাস করা আপিসে চাকরি করা বউ।

কিন্তু এই সাবেকি বাড়িতে অফিসে চাকরি করা বউ ঢুকতে আসছে যে? টা তো খাপ খাচ্ছে না।…

সে অনেক কথা!

ভাব-ভালবাসার ব্যাপার?

না, না। পাগল! এ বাড়ির ছেলে অমন বেসামাল হতে যাবে?

তবে? ওই তো, সে অনেক কথা। তা সেসব কথা এখন থাক।

এখন দেখা যাচ্ছে, পম্পা নামের অফিসে চাকরি করা মেয়েটা সেকেলেবউদের ঢ মাথায় আঁচল দিয়ে ধীরপায়ে ঘরে ঢুকে এসে নম্রভাবে প্রণাম করল অকাল-র্ধক্যের ভারে ভারাক্রান্ত মানুষ দুটোকে।

অকালেই হোক আর যে কারণেই হোক, বার্ধক্য যখন এসেই গেছে, সে র কাজ করবেই। বুড়োবুড়ীর মতই সেন্টিমেন্টাল করে দিয়েছে। কথা াতে গলা কাঁপে, হাত ধরতে হাত কাঁপে।

কালো চশমায় চোখ ঢাকা প্রভাতসূর্যর গলা থরথরিয়েই উঠল। শূন্যে হাতটা বাড়িয়ে কাঁপা গলায় বললেন, এসেছ মা? সকাল থেকে হাঁ করে—কথা শেষ করতে পারলেন না।

শূন্যে হাত বাড়ানো দেখেই বোঝা যাচ্ছে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। আর 'হুইল চেয়ার' বলে দিচ্ছে, চলৎশক্তিও হারিয়েছেন।

পম্পা সেই বাড়ানো হাতটার ওপর নিজের হাতটা আলতো করে একটু বুলিয়ে সেইভাবেই বলল, স্নানটান করে আসি, কেমন? সারাদিনের বাইরের ধুলো।

প্রভাতসূর্য হতাশ গলায় বললেন, কেন যে এখনো তুমি এই তুচ্ছ একটা চাকরি নিয়ে পড়ে আছ মা! লক্ষ্মী হয়ে ভিক্ষে মাগা!

চাকরি নিয়ে আক্ষেপটা নিত্যদিনের। পম্পার তাতে ভূমিকা নীরব শ্রোতার। কিন্তু আজ হঠাৎ নতুন এই আপ্তবাক্যটি সংযোজিত হওয়ায় পম্পার মুখে ফুটে উঠল একটু যেন ব্যঙ্গহাসির রেখা। আর নীরব শ্রোতার ভূমিকাটা ভুলে গিয়ে বলে ফেলল, 'লক্ষ্মী'? বলুন যে, 'অপয়া অলক্ষ্মী'!

ছি ছি, ওকথা বলো না মা। পুণিমা প্রায় কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমাদের অদৃষ্ট! তোমার দোষ কী? সর্বসুলক্ষণা মেয়ে তুমি, কুষ্ঠিতে 'রাজরানী যোগ'। তা সে কুষ্ঠি তো ফললও। আমাদেরই পূর্বজন্মের পাপ—চোখ মুছতে লাগলেন

পম্পা ভাবল বলতেই হবে এঁরা বিশেষ উদার। অন্য যাবতীয় ব্যাপারে তো যথেষ্ট সেকেলে মনোভঙ্গী। 'ভাগ্য', 'পূর্বজন্ম', 'ঠিকুজি-কোষ্ঠী' ইত্যাদি এখনো তো সংস্কারের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে আছে। তথাপি বউকে অপয়া অলক্ষ্মী না বলে নিজেদের ভাগ্যকে দোষী করছেন। এর থেকে উদারতা আর কী হতে পারে? কিন্তু···কিন্তু এতটা উদার তো না হলেও পারতেন। পম্পার পক্ষে এটা অসুবিধা বই সুবিধে নয়। ভাল রকম অসুবিধেই!

তা এসব তো মনের মধ্যেকার কথা। মুখে আস্তে বলল, নিজেকে তো আমি তাই ভাবি।

না না, কখনো তুমি এসব ভাবতে বসবে না মা। তুমি আমার লক্ষ্মী। আমাদের এই শ্মশানপুরীতে প্রাণ। যাও মা, চানটান করে এসে চা-জলখাবার খাও। সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে! ওগো, তুমি যাও না, একটু দেখগে না গিয়ে, কী দিচ্ছে-টিচ্ছে!

'ওগো'টি অবশ্য এসব দেখতেটেখতে অপারগ নয়। যা কিছু ভাঙন চেহারায়

অন্ধ হয়ে যাওয়া স্বামীর খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় তদারকি তো তিনিই করে থাকেন। খাইয়েও দিতেন, তবে ক্রমশ প্রভাতসূর্য বলতে শুরু করছিলেন, হাতে করে মেখেটেখে না তুললে খাওয়ার কোন স্বাদ পাওয়া যায় না

অতএব সেই থেকে হাতে বাড় মেখেটেখে খাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তবে পূর্ণিমা সেই হাতের কাছাকাছি থাকেন, এগিয়ে দেন, কোনটা কি চিনিয়ে দেন, মাছের কাঁটা বেছে দেন। যদিও এই কাঁটা-ফাটার ভয়ে প্রভাতসূর্য নিষ্কণ্টক জিনিস মাংসটাকেই বেশি পছন্দ করেন। সেটাই প্রায় নিত্য খাদ্য। তা আগেও তো তাই ছিল। উপরন্তু 'কণ্টক যুক্তরা'। উনি এই হাতে করে মেখেটেখে খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা অবধি পম্পা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত। নচেৎ রবিবারে রবিবারে 'খাইয়ে দেওয়াটা' তো ছিল পম্পারই ডিউটি।

পূর্ণিমা বলতেন, আজ আমার ছুটি। আজ তুমি মা'র হাতে খাও।

পম্পা কাঁটা হয়ে যেত। সত্যি বলতে, শনিবার সন্ধ্যায় এই এসে পৌঁছনোর পর থেকেই তার ভাবনা শুরু হত পরবর্তী দিনের 'ডিউটি' স্মরণ করে। যদিও এতে নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে, নিজেকে ছোট মনে ভেবেছে। একজন অন্ধ অসহায় মানুষের সেবা, এ তো মানুষের ধর্ম। বিশেষ করে মেয়েদের।

কিন্তু মন কী যুক্তি মানে? অতএব পরবর্তী ব্যবস্থায় সেই মনটা কৃতজ্ঞ।

এবাড়িতে টেবিলে খাওয়ার চল ছিল। তবে সেটা পুরুষদের ক্ষেত্র। টেবিলে খেতে বসতেন টগবগে তাজা রীতিমত ভোজনবিলাসী গৃহকর্তা, এবং তাঁর পুত্র। একমাত্র পুত্র। সে কিন্তু ছিল অল্পাহারী। এ নিয়ে প্রতিদিন বাপের অসন্তোষ ছিল।

মহিলাদের মাটিতে আসন পেতে ব্যবস্থা। ভিতরের খাবার ঘরে, দু-একজন আশ্রিতা মহিলা, যাঁরা সম্পর্কসূত্রে মান্যের, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসতেন পূর্ণিমা। এখনো তাই বসেন, শুধু নতুন সংযোজন, সপ্তাহে দেড়দিন পম্পা।

আগে তো—মানে পম্পা এ বাড়িতে আসার আগে, কর্তা বলেছিলেন, বউমাকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসাব, তা এখন থেকেই বলে রাখছি তখন যেন বাধা দিতে এসো না।

শুনে পূর্ণিমা একটু রেগেই গিয়েছিলেন। আমার আবার কিসের বাধা? তোমাদেরই বাড়ির প্যাটার্ন। সেই প্যাটার্নে চলে আসছি। সব কিছু পছন্দ করবেন কিনা ভেবে ভয়ে কাঁটা। তিনি মরে গেছেন, স্বর্গে গেছেন, তবু সেই প্যাটার্নই মেনে আসছি।

দীপ্তসূর্য হেসে ফেলে বলেছিল, আচ্ছা বাবা, যখন এক কথা বললে একশো কথা শুনতে হয়, তখন সেই একটা কথাই বা বলতে যাও কেন ? যা করব ভাববে তা করবে, আগেভাগে মাকে বলতে বসার কী দরকার বুঝি না।

কর্তা আর গিন্নীর মধ্যে চোখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলেছে। সে বিদ্যুতের অর্থ, 'কী দরকার' তা ভবিষ্যতে বুঝবে যাদু !

তা সেসব আর বুঝতে হল না তাকে। আর গৃহকর্তার ঘোষণাও কাজে লাগল না। সেই বউমাও পূর্ণিমা কোম্পানীর সঙ্গী। তবে পুরোপুরি নয়। পংক্তি ভোজনে বসতে হয় তাকে শ্বশুরের মাসি আর শাশুড়ীর পিসতুতো দিদির সঙ্গে। কারণ পম্পা তো তাঁদের হেঁসেলেরই শরিক।

পম্পার থালা ঘিরে অবশ্য বাড়তি অনেক বাটি পড়ে। রেকাবে মিষ্টির সম্ভার। যেগুলো খাওয়া পম্পার পক্ষে অসাধ্য বলে সরিয়ে রেখে তবে খেতে বসতে হয় পম্পাকে। অবিরতই তাদের অনুরোধ-উপরোধের ধাক্কা সামলে সামলে কোনমতে উদ্ধার হওয়া।

শ্বশুরের মাসি বলেন, উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে নাতবউমা, আর তুমি একটু দই পায়েস খেতে পারছ না ?

তাঁর এই কষ্টকল্পিত স্থূল রসিকতায় পাত ছেড়ে উঠে চলে যেতে ইচ্ছে করে পম্পার। কিন্তু সৌজন্য বলে কথা ! ভাবে, আহা ওই অবান্তর কতকগুলো বাটি রেকাবির বস্তুসম্ভার যদি ওনাদের পাতে ধরে দেওয়া যেত, কী খুশিই হতেন ওঁরা।

তবে শনিবার রাত্রির ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সহনীয়। ওই 'মাসি' আর 'দিদি'দের রাত্রে আর পম্পার সঙ্গে পংক্তিভোজনে দেখতে পায় না পম্পা। কিন্তু পম্পাই বা রাত্রে কী খাবে ? কত খাবে ? এই এখন 'আহা কোন্‌কালে বেরিয়েছে' বলে চায়ের সঙ্গে 'টায়ে'র ব্যাপারটা তো কম হয় না।

যাই হোক, রাত্রিটা তাড়াতাড়ি এসে যায় এই ভগবানের দয়া। রাত আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার রসদ সঞ্চয় করে দেয় ওরা।

সপ্তাহে দুটো রাতের জন্যে দোতলার সব থেকে সাজানো-গোছানো, সব থেকে ভাল ঘরখানার তালা খোলা হয়। যে ঘরের মধ্যে থেকে পিছনে চওড়া একখানা মার্বেলমোড়া বারান্দা, অন্দরমহলের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। পিছনের যে অংশে আম-কাঁঠাল-সুপুরি গাছেদের অবস্থান, আর তার পিছনে গোয়াল, সেই দিকটাই এই বারান্দা থেকে দৃশ্যমান।

রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই বারান্দাটায় দাঁড়ালে মনে হয় যেন কোন গণ্ডগ্রামের ছবি দেখছি। তবে নিরাপত্তার অভাব নেই। পুরো বারান্দাটা গ্রীল এবং কাঁচ দিয়ে মোড়া। মুখ-মাথাটা যদি খোলা আকাশের দিকে বাড়াতে চাও, তার জন্যে অবশ্য জানলা বসানো আছে। সেই সব জানলায় আবার ভিতর থেকে চাবির ব্যবস্থা। তা সে চাবি ঘরের অধিকারীর কাছেই থাকে। এক কথায় ভিতর-বার দুদিকেই পারফেক্ট নিরাপদ ব্যবস্থা।

এ ঘর 'দীপ্তসূর্য' নামের সেই হতভাগ্য ছেলেটার। যার বৃহৎ ছবিটা ফুলের মালা গলায় দিয়ে দরজার মুখোমুখি উঁচু দেওয়ালে ঝুলছে। সপ্তাহে সপ্তাহে নতুন মালা বদলানো হয়। রাত্রে এই ঘরেই শুতে আসে পম্পা। সেই হতভাগ্য যুবকের উত্তরাধিকারিণী।

চাবির গোছা হাতে নিয়ে সুখদার মা আসে সঙ্গে। দরজাটা খুলে দেয়। এ ঘর তার হেফাজতে। বরাবরই ছিল, এখনো আছে। প্রতিদিন নিখুঁত করে ঝাড়ামোছা তার ডিউটি। আর প্রতি রাত্রে দরজাটা খুলে দেওয়ার সময় আবার একটি মুখস্থ লাইন বলাও তার ডিউটি।

'ঘরের মেঝেয় এক কোণায় আমি পড়ে থাকি না বউমণি। এই বিরোদ ঘরের মধ্যে একা ছেলেমানুষ!'

পম্পা তার মুখস্থ লাইনটাই আওড়ায়, না না, আমি তো বেশ থাকি। দরজা-টরজা তো বন্ধ থাকে।

মা-বাবু দু'জনাই খুঁতখুঁত করে। বলে, তুই ভাল করে বুঝিয়ে বলে-কয়ে বউমার ঘরের মেঝেয় একপাশে পড়ে থাকগে যা। ভয়-টয় পাবে।

ওঁদের বাতিক। এত বড় মেয়ে আবার ভয় পাব কী! তুমি তো পাশের ঘরেই থাক।

ঘরে আবার থাকতে গিছি। ওই তোমার বন্ধ দুয়োর-গোড়াতেই পড়ে থাকি।

কী মুশকিল। আচ্ছা কেন? এত ঘরটর খালি পড়ে আছে—

তা এও তো ঘরই বউমণি! বনিদীবাড়ির এই দরদালানটাই তো পাঁচখানা ঘরের তুল্য। জানলা-দরজা বসানো! আগে আগে কাজেকম্মে এই দালান জুড়েই মানুষজন শুয়েছে।

পম্পা কোনদিন প্রশ্ন করেছিল, এত কী কাজকর্ম মাসি?

মাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, ওমা! ঠাকুমা থাকতে বারো মাসে তের

পার্বণ ছিল না? তা'পর গে নিত্য তেনার গুরু আসা, গুরুভাই-ভগ্নীদিগের র‍্যালা। খোকার পৈতেয় কী ঘটা। বাড়ি সর্বদাই রমরম করতো। বারো মাস 'এসোজন বসোজন'। খোকার জন্মতিথিতে-তিথিতেও ঘটা কম হত না। ভালদিনে জন্ম। জগন্নাথের চানযাত্রার দিনকে। ঠাকুমা গত হবার পর অবিশ্যি তেমন রমরম আর থাকলনি। ওনার বাপেরবাড়ির দিকের কতজনা আসতো যেত থাকত, তারা আর তেমন রইলনি। তা মা-বাবুর ব্যাভার কিছু খারাপ ছিল না। তারাই বোধ হয় ভাবল, আর কোন সুবাদে আসি। তা আবারও তো জমজমাটি হবার কথা! ভগবান যে এমন করবে—

ধরলে কথা থামায় কে! ভগবানের দুর্ব্যবহারজনিত আক্ষেপ চলতেই থাকে।

ওঃ, কেন মরতে যে কোনো প্রসঙ্গ তুলে বসি! ভাবে পম্পা।

সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠে আসে পম্পা সুখদার মায়ের সঙ্গে, পিছন পিছন আরও একজন উঠে আসে। সে হচ্ছে সেই বুড়ো লোকটি। গাড়িবারান্দায় ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই যে নুইয়ে নমস্কার করে। এই লোকটিই শূন্য দোতলার রাতের পাহারাদার।

বুড়োকর্তার আমলের লোক এই বুড়ো। পূর্ণিমাকে বলে 'বউমা'।

আচার-আচরণে আগেকার আমলের সহবত শিক্ষার ছাপ। পিছু পিছু উঠে আসে বটে, কিন্তু সিঁড়িতে বেশ কয়েক ধাপ দূরত্ব বজায় রেখে। আর যে ভৃত্যবর্গ আছে (থাকতেই হবে। এত বড় বাড়িটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়তো।), তাদের মত কদাচ গেঞ্জি-পায়জামা পরে বেড়ায় না। ফর্সা ধুতি আর মেরজাই।

লোকটার একটা নিজস্ব নাম আছে অবশ্যই। কিন্তু পম্পা ওকে মনে মনে বলে রহমন। পম্পার মনে হয় এই নামটাই যেন ওকে ঠিক মানায়। ওই ঋজুদেহী শীর্ণ স্বল্পবাক বৃদ্ধ যেন কোনো গল্পের পাতা থেকে উঠে এসেছে। তবে 'রহমন' হবার কথা নয়।

এতদিনের মধ্যে পম্পা লোকটার গলার স্বর কেমন তা জানে না। দেখলে শ্রদ্ধা আসে। কিন্তু এই লোক এই মস্ত দোতলাটার রাতের পাহারাদার? একটু হাসি পায় পম্পার। গায়ে একটা টোকা মারলেই তো পড়ে যাবে। আবার ভাবে, বোধ হয় বিশ্বস্ততাই ওর যোগ্যতা। আর আত্মবিশ্বাসই ওর শক্তি।

তিন-তিনটে লোক উঠে আসে, তবু দালানে পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রভাতসূর্যর আক্ষেপের কথাটা মনে পড়ে যায়—'শ্মশানপুরী'!

খুব মিথ্যে নয়। দালানের ধারে ধারে সারিবন্দী তালাবন্ধ দরজা যেন ওই কথাটাই ঝালিয়ে দেয়।

আশ্চর্য। এত বড় বাড়ি বানায় কেন লোক? পম্পা ভেবে পায় না। পরিবার-পরিজনের পরিধিটা তাদের কত বিশাল থাকে? প্রভাতসূর্যর ঠাকুর্দ জয়সূর্য নাকি এই বাড়িটা বানিয়েছিলেন অকালমৃতা স্ত্রীর নামে। তবে? তাঁর তো নাকি মাত্র একটিই ছেলে ছিল—উদয়সূর্য। প্রভাতসূর্যর বাবা। অথচ বাড়ি বানিয়ে রেখেছেন এই বিরাট।

ভগবান জানেন, কারা থাকত ওই সব ঘরে ঘরে। আর ওই তালাবন্ধর ওপারে এখন আছেটা কী? কী আর! যত সব পুরনো পুরনো মজবুত কাঠের আসবাবপত্র, দাগ-ধরে-যাওয়া বড় বড় আয়না, চওড়া চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো কিছু ছবি। বোধ হয় বিলিতি আর্টিস্টদের আঁকা বিখ্যাত সব ছবির প্রিন্ট। সিঁড়ির দেওয়াল জুড়ে তো ওই ধরনেরই নমুনা।

আবার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, না, না। ওই সব ঘর হয়ত এই ঘরটার মতই সাজানো-গোছানো। ওঁরা তো আগে এই দোতলাতেই থাকতেন। যাঁরা এখন নিচের তলায় পড়ে আছেন রোগব্যাধির উপযুক্ত আসবাব আয়োজন নিয়ে। বাড়ির কর্তাগিন্নী!

তার মানে দোতলায় ওঁদের সাজানো ঘর সাজানো থাকতে-থাকতেই জীর্ণ হতে থাকবে। যেমন ওঁরা জীর্ণ হতে থাকবেন, এই হুইল চেয়ার, রিভলভিং খাট আর অন্য অনেক কিছু এটা-সেটা নিয়ে।

ওঃ! আমায় বলে কিনা 'তুমিই এ সংসারের সব। এই রাজ্যপাট সব তোমার।'

রক্ষে করো বাবা! এই অক্টোপাসের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলে বাঁচি। সেই বাঁচার স্বপ্নটাই দেখতে থাকে পম্পা দিনে-রাতে। এ-বাড়ির বাগানের ওই সব ফুলগুলো ছাড়া আর কোনো দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছেই করে না পম্পার। নড়তে-চড়তে যা কিছু চোখে পড়ে, দেখলে কেমন একটা বীতশ্রদ্ধ ভাব আসে।

এত জিনিস কেন করে মানুষ? টাকা থাকলেই বংশপুরুষের বোঝা বাড়িয়ে চলতে হবে? মানে হয় কিছু? এইসব বৃহৎ বৃহৎ আসবাবপত্র, রাশি রাশি বাসন বিছানা ড্রাম বারকোষ বঁটি কাটারি—কী আছে কী নেই! ডাঁই করে জমানো আছে সিঁড়ির ঘরে, দালানের গলিতে, ভাঁড়ারঘরের উঁচু উঁচু তাকে সবই বৃহৎ বৃহৎ।

পুরনো পুরনো এই অর্থহীন বস্তুর বোঝার দিকে চোখ পড়লেই পম্পার পক্ষে গা কেমন করে ওঠাই স্বাভাবিক। পম্পা মানুষ হয়েছে অভাবের মধ্যে অনটনের মধ্যে।

শোবারঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে, আর ভিতরে ঢুকে আলোটা জেলে দিয়ে সুখদার মা নিত্যনিয়মেই বলল, তাহলে ঘরের বাইরেই শোব বলছ?

পম্পা মনে মনে হাসল। ভাবল, টেপরেকর্ডার একখানি। মুখেও হাসল, বলছি।

মেঝের একধারে পড়ে থাকতুম!

তোমায় তো বলেইছি বাপু, একা শুতেই আমার সুবিধে হয়।

তা ভাল। ঘুমের আলোটি জেলে রেখো।

আচ্ছা।

তবে দুয়োরটা দাও। ওপর নিচ ছিটকিনি দুটো লাগিয়ে নাও। পেটের খিলটা তুলে দাও।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, বারোণ্ডার দুয়োর খুলবে নাকি বউমণি?

একটু খুলি। রাতে ওদিকটা দেখতে বেশ ভাল লাগে।

সুখদার মা ঘেন্না-দেওয়ার গলায় বলে ওঠে, ও আমার পোড়াকপাল! ওদিকে আবার ভাল লাগার কী আছে? গুচ্ছির গাছের ঝুপড়ি! অন্ধকার।

পম্পা অবশ্য ঘেন্না পেল না। বলল, তা হোক, আমার খুব সুন্দর লাগে।

সুখদার মাও মনে মনে কথা কয়। বলে, যেমন কপাল তেমনি শখ। অন্ধকার সোন্দর লাগে! একা শুতেই ভাল লাগে! আহা, কী জিনিসই খুইয়ে বসে আছ তা যদি বুঝতে! মুখে বলল, তো জানলা-মানলা খুলোনি বাপু। কে কমনে নজর রাখে। মাথার ওপর ছাতা নাই।

পম্পা আর কথা বাড়াল না। বলল, ঠিক আছে, খুলব না।

তাই ভাল। কাঁচের মধ্যে দিয়ে তো সবই ত্যাখা যায়।

পম্পা চেষ্টা করে একটা হাই তোলে।

সুখদার মা তাড়াতাড়ি বলে, শুয়ে পড মা। সারাদিনের রপটানির শরীর। তবে এও রহস্য, তোমার কেন চাকরি করে মরা। সব্বাই আমরা ভেবে কূল পাই না।

পম্পা একটু হেসে বলে, আচ্ছা আরো ভাবোগে, যদি কূল পাও! দরজাটা বন্ধ করার ভঙ্গি করে। না করলে তো নড়বে না বুড়ী।

বেশ সঙ্গিনীটি জুটেছে আমার। একটু যেন কৌতুকের হাসি হাসল পম্পা ভাবল, বড়ই বিরক্তিকর, তবু ওর মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা আছে বলেই সহ্য হয়ে যায়। ওর খোকার ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখে আর আঁচলে নাক মোছে।

দরজাটা বন্ধ করেই আলোটা নিবিয়ে দিল পম্পা। নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। এই ভাল—এই ভাল। আলো জ্বালা থাকলেই তো ওই উঁচু দেওয়ালে ঝুলে থাকা ছবিখানা দেখতে পাওয়া যাবে। বড় অস্বস্তিকর। কিন্তু শুধু অন্ধকারই কি সব সমস্যা দূর করতে পারে? টাটকা মালার ঘন গভীর গন্ধটা ঘরের বাতাসে নিথর হয়ে ছিল না? আর এখন জানলাগুলো খোলার সঙ্গে-সঙ্গেই বাতাসে আলোড়িত হয়ে সেই সুগন্ধ ভার পম্পার ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল না?

মস্ত জোড়াখাটে বিলাসবহুল শয্যা। বড়লোকের একমাত্র পুত্রের বিয়ের সময় যেরকম বিছানা তৈরি করানো হয়, তেমনিই করানো হয়েছিল। সেটাই বজায় রেখে আসা হচ্ছে।

পম্পার ওপর আদেশ, এই খাটবিছানায় শুতে হবে। প্রথম দিনে পূর্ণিমাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন পম্পাকে হাঁপাতে হাঁপাতে। বলেছিলেন, তুমিই একটু ভোগ করো না, তাতেও আমাদের প্রাণের তৃপ্তি। সবই তো তোমার উপলক্ষেই করানো।

কিন্তু পম্পার পক্ষে কি সম্ভব, একা ওই বৃহৎ রাজশয্যায় শোওয়া?

পম্পা অন্ধকারেই বারান্দার দিকের দরজাটা খুলল। কাঁচে ঘেরা সেই খানিকটা অন্ধকারের রাজ্যে পা ফেলে ওর প্রথম মনে হল, ভাগ্যিস এই দিকটা ছিল।

গভীর অন্ধকারের মধ্যে সুপুরি গাছগুলোর হাওয়ায় আন্দোলন বোঝা যাচ্ছে তার পিছনে একটা চালাঘর থেকে মৃদু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। গোয়ালের কাছে গোয়ালা-দম্পতির সংসার। এঁদের বদান্যতাতেই ওদের এই সুখের বাসা। দেখা করতে এসেছিল সেই বুড়ী। জনে জনে কতজনই যে দেখা করতে অথবা দেখতে আসে পম্পাকে।

বড় যন্ত্রণাদায়ক এই দর্শন দেওয়াটা। সবাই তো একবার করে আক্ষেপ বাক্য আর হতাশ নিঃশ্বাস খরচ করে যাবেন।

অনেকক্ষণ ওই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে ঘরে চলে এল

পম্পা। দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বিছানা থেকে একটা বালিশ টেনে নিয়ে দেয়ালধারে পাতা বড় সোফাটায় শুয়ে পড়ল। আর নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, আবার কালকের রাতটাও এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কাটাতে হবে।

কিন্তু ঘুম আসা কি এতই সহজ? দৃশ্য! সেই এক দৃশ্য—দৃশ্যটা তার চির অভ্যস্ত সেই ছোট্ট ঘরের অতি সাধারণ শয্যার ধারে এসে দৈবাৎ দাঁড়ায়। সেই দৃশ্যটা যেন এখানে ওত পেতে বসে থাকে তন্দ্রা আর ঘুম, ঘুম আর জাগরণের মধ্যে।

একটা সুন্দর বড় গাড়ির মধ্যে এক বয়স্ক দম্পতির সঙ্গে একটি সদ্যবিবাহিত নতুন বরকনে। কনের পরনে প্রায় আগাগোড়া সোনার সুতোয় গাঁথা ঝকঝকে বেনারসী শাড়ি, বরের পরনে সাদা বেনারসীর জোড়। মহিলাটির পরনেও সাদা বেনারসী, হাতে পুজোর প্রসাদী ডালা। কপালের মস্ত সিঁদুরের টিপটি ঘামে আর তেলে কপাল-মাখামাখি। মুখে আনন্দবিহ্বল প্রসন্নতার হাসি।

বয়স্ক পুরুষটি বয়স্ক হলেও, ভঙ্গীতে বয়েসের ছাপ নেই। হেসে হেসে বলছেন, বউমাকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

মহিলাটি হেসে বললেন, বোঝাবার সময় পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? তারপর বললেন, আমার শ্বশুরবাড়ির এই নিয়ম বৌমা, নতুন বউকে আগে মা উত্তর-বাহিনীর মন্দিরের চাতালে দুধে-আলতার পাথরে দাঁড় করিয়ে বরণ করে নিয়ে তবে বাড়ি গিয়ে বরণ। হেসে বললেন, তোমার শ্বশুরবাড়িরও। ওই যে বুড়ো পুরুতমশাই, উনি আমার বিয়েতেও—

কথার মাঝখানে হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দের সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। কী ভীষণ শব্দ!

বাজ পড়ল? নাকি আকাশটা মাথায় ভেঙে পড়ল?

এই শব্দ আর এই দৃশ্য। যেন পম্পাকে তাড়া করে এই ঘরটাতেই এসে হাজির হয়। পম্পা ধড়মড় করে উঠে বসে। আবার শুয়ে পড়ে।

পম্পা রায় আর পূর্ণিমা রায়—দুই বয়েসের দুই রমণী আজ পর্যন্ত ভেবে কূল পায়নি সেই দৈত্যের মত লরিটা হিংস্র আক্রোশে ছুটে আসতে-আসতেও কী করে এমন নিখুঁত অপারেশনটা করে ফেলতে পারল?

আলাদা হয়ে গেল চারখানা মানুষ।

দুই রমণী ছিটকে গাড়ি থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে শুধু ঘণ্টাকয়েকের জন্যে জ্ঞান হারাল মাত্র, তার বেশি কিছু না। ভিড়ের মধ্যে তাদের গায়ের গহনার

বোঝার ভার কী ভাবে যেন হালকা হয়ে গেল—সেটা কোনো ব্যাপার নয়।

কিন্তু পুরুষ দুজন? চুরমার হয়ে যাওয়া গাড়িটার মধ্যে থেকে যাদের বহু কষ্টে টেনে বার করা হল? তাদের মধ্যে একজন হাসপাতালকে বুড়ি ছুঁয়ে উঠে গেল স্বর্গে, আর অপরজন দীর্ঘকাল হাসপাতালে বাস করে অবশেষে একদিন স্ট্রেচারে করে বাড়ি ফিরলেন, দৃষ্টিশক্তি এবং চলৎশক্তি হারিয়ে।

'মায়ের বাড়ি যাচ্ছি—' বলে স্বেচ্ছায় গাড়ির চালকের ভূমিকাটা নিয়েছিলেন তিনি, চালককে অন্য গাড়িটা দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পূজার উপকরণ-ভার নিয়ে।

কী সুশৃঙ্খলেই সে সেইসব দ্রব্যসম্ভার নিয়ে মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হয়নি। অথচ—

পূর্ণিমা রায় হাহাকার করে বলেছেন, মাগো, অজান্তে যদি তোমার পুজোয় কোনো অঙ্গহানি ঘটে থাকে, তুমি আমায় নিলে না কেন? এমন ভয়ঙ্করী নিষ্ঠুর হলে কেন? কিন্তু পাথরের মূর্তির কাছ থেকে কে কবে প্রশ্নের উত্তর আদায় করতে পেরেছে?

* * *

সারারাতে পম্পা বারে-বারেই ওই শব্দ আর দৃশ্যটা শুনতে পায় আর দেখতে পায়।

আর বিধ্বস্ত ঘুমের রাতটা পার করে যখন কাঁচের জানলা থেকে ভোরের আভাস দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পম্পা, তখন সংকল্প করে ওঁদের বলব, রোজ রোজ এই টাটকা ফুলের মালা ঘরে দেবেন না। আমার ঘুম হয় না। কিন্তু দিনের আলোয় মানুষের মুখোমুখি এমন একটা অদ্ভুত কথা বলা যায়?

তাই রবিবার সকালে উঠে মনে হয়, আবার একটা রাত। কবে পম্পা এই দুঃসহ কুসুমগন্ধ ভারাক্রান্ত রাতের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে?

* * *

পম্পার এই সপ্তাহান্তিক ভ্রমণ অফিসের অনেকেরই তো নজর এড়ায় না। অনেকে অনেক কিছুই বলে। যার যেমন কল্পনাশক্তি। ওই গাড়িটাই যে বড় গোলমেলে জিনিস। দেখে আর নতুন কথা আবিষ্কার করে।

মিসেস রায়ের কোনো এক মামা আছেন খুব বড়লোক, উইক-এণ্ডটা সেখানে কাটাতে যান শুনলাম।

মামা? হুঁ! তা অবশ্য এরকম বেওয়ারিশ সুন্দরী মহিলাদের ভাগ্যে মাঝে মাঝে এমন 'মামু' 'কাকু' জোটে।

আচ্ছা, মহিলা যান কোথায় বলুন তো? মানে নিজের বাড়ির দিকে বলে তো মনে হয় না?

নিজের বাড়ির দিকে? হে হে! এই আপনার সেন্স মশাই? মামু-কাকুর গাড়ি চেপে নিজের গরিব বিধবা মায়ের বাড়ি!

আহা, আমি তো বলেছি কোনো ভবিষ্যতের স্টার!

কিন্তু প্রত্যেক শনি-রবি স্যুটিং? কোন্ স্টুডিওয় দাদা?

গাড়িটাকে পার্ক করে খানিকটা দূরে, লক্ষ্য করেছেন?

করেছি বৈকি।

তার মানে অফিসের কাউকে জানাতে চান না।

বাদে রত্নাকর মল্লিক—লক্ষ্য করেছেন তো?

তা করেছি বৈকি। সব সময়ই করছি। রূপবতী তরুণী বিধবা। ব্যাচিলারের কাছে এর থেকে লোভনীয় জিনিস আর কী আছে ভায়া!

মল্লিককে একদিন জিগ্যেস করলে হয়।

কী জিগ্যেস করবেন?

ওই যে, মিসেস রায় শনিবারে শনিবারে অ্যাম্বাসাডরে চেপে কোথায় যান এবং সোমবার সকাল পর্যন্ত কোথায় থাকেন?

বলবে? তাহলে আপনি মল্লিককে খুব চিনেছেন, কী ডাঁটুস! ত দেখেছেন? মানুষের প্রতি দৃকপাতই নেই। আঁতাতের মধ্যে ওই মিসেস রায়।

তাহলে বলছেন, মিসেস রায় ভবিষ্যতে মিসেস মল্লিক হয়ে যেতেও পারেন?

পারেন মানে? অবধারিত। দেখে নেবেন।

কিন্তু ওই গাড়িবান? সে তার ক্লেম ছাড়বে?

ওই একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে বটে।

আচ্ছা মল্লিকই বা তাহলে ব্যাপারটাকে হাস্যবদনে সহ্য করে কী করে?

হাস্যবদনে? তাহলে তো খুব দেখেছেন! গাড়িটার দিকে কীভাবে তাকায় জানেন? পারলে ভস্ম করে ফেলে!

তার মানে রাইভ্যালটি একটু বেশি শাঁসালো। আর মিসেস 'শ্যাম-কুল' দু-ই রাখছেন।

রহস্য।

জল্পনা-কল্পনা হার মানলেই 'রহস্য' বলে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এইসব সরকারী অফিসের 'শুধু কেরানী'রা ওর বেশি আর বেড়ে উঠতে পারে

না। তেমন এনার্জিওলা যুবকও বিশেষ কেউ নেই।

মাত্র রত্নাকরই অবিবাহিত ও তরুণ। তবে বেচারীর ভাগ্যক্রমটি দেখ। জুটল যদি বা একটা তো 'মিস' নয় 'মিসেস'।

* * *

রত্নাকর অফিসে এসেই চশমার ফাঁকে দেখল।

এখনো আসেনি। কী হল? ঘড়ির কাঁটায় আসে। অবশ্য মাত্রই মিনিট তিন-চার পার হয়েছে। তবুও এটুকুও হতে দেখা যায় না।

দু-একজন উঁকিঝুঁকি মারছিল। হঠাৎ রাধামোহন কাছে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, মিসেস রায়ের আজ কী হল, বলুন তো?

রত্নাকর প্রথম চায়ের পাত্রটা বেয়ারার হাত থেকে নিয়ে বলল, খুবই দুঃখের বিষয়, হাত গুনতে জানি না।

না, মানে ভাবছিলাম, আপনি হয়তো জানেন।

রত্নাকর ভুরু কুঁচকে বলল, হঠাৎ এরকম ভাবনাটা ভাবতে গেলেন কেন?

না, মানে—

থেমে গেলেন যে? মানেটা বলুন?

মানে আর কি, এক জায়গায় বসেন—

এ ঘরে আরো লোক বসে। রত্নাকরের ভঙ্গীতে জেরার চিহ্ন। যেন ওর কাছ থেকে উত্তরটা আদায় না করে ছাড়বে না।

রাধামোহন বলল, আচ্ছা চলি।

সে কী? চলবেন কী? না, না। হঠাৎ চললে তো চলবে না। জবাবটা দিয়ে যান।

কী মুশকিল। এর আবার জবাব কী?

থাকতেই হবে। প্রশ্ন থাকলেই জবাব আছে।

আহা বুঝছেন না। সকলেই আমরা বলাবলি করি—কী হতে পারে? বাঁধা নিয়মে এভাবে কে গাড়ি পাঠায়। আবার সোমবারে সোমবারে ঠিক সময়ে ফেরতও দিয়ে যায়।

শুধু আজকেই—মিসেস রায়ই তাহলে আপনাদের একটি প্রসঙ্গ?

প্রসঙ্গ মানে? ঠিক বুঝলাম না।

রত্নাকর একটু ব্যঙ্গহাসির সঙ্গে বলে উঠল, ঠিক বুঝলেন না? আচ্ছা ওই তো উনি এসেই গেছেন—উনিই বোঝান।

উনি আবার কী। কী আশ্চর্য। এই যে নমস্কার, বলছিলাম, আপনি যে বড় আজ লেট? এমন তো হয় না? আচ্ছা চলি।

চলে যায় রাধামোহন।

কিন্তু পিছনে একটা হা-হা হাসির শব্দ না? ওঃ। আচ্ছা, ব্যঙ্গ। ঠিক আছে। অফিসের বুকে বসে, বিধবা মেয়েছেলের সঙ্গে প্রেম করা বার করছি তোমার শালা।

পম্পা বলল, আপনি হঠাৎ ওরকম অট্টহাস্য করে উঠলেন যে?

হাসি পেল।

অকারণ?

হতে পারে না? কত কিছুই তো অকারণ অহেতুক হয়।

গাড়িতে আসতে আসতে পম্পার মধ্যে যেন একটা চাপবাঁধা বিষণ্ণতা তাকে পাথর করে রেখেছিল, পম্পার মনে হচ্ছিল, আজ একটিও কোনো কথা না বলে কাজ সেরে চলে যাবে। কিন্তু ঘরে ঢোকামাত্র যেই ওই উদ্ভাসিত মুখটা দেখতে পেল, আর ওই হা-হা হাসি শুনতে পেল, সেই পাথরের ভারটা যেন কোথায় উড়ে গেল। এখন ইচ্ছে হল, কথার পিঠে কথা ফেলতে। তাই কাঁধের ব্যাগটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, কিন্তু শাস্ত্রে আছে, কারণ বিনা কার্য হয় না।

মাঝে মাঝে শাস্ত্র ছাড়া কাজও হয় নাকি। ধরুন যেমন ভালবাসা। 'অহেতুক' হয় না? শেষের কথাটা অবশ্য একটু গলা নামিয়েই বলল। এবং বিশেষ একটি ব্যঞ্জনা মিশিয়ে বলল।

ভিতরটা কেঁপে উঠল পম্পার। ওই ব্যঞ্জনা যেন লুঠেরার হাতের মত পম্পার দিকে এগিয়ে আসতে চায়। ধীরে ধীরে তিলে তিলে এগিয়ে আসতে আসতে ক্রমশ যেন একেবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। পম্পা এখন কী করবে? পিছিয়ে গিয়ে উল্টোমুখো দৌড় দেবে? ছুটে ছুটে দূরে সরে যাবে?

পিছনে ফেলে আসা যে একটা জমাট অন্ধকারের পাহাড় অনেকখানি আকাশকে আড়াল করে রেখেছে, তার কাছেই গিয়ে আশ্রয় নেবে?

কিন্তু ওই লোকটা যে কী এক জাদুমন্ত্র জানে। ওর হাসি, ওর কথা, ওর চোখ যেন সেই পাথুরে পাহাড়টাকে কুয়াশার মত হালকা করে দেয়।

তবু পায়ের তলার মাটিটাকে শক্ত করে চেপে থাকতে চেষ্টা করল পম্পা। আর সেই চেষ্টাটাই ওকে প্রায় বোকার মত করে ফেলল। আর সেই বোকামির বশেই ওই সুন্দর ব্যঞ্জনাময় বাক্যটির পটভূমিতে বলে বসল কিনা, এসেই চা?

েবার হবে ?

প্রসঙ্গ পাল্টানোটা রত্নাকরের নজর এড়াল না। মনে মনে একটু হেসে লল, য'বার জোটে।

জেনেবুঝে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন কেন ?

রত্নাকর বলল, কারণ ওটাই মনুষ্যধর্ম।

ওটাই মনুষ্যধর্ম ?

তাছাড়া কী ? কে না আমরা জেনেবুঝে নিজের ক্ষতি না করি ?

সব্বাই তাই করে ?

সব্—বা-ই। কেউ জ্ঞানে কেউ অজ্ঞানে। অথবা অজ্ঞানের ভানে। ভা ে রে ভেবে দেখুন। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল পম্পার চোখের দিকে।

পম্পা তাড়াতাড়ি বলল, আপাতত এত দার্শনিক চিন্তার সময় নেই। ফাইলের ক্তে খুলতে যাচ্ছি।

তবু সেও কি একবার আলোভরা চোখে রত্নাকরের দিকে তাকিয়ে গেল না ? এতেও যদি রাধামোহন কোম্পানী বাজী ফেলতে না বসে, 'মিসেস রায় সেস মল্লিক হলেন বলে, দেখে নেবেন আপনারা—' তবে আর কিসে বসবে ?

মানুষ তো ঘাস খায় না ? হলঘরের অপর প্রান্ত থেকে সব কথা স্পষ্ট শোনা ক আর নাই যাক, চোখের আলো ? হাসির ব্যঞ্জনা ? দেখামাত্রই এক লৌকিক দৃষ্টি-বিনিময় ?

*   *   *

বেলেঘাটার কমলা চক্রবর্তীর সপ্তাহের তিন-তিনটে দিন যেন একটা যন্ত্রণার মধ্যে কাটে।

শনিবার অফিসবেলায় সেই যে কোনোমতে দুটো খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে য় মেয়েটা, তারপর থেকে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোনো খবরের নাগাল বার উপায় নেই কমলার।

প্রথম দু'একবার কমলা পাশের বাড়ির টেলিফোন থেকে মেয়ে অফিসে ান করেছিল, ঠিকমত সময়ে ফিরেছে কিনা জানতে। বারণ করে দিয়েছিল ম্পা। বলেছিল, কোনো মানে হয় না এই অস্থিরতার। ক'ঘণ্টা পরেই তো াসছি তোমার কাছে।

ছোট ভাই সমু বলেছিল, মাকে ঢের বারণ করেছি দিদি, হ্যাংলার মত পরের ড়ি গিয়ে টেলিফোন না করতে। তা শুনলে তো ?

তা ছেলের বারণ না শুনলেও মেয়ের বারণ শুনতে বাধ্য হয়েছে কমলা।

অতএব সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ঘর-বার। এবং শেষ মুহূর্তে 'বার'টাই টানতে থাকে।

বাস থেকে নেমে পম্পা মোড় ঘুরতেই দেখতে পেল, মা যথারীতি মোড়ের কোণে শক্তি ব্যাটারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য! এ রোগটা আর যাচ্ছে না মা'র।

মেয়েকে দেখতে পেয়েই তাড়াতাড়ি পিছু ফিরে বাড়ির দিকে চলে গেল কমলা। এই দ্রুত প্রস্থানের কারণ মাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেই বকাবকি করবে পম্পা।

বাড়ি ঢুকেই পম্পা বলে উঠল, কী মা, আমায় দেখে অমন ভূত দেখার মত অ্যাবাউট-টার্ন পিটটান দিলে যে?

শুনে চমকে উঠল কমলা। ভেবেছিল বুঝি, সে মেয়েকে দেখতে পেলেও মেয়ে তাকে দেখতে পায়নি। থতমত খেয়ে ভালমত কিছু ছুতো আবিষ্কার করতে পারার অভাবে বলে উঠল, চায়ের জলটা চড়াতে এলাম তাড়াতাড়ি। জনতায় যা সাতজন্ম দেরি হয়!

এটাও তাৎক্ষণিক চিন্তার ব্যাপার। ওই জনতাতেই কমলা অফিসের ভাতও দেয়।

তা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

এমনি। কিছু না। এত গরম হচ্ছিল—বাড়ির মধ্যেটা যা ঘুপচি!

এই গরমে আমাকে এসেই গরম চা খেতে হবে? এক মিনিট দেরি সইবে না?

বাবাঃ, তুই যেন পুলিশি-জেরা করছিস! সারাদিন খেটেখুটে এসেছিস।—

হোপলেস। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রোয়াকের দেয়ালধারে পাতা ফাটা-চটা সরু বেঞ্চটার ওপর বসে পড়ল পম্পা। যে বেঞ্চটায় ঠিক এইভাবে তার বাবা বসে পড়ত অফিস থেকে এসে।

সংসারের চেহারা নেহাতই জৌলুসহীন। বাড়িওলার বাড়ির একতলার একাংশ এই আড়াইখানা ঘরের সংসার।

কমলা চক্রবর্তী আর অজিত চক্রবর্তী তাদের জীবনযাত্রার প্রারম্ভে মাস কয়েকের একটা বাচ্চা নিয়ে সংসার পাততে এসে যে বাসাটুকুতে ঢুকেছিল, আজ পর্যন্ত সেই বাসাতেই রয়ে গেছে সংসার। সেই মাস-কয়েকের মেয়েটাই আজকের

এই বিচিত্র নাটকের নায়িকা পম্পা। সম্ তার জন্মাবার অনেকদিন পরে জন্মেছে। তাই এখনো স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি।

ইত্যবসরে অজিত চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে বাসাটা ছেড়ে কেটে াড়েছে এবং সদ্য বি. এ. পাস পম্পা দিশেহারা হয়ে বাবার অফিসেই আবেদন রে একটা চাকরি যোগাড় করে ফেলে সংসারের হালটা ধরেছে। এই পর্যন্ত। ংসারের চেহারায় জৌলুস বাড়ানোর প্রশ্ন ওঠে না।

তবে অজিত চক্রবর্তীর মনের মধ্যে বাসনা ছিল ভাল বাড়িতে উঠে যাবার, ন্দর করে সাজিয়ে সংসার করবার। তা কার ক'টা বাসনাই বা মেটে? এই বঞ্চটা যেদিন শেয়ালদা-বাজার থেকে কিনে রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে এসেছিল, মতটা পথ ওই একটা বেয়াড়া জিনিসকে ধরে নিয়ে। এসে রকের ওই দেয়াল, ারটায় স্থাপন করে পরমানন্দের আলো মুখে মেখে ফেলে বলেছিল, এই একটি াারামের ব্যবস্থা করা হল। বাইরে থেকে এসেই ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না। । বেশ এখানে খানিক বসে হাওয়া লাগিয়ে জিরিয়ে—

তা সেটি সে করত। বাজার থেকেই ফিরুক আর অফিস থেকেই ফিরুক, াসেই এখানে একটু বসে নিয়ে সংসারের সারাদিনের ঘটনাপঞ্জি শুনে-টুনে তবে রে ঢুকত। ঘরে তো বসবার জায়গা বলতে বিছানা।

পম্পাও বাবার মত অফিস থেকে ফিরে এই বেঞ্চটায় একটু বসে নেয়। যেটা এখন ফাটাচটা হয়ে গেছে।

আজকেও বসেই বাবার কথাটা মনে পড়ল পম্পার। বাবা কাউকে বাতাস রতে দিত না। নিজেই তালপাতার পাখাখানা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেত। াবার মুখের রেখায় রেখায় কী পরিতৃপ্তির ছাপ পড়া তখন! অনেক আসবাবপত্র, নেক আড়ম্বরের আয়োজন ছিল না বলে কী বাবা একটুও অসুখী ছিল?

পম্পাও হাতপাখাখানা নাড়ছিল। মা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। লল, দে আমি একটু জোরে জোরে বাতাস করে ঘাম শুকিয়ে দিই। শোবাব ারের মতন এখানেও একটা টেবিলফ্যান ভাড়া করে বসিয়ে রাখলে বেশ হয়।

পম্পা পাখাখানা মাকে নাড়তে দিল না। নিজেও নাড়া বন্ধ করল। একটু ুদ্ধ হাসি হেসে বলে উঠল, আমার কী অবস্থা হয়েছে জান? 'না ঘরকা, না াটকা।' নিজস্ব কোনো জায়গা নেই।

মা থতমত খেয়ে বলল, একথা বলছিস যে?

যা দেখছি তাই বলছি। এই অভাগা মেয়েটা সেখানেও কুটুম এখানেও

কুটুম। কিংবা 'গুরুঠাকুর' বললেও হয়। সেখানেও তাই, এখানেও তাই।

বেচারী কমলা কথায় খুব চৌকস নয়। যাহোক ভাবে বলে ফেলল, ত আদরের জিনিস আদর করবে না লোকে?

আদর আর সমীহ এক নয় মা। পম্পা আবার পাখাটা নাড়তে লাগল।

মা কথা বাড়াল না। ভয়ে ভয়ে বলল, হাতমুখ ধো।

ধুই। ভাবছি এইরকম শূন্যে দাঁড়িয়ে কতদিন চালানো যাবে!

মা মেয়ের কথার থই না পেয়েই বোধ হয় যে কথাটা পরে গুছিয়ে-গাছি বলবে ভেবেছিল সেটাই ফট করে বলে ফেলল। বলল, তোর শ্বশুরবাড়ি থে এত জিনিস দেয়! লজ্জা করে। ড্রাইভারটাকে ঝিটাকে যে 'চা খেও' বলে দু টাকা দেব, তার তো উপায় নেই। তোর যে আবার কড়া নিষেধ!

পম্পা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এই নিষেধটা যে মানো এই রক্ষে।

মা আর একটু ইতস্তত করে বলে ওঠে, ওদের হাতে তোর শাশুড়ী যে আমা একখানা মস্ত চিঠি দিয়েছে।

চিঠি দিয়েছে! মস্ত? চমকে উঠল পম্পা।

দুটো কারণেই চমকানো। চিঠি শুনে আর মার মুখে 'তোর শাশুড় শুনে। মা তো সব সময় 'উত্তরপাড়ার ওঁরা' বলে উল্লেখ করে। একটু আগে একবার খটকা লেগেছে তোর শ্বশুরবাড়ি শুনে।

হঠাৎ মার বাকভঙ্গীর পরিবর্তন কেন?

চোখ কুঁচকে বলল, চিঠি কিসের?

কমলা করুণা-বিগলিত-গলায় বলল, কিসের আর, দুঃখের, আক্ষেপের আর—

পম্পা হঠাৎ মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করল।

এই আধময়লা একটা মোটা সাদা সেমিজ আর সেইরকমই একখানা সরুপা শাড়ি এবং হাতে দুগাছা মলিন পেতলের চুড়িপরা বেচারী অজিত চক্রবর্তী বিধবা স্ত্রী কমলা চক্রবর্তী এখন করুণা করছে সেই পূর্ণিমা রায়কে। পূর্ণি রায়ের চেহারাটা মনে পড়ল।

ভাঙাচোরা সর্বহারা হয়েও, সাজসজ্জায় চলনেবলনে এখনো সর্বৈশ্বর্যময়ী একহাত চওড়াপাড় ছাড়া কোনো শাড়িই তো নেই পূর্ণিমা রায়ের। নে এমব্রয়ডারি করা অথবা শাড়ির পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ করা ছাড়া কোনো ব্লাউজ পূর্ণিমা রায়ের হাতে এখনো ভারী ভারী একগোছা সোনার চুড়ি। স্বামী

কল্যাণের চিহ্ন।

কোন একদিন রাস্তায় পড়ে থাকা অচৈতন্য অবস্থায় ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে পূর্ণিমা রায়ের অঙ্গ থেকে অনেক সোনা লুঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাতেই তো আর তিনি নিঃস্ব হয়ে যাননি। ব্যাঙ্কের ভল্টে তো আরো কতই মজুত ছিল।

সেই পূর্ণিমা রায়, যিনি কাঁদতে-কাঁদতেও পঞ্চব্যঞ্জন সাজানো ভাতের থালার সামনে এসে বসেন কার্পেটের আসনে। তাঁকে করুণা! কমলা চক্রবর্তীর?

পম্পা অবশ্য বোঝে এটা ওঁদের বিলাসিতা নয়, অভ্যাস মাত্র। নাহলে একমাত্র পুত্র হারিয়ে ফেলা, অন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভাতসূর্যের পরবার ধুতি এখনো চুনট করে কোঁচানো হয় কেন? আদ্দির পাঞ্জাবির হাতায় গিলে কুঁচি?

সেই গিলে করা হাতায় বার বার চোখ মুছে ভিজে যায়। তবু এছাড়া আর কিছু হয় ওঁদের জানা নেই।

কমলা চক্রবর্তী আর পূর্ণিমা রায় দুই জগতের বাসিন্দা।

পম্পা মনে মনে কৌতুকের হাসি হেসে আবারও ভাবল, সাধে বলেছি আমি তাই 'না ঘরকা, না ঘাটকা'। আমি কোনো জগতেরই নই। যদিবা নিজের সত্তাকে আমি মৃত অজিত চক্রবর্তীর এই ফাটাচটা সংসারেরই এক জন বলে মনে করতে চেষ্টা করি, এরাই করতে দেয় না সেটা। এই কমলা চক্রবর্তী আর তার ছেলে সমীর চক্রবর্তী। সমুও তো দিদিকে আশ্চর্য একটা সমীহর চোখে দেখে এখন। বাবা মারা যাওয়ার পর দিদি যখন সংসারের হাল ধরেছিল তখন থেকেই। তারপর তো বিরাট সমীহর পটভূমি।

পম্পা দেখল মা যেন আরও কিছু বলি-বলি করছে। তাই পম্পা বলে উঠল, হঠাৎ আজ নতুন করে তোমার কাছে দুঃখ-আক্ষেপ জানাতে বসলেন যে?

কমলা বলল, পড়ে দেখ।

তোমার চিঠি আমি পড়তে যাব কেন?

কমলা অবাকের ভঙ্গীতে বলল, শোনো কথা মেয়ের! চিঠির লক্ষ্য তুই, আমি উপলক্ষ বই তো নয়। তোকে বলতে সাহস হচ্ছে না তাই আমায় বলেছেন। বলেছেন, তোর এই চাকরিটা ছাড়ার কথা। ওঁরা আর একা থাকতে পারছেন না। আর ওঁদের ঘরের বউ যে তুচ্ছ ক'টা টাকার জন্যে এইভাবে খেটে হাড়কালি করছে, এও সহ্য করতে পারছেন না। ঘরে-বাইরে মুখ থাকছে না। অথচ তোকেও স্পষ্ট বলতে পারছেন না, চাকরি ছেড়ে দাও।

তাই দুঃখ করে লিখেছেন, বিয়ের আগে তো কথা হয়েছিল, অফিসে ছুটি

নেওয়ার কী আছে, রিজাইন দিক। বিয়ের পরে তো আর চাকরি করার কথা ওঠে না। তা সে জোর করার মুখ তো আর ভগবান রাখলেন না। তাই জোরের বদলে মিনতি। বউমাকে আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করুন। আমরা আর এই শূন্যপুরীতে টিকতে পারছি না।

কমলা পত্রের মর্মার্থ সবই বলে ফেলে বলে ওঠে, তা ভেবে দেখছি, ওঁদের দিকটা তোর দেখা উচিত। চাকরিটা বাপু ছেড়েই দে।

পম্পার মাথা থেকে পা অবধি যেন একটা বিদ্যুতের শক খেলে যায়।

মা হঠাৎ ওদের পক্ষ নেওয়ায় পম্পা যেন নিজেকে আত্মস্থ রাখতে পারে না। তীব্রভাবে বলে ওঠে, চমৎকার! ওঁদের দিকটাই দেখা উচিত—আর তোমাদের দিকটা?

আমাদের! কমলা উদাস গলায় বলে, আমাদের যাহোক করে চলেই যাবে।

সেই যাহোকটা কী? পম্পা আরো তীক্ষ্ণ হয়।—বড়লোক বেয়াইবাড়ির মাসোহারা নয় তো?

কমলা কেঁপে ওঠে। কমলা ওইজন্যেই চিঠিটা মেয়েকে দেখাতে চেয়েছিল। সেই ধরনেরই একটু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে বটে। অবশ্য ছুতোটা করা হয়েছে সমীরের পড়াশুনোর উল্লেখ করে। তার যাতে সে ব্যাপারে কোনো ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে ওঁরা অবহিত থাকবেন। যতদিন না 'শ্রীমানের' লেখাপড়া শেষ হয়, সব দায়িত্ব প্রভাতসূর্য রায় আর পূর্ণিমা রায়ের।

খুবই আক্ষেপ করে লিখেছেন মহিলা, ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তাঁদের কোনো জোরেরই মুখ নেই। নচেৎ 'বৌমার ভাই' তো তাঁদেরই একজন হবার কথা। তা বেয়ান যেন মনে মনে জানেন, সমীর একা তাঁরই নয়, এনাদেরও।

যথেষ্টই অর্থবহ ইঙ্গিত। যার পিছনে রয়েছে কমলা চক্রবর্তীর মেয়ে চাকরি ছেড়ে দিলে তার যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে, তার সমাধানের প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু কথাটা তো কমলা বলেনি এখনো। পম্পা তবে বুঝল কী করে? অনুমান? আর অনুমানেই রেগে আগুন!

বোকা হলেও কমলা একটা বুদ্ধির সিদ্ধান্ত করে ফেলল। ভাবল, থাক, চিঠিটা ওকে দেখিয়ে কাজ নেই। বলেছে তো, তোমার চিঠি আমি পড়তে যাব কেন?

আশ্চর্য, কমলা যাতে ওঁদের কত 'মহানুভব' ভাবছিল, মেয়ে তাতেই

আগুন হয়ে উঠল।…ওঁরা তোকে কত ভালবাসেন তা বুঝছিস না ? মহানুভব মহৎ নন ওঁরা ? যেক্ষেত্রে বউকে 'অপয়া' বলে আর তার মুখ না দেখবার কথা, সেক্ষেত্রে ওঁরা তাকে এইভাবে যত্ন-আদর তোয়াজ করে করে 'আপন' করবার চেষ্টা করেছেন, নির্বোধ মেয়েটা বুঝছে না এসব !

একথা অবশ্য সত্যি, সেই ভয়ঙ্কর ইতিহাসের পর পম্পাকে যখন হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিল, কমলা তার দাদাকে পাঠিয়েছিল মেয়েকে আনতে। যদিও মেয়ের শ্বশুর তখনো নার্সিংহোমে।

অবশ্য তখন কমলা 'শ্বশুর' শব্দটা মনের কোণেও আনেনি। কমলার শিক্ষা-মতই তার দাদা রমাপতি উত্তরপাড়ার রায়বাড়ি গিয়ে বলেছিল, আর এখানে কোন্ সুবাদে রাখা যাবে ওকে বলুন ! বিয়েটা তো আদৌ হয়ইনি। ও তো এখনো আমাদের 'কুমারী মেয়ে'।

তখন কমলা ওদের দিকটা ভাবতে বসার কথা ভেবে ওঠেনি।

পম্পা বলে উঠল, মনে হচ্ছে আমার অনুমানটা ভুল নয়, তাই না মা ?

মা চিঠিটা দেখাবে না। তাই মা রাগ দেখিয়ে বলে উঠল, 'মাসোহারা' আবার কী ? আর তাই দিতে চাইলেই আমি নেব ?

কী জানি ! হঠাৎ যখন ও-পক্ষের উকিল হয়ে পড়ছ—মেয়েটাকে বিদায় করবার তাল করছ !

মা উদাস গলায় বলল, মেয়েসন্তান তো ঘরে রাখার জিনিস নয় মা। বিদায় দেবারই তো জিনিস। পাকেচক্রে আর আপনার ভাগ্যচক্রে এমন অবস্থা। সর্বসুলক্ষণা মেয়ে আমার—'রাজরানী যোগ' তো হল সবই। আবার কিছুই হল না। এখন ওঁদের অবস্থা শুনে-শুনেই মনে হচ্ছে দু'নৌকোয় পা রেখে আর কী হবে তোর ? আমাদের ভগবান যা করবেন তাই হবে।

দু'নৌকোয় পা ? পম্পা বলে উঠল, ঠিক তো। বলেছ ভাল। ভাবছি তাহলে একটা নৌকো ছেড়েই দিই, অ্যাঁ ! শক্তটাতেই পা রাখি, কী বল ?

মা দুঃখভরা গলাতেও উৎসাহের ব্যঞ্জনা এনে বলল, সেটাই ভাবছি তখন থেকে। কী দুরন্ত শোক নিয়ে শূন্যপুরীতে বসে হাহাকার করছে মানুষ দুটো ! তবু তোকে পেলে—সত্যি তোর চাকরির কী দরকার ?

মা মেয়ের নির্নিমেষ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে দেখে ভেবে পেল না, কোন্ দিকে তাকিয়ে আছে ও। যেন আকাশে নয় বাতাসে নয়, উঠোনের টিউবওয়েলটায় নয়, রান্নাঘরের দেওয়ালে উঠে বাওয়া লাউলতাটার দিকে নয়, মা'র মুখের দিকে

তো নয়ই।

রোয়াকের নিচে একচিলতে মেটে উঠোনওলা এই বাসাটির অনাহত দৃশ্যই তো এই।

মা তাড়াতাড়ি বলল, গরিব গেরস্থর ঘরে রাতদিন খাটতে-খাটতেই লোকের দাঁত ক্ষয়ে যায়। বড়মানুষের ঘরে হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকা শুধুই হাহাকার—ওঁদের হয়েছে তাই।

পম্পা সচকিত হল। মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে বলছ তোমার মেয়েটা এবার বড়মানুষ হয়ে গিয়ে হাত-পা কোলে করে বসে থেকে ওই অবস্থাতেই পৌঁছক!

মা থতমত খেল। ওমা! এই তো মেয়ে বলল, 'আর দু নৌকোয় পা রাখবে না'। আবার মন ঘুরে গেল নাকি?

বেচারী কূল না পেয়ে আপাতত তৃণখণ্ডটাই ধরল। বলল, যাকগে বাবা! ওসব কথা পরে হবে, এখন চা-টা খা তো। চায়ের জলটা বোধ হয় ফুটে ফুটে মরেই গেল।

হঠাৎ মাকে অবাক করে দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল পম্পা।

ওমা, তুচ্ছ চায়ের জলটাও 'ফুটে ফুটে মরে গেল' বলে আপসোস হচ্ছে তোমার! কী মায়ার প্রাণ গো!

কমলা মেয়ের এই অকারণ হাসির মানে খুঁজে পায় না।

* * *

কমলা বেচারী মেয়ের হদিস না পেয়ে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে যে 'কত জিনিস' পাঠিয়েছে সেগুলো আর দেখাতে বসল না। মেয়ে তাকিয়ে দেখে না। বিরক্ত হয়, তবু তো দেখায় ডেকে ডেকে। আর কাকেই বা দেখাবে? সমু অবশ্য খুব উল্লসিত হয়। বলে, ওরে বাবা, কত নারকোল, কত পেয়ারা, কত কলা, কত বাতাবিলেবু, শশা, পেঁপে। উঃ, পাড়ায় বিলোও বাবা! এত কে খাবে? দিদি তো খেতেই চায় না।

আবার বলে, বাড়ির গরুর দুধে এত সন্দেশ—এতটা ক্ষীর? ভাবা যায় না। এবং শেষ পর্যন্ত হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এই শ্বশুরবাড়ি হয়েছিল দিদির! কোথায় ওরা, কোথায় আমরা! তাও যদিবা বাবা থাকতেন।

এ সংসারে কোনো আহ্লাদই আর শেষ অবধি আহ্লাদ থাকে না।

চিরঅভাবী কমলা যখন দোতলায় উঠে বাড়িওলার বাড়িতে মেয়ের শ্বশুর-

বাড়ির বাগানের ফল-তরকারি উপহার দিতে যায়, তখনো তো শেষ অবধি দুঃখ আর হতাশা।...আহা, কী বিয়েই হয়েছিল মেয়েটার!

কিন্তু এমন অঘটনটা ঘটেছিল কী করে?

বেলেঘাটার এই একতলার ভাড়াইখানা ঘরের বাসিন্দা কমলা চক্রবর্তী, যখন সদ্য স্বামী হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে, তখন হঠাৎ তার মেয়েটা উত্তরপাড়ার বনেদী বংশ রায়বাড়িতে গিয়ে উঠল কী করে? যে মেয়ের রোজগারেই তখন সংসারের ভরণপোষণ চলছে!

কোন্ ঘটকের ঘটকালীতে এমন অভাবিত ঘটনা? নাকি কোনো মন্ত্রবলে?

তা অভাগী কমলা চক্রবর্তীর দুর্ভাগ্যে মেয়েটা সেই রাজবাড়ির সিংহাসনে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না। পিছলিয়ে পড়ে গেল। পরিচিত সমাজ হতবাক হয়ে হায় হায় করল যত, তার থেকে বেশি করল বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাবার ধৃষ্টতার ব্যাখ্যা! এত কী আর সয়? যা রয়সয় তাই ভালো!

কিন্তু কমলা কি নিজে চাঁদে হাত বাড়াতে গিয়েছিল? সে তো ভয়ে ছুট মারতেই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চাঁদ নিজে নেমে এসে হাত বাড়ালে?

অজিতের দূর-সম্পর্কের এক দিদি, উত্তরপাড়ায় তার মামাশ্বশুরবাড়ি, সেই একদিন এসে হাজির। 'কমলা বউ, মেয়ের বিয়ে দিবি? রাজপুত্তুর পাত্তর, এক পয়সা নেবে না। নিজেরা গা সাজিয়ে গহনা দিয়ে নিয়ে যাবে—মস্ত বনেদী বংশ।'

কমলা ননদের কথায় অলীক হাসি হেসে বলেছিল, তারা আসবে আমার মেয়েকে বউ করতে?

আহা, কার ভাগ্যে কী আছে বলা যায়? মেয়ের যদি ভাগ্যে থাকে—ওরা একটি ভাল কুষ্ঠিওলা সোন্দর মেয়ে খুঁজছে শুনলাম। দে না তুই তোর মেয়ের কুষ্ঠিটা আর একটা ফটো!

কমলা বলল, কুষ্ঠি কোথায় পাবো? কে কবে করেছে?

তা না করেছে না করেছে। বলি, জন্ম-সময়টা লেখা আছে?

তা আছে।

তাতেই হবে। ওদের হাতে কত জ্যোতিষী। ছেলের সঙ্গে রাজযোটক হওয়া চাই। তাও বলেছে, আহামরি সুন্দরী না হলেও চলবে। তা আমার ভাইঝিটি তো হেলাফেলার নয়, যে দেখবে ফিরে তাকাবে। রংটাই যা দুধে ধোওয়া নয়। সেটা হলে তো পরমাসুন্দরী বলা হতো।

কমলার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। বলেছিল, শুধু শুধু ধাষ্টামো। যেরকম ঘর-

বর বলছ তুমি ঠাকুরঝি—শুনে আমার হাসি পাচ্ছে। আমার মেয়ে যাবে তাদের ঘরে!

তবু 'ঠাকুরঝি' হানফান করে নিয়ে গিয়েছিল জিনিস দুটো। বলেছিল, কপাল ঠুকে দেখিই না।

আর তারপরই কী এক অলৌকিক রহস্যে এই সংঘটন। পম্পার প্রতিবাদ কোনো কাজে লাগেনি। বন্যা কি প্রতিবাদ মানে! পম্পার ভাগ্যটা পৃথক, দুর্ভাগ্য যে ধেয়ে চলে এসেছিল বন্যার বেগে।

কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল! সেই উত্তরপাড়ারা হেদিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বেলেঘাটার এই নেহাতই দীনহীন গেরস্তপাড়ায়। মেয়ে পছন্দ। কোষ্ঠী পছন্দ। একেবারে রাজযোটক মিল। সাতদিনের মধ্যে বিয়ে। কারণ সামনে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক তিন মাস বিয়ে নিষিদ্ধ।

এই আকস্মিকতায় মেয়ে আচ্ছন্ন, মা আচ্ছন্ন, তার ছেলেটাও আচ্ছন্ন। আর আচ্ছন্ন হয়ে গেল পাড়া-পড়শীরাও—যখন দেখল ফুল সাজানো এবং টুনি বালব ঝোলানো গাড়িতে চেপে রাজপুত্রের মত বর এসে দাঁড়াল কমলা চক্রবর্তীর দরজায়। কমলা তো কিছুই করতে পারল না, যা করল পিসি আর বাড়িওলারা। বাড়িওলার চেষ্টাতেই একটা ইস্কুলবাড়ি যোগাড় হয়েছিল, তাতেই বিয়ের ব্যবস্থা। বরপক্ষের প্রেরিত কলকাতার নামীদামী এক 'কেটারার্স' এসে বরযাত্রী কন্যাযাত্রী উভয় পক্ষকেই ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করে গেল।

পরদিন সকালে পাড়ার 'সেই পম্পা' যখন অষ্টাঙ্গে অলঙ্কার পরে বরের চাদরে গাঁটছড়া বেঁধে সেই ফুলসাজানো গাড়িতে চেপে বসল, তখন সমস্ত পাড়া ভেঙে পড়ল রাস্তার ধারে। সবার মুখে একই কথা, কী ভাগ্য! কী ভাগ্য! এ যেন কোনো ব্রতকথার গল্প! গরীব ব্রাহ্মণের মেয়েকে রাজপুত্তুর এসে বিয়ে করে নিয়ে গেল।

আর তার পরের দিনই সেই তারাই সকলে একবাক্যে রায় দিল, এ তো জানা কথাই। এত কখনো সয়? কাজ করতে হয় সমানে সমানে। বামন হয়ে চাঁদে হাত! সইলেই হলো?

কিন্তু অপর পক্ষরা? তারা তো আর বেচারী কমলা চক্রবর্তীর মত নির্বোধ নয়! তাদেরও তো জানবার কথা, কাজ করতে হয় সমানে সমানে। চেষ্টা করলে কি আর তারা তাদের সমান সমান ঘরে পম্পার মত মেয়ে পেত না? এত হামলে পড়তে পড়তে এলো কেন? আর এই কি রাজযোটকের নমুনা? শুধু

যোটকই দেখেছে, আর কিছু না? রহস্য!

পম্পাও কতদিন বেলেঘাটার বাসার এই ঘুপচি ঘরটায় সরু একটা চৌকির নেহাত সাধারণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে, কী এই রহস্য? একেই কি তাহলে 'নিয়তি' বলে? কিন্তু কার নিয়তি? সেই প্রৌঢ় দম্পতির, না পম্পার?

পম্পাদের বাড়িতে পম্পা কখনো এই 'জ্যোতিষ, জ্যোতিষী, ঠিকুজিকোষ্ঠী, যোটক-রাজযোটক' শব্দগুলো শোনেইনি। কাজেই সে সম্পর্কে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো চেতনাই জন্মায়নি। বিয়ের সময় পিসি-বাহিত হয়ে ওই শব্দগুলো এ বাড়িতে এসে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটাকে অনুধাবন করার আগেই পম্পা নামের মেয়েটার কাছে ব্যাপারটার অন্তঃসারহীন অসারতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ওঁরা? এইটাই ভেবে পায় না পম্পা। ওঁরা নাকি চিরকালই ব্যাপারটাকে 'অভ্রান্ত' বলে জানেন এবং মানেন। তবে? তার এতবড় ব্যর্থতা দেখেও বিশ্বাস হারালেন কই? এখনো তো পম্পা যখন চলে আসে, পূর্ণিমা রায় বলে ওঠেন, 'দুর্গা দুর্গা!' আর প্রভাতসূর্য বলেন, আজকের তিথিটা দেখেছিলে পূর্ণিমা? অশ্লেষা মঘা-টঘা নয় তো?

খুব হাসি পায় পম্পার। আবার এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্যও লাগে। আর আশ্চর্য লাগে ওঁদের ভঙ্গী দেখে। পম্পার কাছে যেন ওঁরা একটা অপরাধীর ভূমিকায় থাকেন। সাধারণ নিয়মে নিজেদের এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্য নতুন বউকে দায়ী না করে বউয়ের দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেদের দায়ী করার ভঙ্গী কেন ওঁদের? শুধুই মহত্ত্ব?

বউ গেলে কৃতার্থমন্যের ভঙ্গী। বউকে দেখলে বিগলিত। বউ কথা কইলে যেন 'দেবীর বর' পাচ্ছেন। এমন কেন? মানসিক ভারসাম্যের অভাব? ভেবে ভেবে ঠিক করেছে পম্পা, এটাই কারণ! ভয়ানক সন্ধিক্ষণে অকস্মাৎ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফেলে ওঁরা মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

সেইখানেই তো মুশকিল। পম্পা ভারী অসহায় বোধ করে। ওই দুটো করুণাপ্রার্থী আর স্নেহবিগলিত মুখের দিকে তাকিয়ে পম্পাও মনের জোর হারিয়ে ফেলে বসে। জোর করে বলে উঠতে পারে না, এইভাবে সপ্তাহে সপ্তাহে আসা আমার পক্ষে খুব অসুবিধে। বলে উঠতে পারে না, কেনই বা আসব আমি রোজ রোজ সেটাই বলুন?

চন্দ্রসূর্যের নিয়মের মত গাড়িটাও যেমন এসে দাঁড়ায়, পম্পাও তেমনি নিয়মের

চক্রে আবর্তিত হয়ে তাতে উঠে বসে।

কিন্তু শুধুই কি সপ্তাহে সপ্তাহে? ক্রমশই যেন এক আগ্রাসী স্নেহের প্রবল ক্ষুধা, পম্পাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেষ্টা করে চলেছে। ক্রমশ আর শুধুই সপ্তাহান্তিক থাকছে না ব্যাপারটা, যে কোনো ছুটি পড়লেই কমলা চক্রবর্তীর বেলেঘাটার বাসার দরজায় সেই পরিচিত গাড়িটি এসে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তা থেকে নেমে আসছে সেই গিন্নীবান্নি পুরনো পরিচারিকাটি। মার্কামারা বড়লোকের বাড়ির পুরনো লোকের ভঙ্গী। এই ভঙ্গীর সামনে বলে ওঠা যায় না, আজ আর পম্পা যাবে না। গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বাছা। বরং কমলা এমন তটস্থ ভাব দেখায়, যেন স্বয়ং বেয়ানই এসেছেন বুঝি!

পম্পা রেগে রেগে বলে, খালি খালি কী যাব? তুমি যদি বলতে না পারো, আমিই বলে দিচ্ছি গিয়ে, যাব না, অন্য কাজ আছে। মা তখন মেয়ের হাতেপায়ে ধরার যোগাড় করে। বলে, গাড়ি ফেরত দেওয়াটা বড্ড অপমানের। অমন একটা মানিমান লোক। খোঁড়া অন্ধ হয়ে বসে আছে। একটুতেই মানে ঘা লাগে।

অথচ ওই মা ই গোড়ায় গোড়ায় গাড়ি আসা দেখে গজগজ করেছে। বলেছে, কিসের সুবাদে এত মাখামাখি করতে যাবে আমার মেয়ে! ও তো' আমার কুমারী মেয়ে! ওকে আমি আবার বিয়ে দেব!

যখন বলেছে তখন অবশ্য মনে হয়েছে দেব বিয়ে। কত ধানে কত চাল—এ বোধটা তখন নেই কমলা চক্রবর্তীর!

কিন্তু ক্রমেই যেন পরিস্থিতির বদল ঘটছে। নরম হয়ে যাচ্ছে কমলা। ক্রমেই যেন তার মনে হচ্ছে, ওঁরা যে এখনো পম্পাকে বউ বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এটা পম্পার পরম ভাগ্য।

আর পম্পা? পম্পা মনে মনে উচ্চারণ করে, কেন যাব আমি? কেন? কেন?

কিন্তু আবার ফর্সা জামাকাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠেও বসে। প্রথম প্রথম পম্পা সাদা শাড়ি পরে যেত পূর্ণিমাই বলে বলে ছাড়িয়েছেন। বলেছেন, তোমার জন্যে কত শাড়ি নিজে হাতে করে পছন্দ করে কিনেছিলাম মা! পরবে মা—সেসব পরবে!

পরার ব্যাপারে অবশ্য যতটা সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছেন তিনি, খাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য তা নয়। সেখানে সাত্ত্বিক ব্যবস্থা। বেচারী পম্পার আরো

যন্ত্রণা খাওয়ার পাতে দুধ ঘি ক্ষীর দই মাখন পায়েসের প্রাচুর্যে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করা কমলার একটা রোগ। কী রেঁধেছিল? কী দিয়ে খেলি? তারপর আবার শঙ্কিত দৃষ্টিতে বলে, তা হ্যাঁরে, এখানে যে তোর খাওয়া-ছোঁওয়ার বিচার-টিচার নেই, সেটা ওরা টের পায়নি তো?

পম্পা মা'র এই তুচ্ছতায় ভারী বিরক্ত হয়। তুচ্ছতায় পম্পার যত অরুচি, আর পম্পার মা'র তাতেই তত রুচি।

বিরক্তি না চেপেই বলল পম্পা, তুমি আমার মরা বাবার নামে 'দিব্যি' দিয়ে বসে আছো—তাই টের পায়নি। নইলে প্রথমদিনেই পেতো। এইসব লুকোচুরি আমার বিশ্রী লাগে!

কমলা অপ্রতিভ। কমলা থতমত। লুকোচুরি আবার কী! ওঁরা সেকেলে ধাঁচের মানুষ, অন্যরকম দেখলে হয়ত মনে আঘাত পাবেন, তাই বলা।

তুমি কি ভাবো মা, কখনো কারুর মনে আঘাত না দিয়ে চিরদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়?

কমলা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তাই অন্য ছুতো করে পালায়।

মেয়ে যে বলেছিল, আমি 'না ঘরকা, না ঘাটকা'—সেটা কি মিথ্যে? দু জায়গাতেই যেন কুটুম, সেটা তো ভুল নয়। মেয়েকে কমলার দারুণ ভয়, দারুণ সমীহ। যত কথা কমলার ছেলের সঙ্গে।

জানিস সমু, তোর দিদির শ্বশুর বলেছে, ওর যত ব্যবসাপত্তর আছে, তোর দিদিকে সবকিছুর কর্তা করে দেবে। বলেছে ওঁদের ছেলে বেঁচে থাকলে যেমন-ভাবে দায়িত্ব নিত, ছেলের বউকেই সেভাবে নিতে হবে। চোখে দেখতে না পান, শুনে মুখে মুখে সব শিখিয়ে দিতে তো পারবেন।

সমু বলে, ওঁদের মত ভাল লোক দেখা যায় না, তাই না মা?

তাই তো! কিন্তু আমাদের কপাল! ঘুরেফিরে সেই কপালের কথা!

শুনে দিদির খুব ভাবনা হল বোধ হয়?

ওরে বাবা, তোর দিদিকে কে বলেছে এখুনি! ঝিয়ের হাতে চিঠি দিয়েছিলেন, কত কথাই লিখেছিলেন। চাকরি ছেড়ে দিতে বলে আবার অনেক ব্যবস্থার কথা।

বউমার কাজে ক্রমশ বউমার ভাইটি সাহায্যকারী হতে পারবে। সব কিছুর ম্যানেজার হয়ে থাকতে পারবে। নয় নয় করেও রায়বাড়ির এখনো যা আছে, ঠিকমত চালাতে পারলে অনেক। এইসব। বিধবা বউকে এত মান্য কে দেয়

বল। কথাটা অনায়াসেই বলল কমলা। তার মানে কমলা চক্রবর্তী এখন তার মেয়েকে ‘কুমারী’ না ভেবে ‘বিধবা’ই ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে। কখন থেকে তার মনের এই পালাবদল কে জানে!

*   *   *

পম্পার মা’র সাহস হয়নি। মেয়ের কাছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের ‘সোনার ছবিটি’ মেলে ধরে দেখাবার। ছেলের কাছে সেই অক্ষমতাটি ব্যক্ত করে নিঃশ্বাস ফেলেছে। হৃদয়বান শ্বশুর কমলার হতভাগিনী মেয়েকে তার রাজ্যপাট লিখে দিতে চাইছে, এ কী ভাবা যায়? অথচ সেই অভাবিত ভাগ্যের কথাটি কমলা মেয়ের কাছে ব্যক্ত করে তার সুখের অংশীদার হতে পারছে না।

ছুটির দিনে দরজায় গাড়ি এসে দাঁড়ালেই মেয়ে এত বেজার হয়, দেখলে অবাক লাগে কমলার।

অথচ আবার—হ্যাঁ; অথচ আবার পম্পার নিজেরই অবাক লাগে, শান্তভাবে ফের সে গাড়িতে উঠে বসছে গিয়ে! এবং আরো অবাক লাগে, যখন সেই পরিচিত গাড়িবারান্দাটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে থেমে যায় গাড়িটা। এবং পম্পার ‘রহমান’ পিঠ নুইয়ে নমস্কার জানায়, পম্পার ভিতরের সমস্ত বিদ্রোহ কোথায় হারিয়ে যায়।

পম্পা অভ্যস্ত কথাগুলো শোনে, অভ্যস্ত কথাগুলো বলে, অভ্যস্ত নিয়মে গিয়ে প্রণাম করে সেই দুর্ভাগ্য প্রৌঢ় দম্পতীটিকে। নম্রতা আর বশ্যতার প্রতিমূর্তি এই মেয়েকে দেখলে কে বলবে, একটু আগেও এর ভিতরে তীব্রভাবে পাক খাচ্ছিল সেই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, ‘কেন? কেন আমি এখানে আসতে বাধ্য হব?’

*   *   *

কমলা চক্রবর্তীর সাহস হয়নি। পূর্ণিমা রায়ের হল। কী যেন একটা ছুটির সকালে বউকে আনিয়ে নেওয়ার পর একথা সেকথার মধ্যে বলে উঠলেন, যার ‘সর্বস্ব’ সেই এখনো কুটুমের মত! আজ পর্যন্ত বোধ হয় বউমা পুরো বাড়ি-খানা ভাল করে দেখেওনি! সুশীলাদি, বউকে একবার তিনতলার জিনিসের ঘরটা দেখিয়ে আনো তো!

জিনিসের ঘর! সেই অহেতুক অবান্তর বস্তুর বোঝা! শুনে হৃৎকম্প হল পম্পার। শুকনো মুখে বলল, জিনিসের ঘর আর কী দেখব!

পূর্ণিমা বললেন, তোমাকেই তো এখন থেকে সব দেখতেশুনতে হিসেব রাখতে হবে মা। আমার তো ক্ষমতা গেছে। দোলে আর ঝুলনে কত ঘটা

হত আগে। তার দরুন রুপোর বাসনের গাদা। চাঁদোয়া পর্দা ঝাড়লণ্ঠন, কার্পেট শতরঞ্চি কত কত! দেখ গিয়ে।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তবুও যেতে হল। কিন্তু কেন? কেউ তো তাকে বাধ্য করেনি। এ বাড়ির ইটকাঠে কড়ি-বরগায় বশ্যতার মন্ত্র গাঁথা আছে নাকি?

তিনতলায় নিয়ে গেলেন সুশীলামাসি। পূর্ণিমার পিসতুতো দিদি। চিরদিনের আশ্রিতা। তা আশ্রিতা মহিলা আশ্রিতদের ধর্মটি পালন করলেন।

যে প্রশ্ন পম্পার আর তার পরিবারের মনে নিরুত্তর ছিল, তার উত্তরটি দিলেন মাসি। যে 'রহস্য' রহস্যেই ছিল, তা উদ্‌ঘাটন করলেন।

রহস্য তো ছিলই। কেন উত্তরপাড়ার এই রায়বাড়ির একমাত্র সন্তান রূপের কার্তিক ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজতে গিয়ে বেলেঘাটার এক গরিব পাড়ার, গরিব বিধবা কমলা চক্রবর্তীর খেটেখাওয়া মেয়েটার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, গড়িয়ে পড়েছিলেন। আর আজও—সেই কাঙালপনার ভূমিকাতেই রয়ে গেছেন। এটা রহস্য নয়?

কিন্তু—উত্তরটা যে সুশীলাবালার জানা ছিল, সে কথাটি কি প্রভাতসূর্য আর পূর্ণিমা রায় জানতেন? তাঁদের ধারণা ছিল তাঁরা ছাড়া ত্রিভুবনে আর কারো জানা নয়।

সুশীলামাসির ভাষা প্রাঞ্জল। প্রকাশভঙ্গী সাবলীল। উপস্থাপনার কৌশল অনবদ্য। সিন্দুক থেকে রুপোর বাসনের গাদা বার করে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ বলে উঠলেন, সোনা আর রুপো, বিষয় আর সম্পত্তি, একজনের বিহনে সবই মিথ্যে। বিধবা মেয়েমানুষের আর ভোগ কী? মেয়েটার তো জীবন নষ্ট! তা এ তো ইচ্ছে করেই করা হয়েছে বউমা! জেনে-বুঝে লোকের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া! এখন ওরা যতই তোমার নামে বাড়ি-গাড়ি বিষয়আশয় বিজিনেসের মালিকানা লেখাপড়া করে দিক, তোমার লোকসানটা পুরবে? সোনা চিবোলে, ভাতের খিদে নিবারণ হয়?

পম্পা এই অভূতপূর্ব ভাষা শুনে অবাক হয়ে যায়। পম্পা তার পরম হিতৈষিণী মাসিশাশুড়ীর জটিল-কুটিল মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে বলে, কিসের কথা বলছেন?

কিসের কথা বলছি? হা আমার কপাল। এই সরল শিশুমন, তার সঙ্গে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা। বলি, সর্বসুলক্ষণা মেয়ে তুমি, তোমার কী এই অকালবৈধব্য হবার কথা? এ তো ঘটিয়ে দেওয়া।

পম্পা অবাকের চরমে উঠে বলে, ওঁদের কী দোষ ?

তা বউমা, স্বার্থচিন্তাই দোষ। সুশীলাবালা বিজয়গৌরবের গলায় বলেন, জেনে-শুনেই তো নিরীহ একটা মেয়েকে ধরে এনে তাকে হাড়িকাঠে গলা দিইয়ে কোপ বসালে। এ তো বলিদান দেওয়াই।

পম্পা ক্লান্তভাবে বলল, আপনি কী বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না। আর এসব দেখতে ভাল লাগছে না। তুলে ফেলুন। আমি নিচে যাই।

তা যাবে তো বটেই। ওরা তো তোমায় এখন আষ্টেপিষ্টে বাঁধবার তাল করছে। ভাবছে কেউ কিচ্ছু জানে না। এই সুশীলা বামনীর অজানা কিছু আছে সংসারে ? গোড়া থেকেই বলি তবে—না বলা না কওয়া, হুট করে একদিন হরিদ্বার না ঋষিকেশ থেকে মায়ের গুরুদেব এসে হাজির। আর ছেলের পানে তাকিয়েই বলে উঠল, সব্বোনাশ ! এ যে সামনেই নিদারুণ ফাঁড়া। এই জন্যেই বুঝি ঠাকুর আমায় এখানে এনে ফেললেন।…কথা শুনে তো সব ভির্মি যায়। অবিশ্যি ছেলের কানে তোলেনি। কারোর কানেই তোলেনি। তবে আমার কথা আলাদা। আমার কান বাতাসে হাঁটে। তা যাগযজ্ঞ শান্তি-স্বস্তেনের কসুর হল না। অন্য ছুতো দেখাল। তবু গুরু বলল, আশা দেখছি না। একেবারে মোক্ষম যোগ। মা-বাপেরও তো কুষ্ঠিতে জোর দেখছি না। শেষ ভরসা এই, যদি তেমন এয়োতের জোরওলা মেয়ে পাওয়া যায়, তো তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ফেললে, তার জোরে হয়তো কাটাতে পারে ফাঁড়া। মেয়ে খোঁজ কুষ্ঠি দেখ, যদি কোনো মেয়ের কুষ্ঠিতে 'সাবিত্রী' যোগ দেখ তো কালো সোন্দর বেছ না। এই শ্রাবণের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে ফেল। তবে সব চুপিচাপি। যেন পাঁচকান না হয়।

পম্পা এই রূপকথার গল্পের সামনে আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থাকে। পম্পার কাছে এ একটা অজানা জগৎ।

মাসি বলে চলেন, তৎক্ষণাৎ তুমুল তোড়জোড়। চক্ষের নিমেষে দুশো পাঁচশো মেয়ের ফটো আর কুষ্ঠি এসে পড়ল। পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত ঘটক-ঘটকী ছুটল। তা শেষমেষ এই তোমার ছবি আর কুষ্ঠি দেখে গুরু বলল, বোধহয় 'মা' মুখ তুলে চাইলেন। এই মেয়ের সঙ্গে লাগিয়ে দাও বিয়ে। ছেলেটা বোধহয় বেঁচে গেল ! এই মেয়ের রয়েছে 'সাবিত্রী যোগ'।

পম্পার হতভম্ব মুখ থেকে অজ্ঞাতসারে উচ্চারিত হয়, সাবিত্রী যোগ' !

হ্যাঁ গো, যে যোগে বৈধব্যর দুয়োরে কাঁটা। ব্যাস, লেগে গেল ধুন্ধুমার

ঘটা। আহ্লাদের বান। যেন মরাছেলে প্রাণ পেয়ে চোখ মেলেছে। তা শেষরক্ষে হল ?

মাসির চোখে মুখে যেন বিজয়গৌরব। কথাতেই বলে, যাগযজ্ঞ তাকতুক ! যমের কাছে—সবই ফুঁক। যমে যাকে নজর হেনেছে—

হঠাৎ পম্পা সমস্ত আচ্ছন্ন ভাব ঝেড়ে ফেলে বলে ওঠে, আমি এসব বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস কর না ?

না। যা হবার হয়।

তা সেই কথাই তো আমিও বলছি গো। যা হবার তা হলোই। হতোই। শুধু শুধু নিজের স্বার্থে একটা পরের মেয়েকে ধরে এনে বলিদান দেওয়া।

মহিলাকে খুব খারাপ লাগছে পম্পার।

বিরক্ত ভাব না চেপেই বলে, একথার কোনো মানে হয় না। ওঁদেরও তো যথেষ্ট হল। মারাও যেতে পারতেন। এসব ওঁদের দোষে হয়েছে ?

মরতে পারতেন না বউমা। ওইখানেই তো ভগবানের কলকাঠি। যে যার কর্মফল ভুগবে।

পম্পা রাগের গলায় বলে, তবে তো সেটা আমার ব্যাপারেও খাটে। এত সব বলছেন কেন ?

ওমা ! মাসি মুখ কালো করে বলেন, যার জন্যে করলুম চুরি, সেই বলছে চোর। কটাকট করে খোলা দেরাজ, আলমারি, সিন্দুক, বাক্সয় চাবি লাগাতে থাকেন সুশীলাবালা। তার হতাশা আর আক্রোশের রেখায় কদর্য হয়ে ওঠা মুখটার দিকে তাকিয়ে পম্পার মনে হয়, নির্ঘাত এসব বুড়ার বানানো গল্প ! 'কান ভাঙানো' না কী যেন একটা কথা আছে, বোধহয় তাই।

মহিলাটিকে খুব খারাপ লাগল পম্পার, তার বিবৃত কাহিনীটা স্রেফ বানানো মনে হল, তবু—হ্যাঁ আশ্চর্যের কথা, তবু পম্পার কবে যেন 'কালীঘাট'র মন্দির চাতালে দেখা একটা দৃশ্য চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

একটা রক্তাক্ত হাড়িকাঠ। একটা নিরীহ ছাগশিশু। আর এক খাঁড়াধারী। জোর করে দৃশ্যটা সরাতে চেষ্টা করে পম্পা। ভাবে ছি ছি, আমি এইসব কুসংস্কারে ভরা কথাগুলো বিশ্বাস করে মরেছি নাকি ? সংসারে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই রকম অনিষ্টকারীই হয়।

তথাপি—

তথাপি যখন কালো চশমা পরা একটি মুখের সামনে এসে বসল, পম্পার মনে হল ওই চশমার আড়ালের মুখটা খুব স্বার্থপর। এবং শীর্ণহাতে একগোছা ঢলঢলে আর ভারীভুরি সোনার চুড়ির গোছ', রোগা মুখে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ মহিলাটিকে হঠাৎ অভিনেত্রী মনে হল। স্নেহের অভিব্যক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন! আসলে তো সত্যি স্বার্থই।

আবার লজ্জাও পেল। ধ্যেৎ কী ভাবছি আমি।

পম্পা যখন নিচে নেমে এল, এঁরা তখন নিজেদের পবিকল্পনা আর বক্তব্যটি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছেন।

হয়তো আজই এই প্রস্তাব না এসে পড়লে পরিস্থিতির চেহারা অন্যরকম হত। হয়তো তাহলে যেমন চলছিল তেমনিই চলতে থাকত।

পম্পা যেমন একটা অর্থহীন ছন্দে আবর্তিত হয়ে চলেছে, তেমনি চলত, রত্নাকর মল্লিক নামেব লোকটা পম্পার গাড়ির দিকে ঈর্ষা বিরক্তি আর আক্রোশের দৃষ্টিতে যেমন তাকায়, তেমনি তাকিয়ে দেখত! আব বলত, নাঃ, এব একটা বিহিত না কবলেই নয়।

কিন্তু আজই প্রস্তাবটা এল। যখন পম্পা সুশীলাবালা নামের মহিলাটির সমস্ত কথা 'বানানো' আর 'কুসংস্কাব' বলে নস্যাৎ করে দিয়েও, বারে বারে কালীঘাটেব মন্দিরেব চাতালের একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল, তখনই ওঁরা বলে উঠলেন, এই কাগজপত্রগুলো একটু দেখতে হবে মা।

কালো চশমা, একটু হাসির মত করে বললেন, তুমি তো আব তোমার শাশুড়ীর মত ইংরিজি অক্ষর দেখে ভয় পাবে না? পড়ে দেখ, তারপব—

সবটা পড়ে দেখার ধৈর্য হয়নি। একটু চোখ বুলোনো মাত্রই হঠাৎ এ বাড়িব ইটকাঠ পরিবরগা তাদের নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রটা হারিয়ে ফেলল। পম্পা ওই দৃষ্টিহীন চোখের দিকেই বিদ্রোহের দৃষ্টি হেনে বলে উঠল, এসব কী? আইনত আমিই আপনাদেব এই রায়বাড়ির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী? তাই—কেন? কী জন্যে? আমি কে?

এ কী বলছ বউমা?

অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান দুটো মানুষই একসঙ্গে বলে উঠল, তুমি ছাড়া আর কে? তুমিই তো সব। তুমি ছাড়া আর কে আছে আমাদের? আইনত, ধর্মতও সবই তোমাব।

ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! পম্পাকে বন্দী করে ফেলবার পরিকল্পিত সুকৌশল

ষড়যন্ত্র। পম্পাকে এরা চিরজীবনের জন্যে এদের জিনিসের ঘরের জিনিসের মত সিন্দুকে পুরে ফেলে চাবি বন্ধ করে রেখে দেবার মতলব আঁটছে।

পম্পাকে অতঃপর সারাজীবন সেই ফুলের মালা গলায় দেওয়া ছবিঝোলানো ঘরে রাত কাটিয়ে চলতে হবে। পম্পাকে বিশাল এক বস্তুপুঞ্জের জঞ্জালের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। অথচ কোনো কারণ নেই আইনত কথাটা মিথ্যে! সম্পূর্ণ মিথ্যে!

পম্পার চোখের সামনে একখানা সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ ভেসে উঠল। সে মুখের রেখায় রেখায় একটি নীরব প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশার ছাপ! যে মুখটা নিজে যতটা কথা বলে, তার থেকে বেশি বলায় সেই একজোড়া পুরু কাঁচের চশমা ঢাকা চোখকে দিয়ে। সেই চোখ যেন পম্পাকে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখে প্রতীক্ষা করছে, 'কখন পম্পার সময় হবে'।

পম্পা মনেপ্রাণে তো তার কাছে পৌঁছে গিয়ে বসেই আছে, শুধু এই এক অর্থহীন জটিলতার পাক তাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে দিচ্ছে না। পম্পা রাতদিন ভাবছে কী করে এই জটিলতার জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

পম্পাকে একাই লড়তে হবে। তার মা, ভাই, মামা, কেউই আর এখন পম্পার পক্ষে থাকবে না, সেটা অবধারিত। কিছুদিন আগেই যারা বলেছিল, 'এ বাড়িতে আর কিসের সুবাদে আসবে ও? ঐ তো আমাদের কুমারী মেয়ে।' তারা বদলে গেছে। তারা এখন পম্পাকে এই রায়বাড়ির বিধবা বউ ভাবতে শুরু করেছে।

তবে? লড়াইটা তো তাহলে পম্পার একার।

কিন্তু সত্যি, আসলে পম্পা কী? কুমারী না বিধবা?

পম্পার যেন কেমন গুলিয়ে যায় মাঝে মাঝে, আর তখন পম্পার নিজেকে ভারী অসহায় মনে হয়। তখন পম্পার যাকে দেখলে, রাগ দুঃখ অভিমান জালা কিছুই দাঁড়াতে পায় না, তার উপর ভারী রাগ হয়। বসে বসে প্রতীক্ষার প্রহর গুনবে কেন তুমি? লুঠ করে নিয়ে যেতে পারো না? মুক্ত করে দিতে পারো না পম্পাকে এই জটিল জাল থেকে?

সেই রাগটাই বুঝি এখন আছড়ে পড়ল, এক অশক্ত প্রৌঢ় দম্পতির ওপর। অথচ কিছু আগেও কি ভাবতে পেরেছে পম্পা এঁদের মুখের ওপর বলে ওঠা যায়, ধর্মটর্ম বুঝি না আমি। আইনের কথাই হোক। বলুন কেন আমিই এ বাড়ির সব? যেখানে বিয়েটাই আদৌ হয়েছিল কিনা সন্দেহ!

কী হল ? ভূত দেখলি নাকি ?

আহা! ভূত দেখা আবার কী। এই মাত্তর ভদ্রলোককে দিদি বাড়ি নেই বলে ভাগিয়ে দিলাম, আর তুমি—

পম্পার সমস্ত শরীর অবশ লাগল।

কাকে ভাগিয়ে দিয়েছে সমু, তা বুঝতে একটুও দেরি হল না পম্পাব। নিথর গলায় বলল, কোন্ ভদ্রলোককে আবার ভাগালি ?

তোমার অফিসের মল্লিক বলে আছে কেউ ?

পম্পা হ্যাঁসূচক ঘাড নাডল।

সেই তিনিই। বললেন, মল্লিক বললেই বুঝতে পারবে তোমার দিদি! ভারী মজার কথাবার্তা ভদ্রলোকের। আর কী জলি। বলেন কী, অ্যাঁ! আজও ? ছুটি পেলেই শ্বশুরবাড়ি ছুটবে ? নাঃ! এ মেয়ের আর উদ্ধার নেই! তা আমি তোমার লজ্জা কমাতে বললাম, সক্কালবেলায় গাড়িকাড়ি পাঠিয়ে দেয়—কী বা করবে ? াহহি করে হেসে বললেন, তা সত্যি কী আর করবে বেচারা। নাচতে নাচতে ছুটতেই হবে। বুঝলে হে সমু, কাউকে কজা করে ফেলতে একখানি ভালমত গাড়িই হচ্ছে বেস্ট কলকাঠি। এমন মজার লোক! ইস্! আর একটু আগে যদি আসতে দিদি। এই তো বাস পর্যন্ত পৌছে দিয়েই সোজা আসছি। বেরোচ্ছ কোথায় ? এখুনি এলে ?

এমনি!

বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল সমু।

তার মানে সেও তার দিদির মাথায় একখানি থানইট বসিয়ে চলে গেল। হঠাৎ তাই মনে হচ্ছে পম্পার। সমু যেন তার মাথায় ধাঁই করে একটা ইট বসাল।

রত্নাকর। এ কী অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা তোমার। একদিনের জন্যেও তো তুমি আমার কাছে আসনি। আজই আসতে ইচ্ছে হল ? রত্নাকর, গতকালও তো তুমি বলে ওঠনি, পম্পা, কাল আমি তোমার কাছে যাব। তুমি কেন এসেছিলে বলে গেলে না। একটু লিখে দিয়ে গেলেও পারতে ? রত্নাকর! তুমি বলে গেছ এ মেয়ের আর উদ্ধার নেই। অথচ—তুমি যদি আর একটু পরে আসতে কিংবা আর একটুক্ষণ থাকতে, তাহলে আমি বলে উঠতে পারতাম—রত্নাকর, বেচারী মেয়েটা নিজেই নিজেকে উদ্ধার করে নিয়েছে। তুমি জান না কাজটা কী দুরূহ, কী কঠিন। তবু আমি—ওঃ। আর এই খবরটা তোমায় দেবার জন্যে আমায়

অনেক অনেকগুলো ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ভয়ানক একটা লোকসানের দুঃখে প্রাণটা হাহাকার করে উঠছে। কী কথা বলতে তুমি রত্নাকর? কোন্ কথা বলতে চলে এসেছিলে এতটা দূর? উঃ তুমি কেন অনেকক্ষণ আগে এসে ফিরে গেলে না রত্নাকর? কেন, এইমাত্র এখান থেকে চলে গেলে? তুমি যদি বিশেষ কোন সেন্ট ব্যবহার করতে, তাহলে হয়ত এখনো এখানের বাতাসে সেই সৌরভ ভেসে বেড়াত।

পম্পার মধ্যে এমন সেন্টিমেন্ট! আশ্চর্য! মনের মধ্যেটা যে কী বিচিত্র।

কিছুটা দূরে একটা পার্কের মত ব্যাপার আছে। যাকে একদা ঘটা করে নাম দেওয়া হয়েছিল চিলড্রেনস পার্ক। পম্পা সেখানে এসে রেলিঙ ভাঙা মরচেধরা লোহার বেঞ্চে বসল। পম্পা অনুপস্থিত লোকটার সঙ্গে কথা চালিয়ে চলল। আর যে হঠাৎই আবিষ্কার করে ফেলল, এখনকার এই লোকসানের হাহাকারে, কিছুক্ষণ আগের একটা মস্ত হাহাকারের ভার যেন লঘু হয়ে গেছে। যে মুক্তিটা পম্পার বুকের ওপর জাঁতার মত চেপে বসেছিল, পম্পাকে যেন ধিক্কার দিচ্ছিল, যন্ত্রণা দিচ্ছিল, লজ্জা দিচ্ছিল, মুক্তিটাকে মুক্তি বলে অনুভব করতে দিচ্ছিল না, সেটা তার জাঁতার ভার নিয়ে সরে যাচ্ছে। সত্যিকার মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে পম্পা।

অপরাধবোধমুক্ত পম্পা এখন ভাবতে পারছে, আমিও তো একটা রক্তমাংসর মানুষ!

হয়ত এমনিই হয়। একটা ক্ষতির ওপর আরও একটা ক্ষতির ভার এসে পড়লে, আগেরটা তুচ্ছ হয়ে যায়। এখন এই ক্ষতিটাই প্রধান হয়ে উঠছে পম্পার কাছে, সেই পরশু বেলা দশটার আগে আর দেখা হচ্ছে না ওর সঙ্গে। কালও তো ছুটি!

ওঃ। যদি আমি পালিয়ে আসতে না পারতাম, কালকেও আমায় সেই এক স্বাচ্ছন্দ্যহীন নিরানন্দ অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে থাকতে হত। ভাবল পম্পা, আমার দুঃসাহস আমায় রক্ষা করেছে।

এখন আর সেই মরচে-ধরে-আসা উঁচু-গেট-দেওয়া বিশাল বাগানঘেরা, পুরনো পুরনো মস্ত বাড়িখানা পম্পার দিকে বিষণ্ণ অভিমানের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকছে না মৌন একটু ধিক্কারের বাণী বহন করে। এখন মনে হচ্ছে ভাগ্যিস, খুব জোর পালিয়ে আসা হয়েছে! খুব জোর বেঁচে যাওয়া হয়েছে।

* * *

কমলা তার একান্ত সচিব ছেলেকে ডেকে চুপি চুপি বলল, তোর দিদির যে কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হুট করে চলে এল। ঝিটা বলল, 'শরীর খারাপ—' অথচ ও বলল শরীর খারাপ হতে যাবে কেন ? চিরকালের মতন চলে এলাম। আবার এসেই কোথায় চলে গেল।

সমু বলল, কোথায় আর যাবে ? ওই চিলড্রেন্স পার্কের দিকে গেল মনে হল।

ওখানে কী ?

কী আবার ? সমু বলল, একা একা বসে থাকবে একটু।

ভাবটা ঠিক বুঝছি না। ওদের সঙ্গে কি মনোমালিন্য করে এল ?

হতে পারে। সমু তার নতুন অভ্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে হাতের মাস্‌ল্ ফোলাতে ফোলাতে মুচকি হেসে বলল, দিদি আবার একখানা বিয়ে করবার তাল করছে মনে হয়।

কী ? কী বললি ?

বারো ক্লাসের ছাত্র সমু তার ধাড়িধাড়ি বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিশে তাদের ভাষাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া মা তো তার 'ফ্রেণ্ড'। তাই অবলীলায় বলে উঠল, দেখে নিও। যা একখানা মারকাটারি বন্ধু জুটিয়েছে।

বন্ধু ! কোথায় পাচ্ছে বন্ধু ?

অফিসেরই হবে। দেখা করতে এসে দিদি নেই দেখে মনখারাপ করে চলে গেল !

আমি জানতাম। একদিন এই সর্বনাশই হবে, টের পাচ্ছিলাম। যা মন-মেজাজ মেয়ের। উঃ। নির্বোধের ঢেঁকি। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারতে বসলো !

কমলার মাথা চাপড়াতে ইচ্ছে করছে। চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

সমু মাস্‌ল্ ফোলাতে ফোলাতে বলল, আমারই অসুবিধে। বন্ধুদের কাছে লজ্জা করবে। ওরা বলবে এ মা। তোর দিদি এই।

এখন পম্পার জন্যে এই পৃথিবী।

বেশ কিছুক্ষণ পরে চলে এল পম্পা। কিন্তু এতক্ষণ ধরে অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পেরে উঠল না, পরন্তু দেখা হওয়া মাত্রই বলে উঠবে কিনা, বেশ বুঝে বুঝে অভাগার বাড়ি বেড়াতে যাওয়া হল। অথবা 'ভুলে যাওয়ার' ভান করবে। যেন ব্যাপারটা কিছুই না। সে যদি প্রসঙ্গটা তোলে, বলে উঠবে, ও হ্যাঁ ভাই বলছিল বটে সেদিন। এটাই বোধহয় ঠিক হবে। প্রেস্টিজটা থাকবে।

* * *

কিন্তু পম্পার 'প্রেস্টিজটা' আর বজায় থাকল না। রত্নাকর সে প্রসঙ্গে গেল না। রত্নাকর পরের দিন—দেখা হওয়া মাত্রই বলে উঠল, চাকরিটা ছেড়েই দিন না মিসেস রায়। কেন আর অফিসের একখানা চেয়ার দখল করে বসে থেকে কোনো একটা অভাগা বেকারের অন্ন মারছেন ?

পম্পা চোখ তুলে তাকাল।

পম্পা তার দুদিন ধরে সাজিয়ে তোলা সমস্ত কথাগুলো ভুলে গেল। আর নিয়ত যা হয়, তাই হল। আজ হয়তো বেশিই হল। লোকটাকে দেখলেই তার মনের সব ভার যেন হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় কোথায় উড়ে যায়, লোকটার গলার স্বর শুনলেই পম্পার মুখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি খেলে যায়, আর লোকটার পুরু চশমার কাচের ওপার থেকে তাকানো গভীর দৃষ্টি (যেটা তার অন্য ভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খায় না) দেখলে পম্পার যেন একটা ভয়ের অনুভূতিতে চেতনা অবশ হয়ে আসে।

এর সবগুলোই হল।

আবার তৎসত্ত্বেও পম্পা যেমন কথার সুরে আর ভাবে একটা হালকা চাল এনে, পায়ের তলার মাটি শক্ত করে, তাও করল। ওটাই তো আত্মরক্ষার উপায়। ভারী কথার ওপর ভারী কথা চাপিয়ে চললে, সে কথা কোথায় কোন্ অতলে টেনে নিয়ে যেতে পারে, কে জানে।

পম্পা বলল, জগতে কত লক্ষ অভাগা বেকার, আমি একা আর কজনের দুঃখ ঘোচাতে পারব ?

রত্নাকরের চোখে আবার গভীর সমুদ্রের হাতছানি। যাতে ভয় করে। যাতে বুক কাঁপে।

লক্ষ-লক্ষর যা হয়, হোক, 'একটা' অভাগার প্রতি লক্ষ্য রাখলেও তো তার দুঃখটা ঘোচে।

কিন্তু পম্পা কি সহসা সমুদ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তলিয়ে যাবে ? পম্পার যে আত্মরক্ষার চেষ্টাটাই মজ্জাগত। তাই পম্পা বলে ওঠে, আমাকে কি আপনার খুব 'পরদুঃখকাতর' বলে মনে হয় ?

পাগল! মোটেই না। রত্নাকরের হাসিতে কৌতুক ঝলসায়, ও ব্যাপারের ধারেকাছেও নেই আপনি। তবে হ্যাঁ—একটা সিগারেট বার করে হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বলে, তবে হ্যাঁ, 'দুঃখী' ব্যক্তি যদি গাড়িবান, বাড়িবান, বিত্তবান,

মান্যমান হন তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে অ-কাতরে দুঃখকাতর।

এই ভঙ্গী রত্নাকরের। আর এইটাই পম্পার কাছে পরম আকর্ষণীয়।

বড় সাধারণ বাড়িতে জন্মেছিল পম্পা, মায়ের কথাবার্তা এতই ভোঁতা আর তুচ্ছ যে, পম্পার দুঃখ হয়। বাবাও ছিল বড় সাদামাঠা আর মাঠো। কথাও যে একটা 'শিল্প', সাধারণ কথার মধ্যেও যে মাধুর্যরস পরিবেশন করা যায়, একথা পম্পার জানা ছিল না।

পম্পার ভাগ্যচক্র পম্পাকে যেখানে ঠেলে দিয়েছিল—সেখানে 'কথার' চাষ বিস্তর, কিন্তু সে চাষ তো বেনোঘাসের। যে দুটি সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে কিছু প্রত্যাশা থাকতে পারতো, তাঁদের তো পম্পা আস্ত অবস্থায় দেখেনি। অতএব সেখানেও কেবলমাত্র ভোঁতা কথার কারবার।

তাই পম্পা এখানে এত আকর্ষিত।

পম্পা প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল ওর বাকভঙ্গীর।

পম্পাও বুঝি ওর সংস্পর্শে এসে বুঝে ফেলতে শিখেছে কথাও একটা শিল্প। পম্পা হেসে ফেলে বলল, হায় রত্নাকর! কবে আপনার 'বাল্মীকিত্বে' প্রমোশন হবে?

রত্নাকর চকিত হল। রত্নাকর যেন অকস্মাৎ চলার পথে মানিক কুড়িয়ে পেল। তাই সাহসী হল। বলে উঠল, দেবীর বরলাভের আগে আর আশা কোথায়? হতভাগ্য রত্নাকরকে দস্যুর ভূমিকাতেই থেকে যেতে হবে। নসিব!

ওই মুখের দিকে তাকিয়ে বরাবরের সাবধানী পম্পা হঠাৎ সাবধানতা ভুলল। পম্পা একটা পিছলপথে পা দিয়ে বসল, যে পথটা নদীর দিকে ঢালু। অথচ পম্পা এক মিনিট আগেও ভাবেনি, এমন অসতর্কতা করে বসবে। বলে ফেলল, দস্যুর ভূমিকাতেই বা বীরত্ব দেখাতে পারলেন কোথায়? সেখানে তো স্রেফ ফেলিওর।

আর একবার চমকালো রত্নাকর। ওর একেবারে কাছাকাছি চলে এল। স্বভাব ছাড়া আবেগের গলায় বলে উঠল, পম্পা! আজ আর কাজ নয়। ফাইল-পত্র সব ফেলে দিয়ে চল বেরিয়ে পড়ি।

বেরিয়ে পড়ি! কোথায়?

চুলোয়! জাহান্নমে! স্বর্গে! বেহেস্তে! যেখানে হোক।

পম্পা কাঁপা গলাকে টাইট দিয়ে চাপা গলায় বলল, দস্যু মশাই, ধারেকাছে যারা আছে, ঘুরছে, তারা কেউই কিন্তু 'কানা কালা' নয়।

কেয়ার করি না। ওঠো! ওঠো!

কী ছেলেমানুষী হচ্ছে?

দোহাই তোমার একদিন অন্তত ছেলেমানুষী করতে দাও। বেরিয়ে এসো তোমার মিসেস রায়ের খোলস থেকে।

পম্পা আস্তে বলল, বেরিয়েই তো এসেছি।

কিন্তু না, না, একসঙ্গে না। আমি আগে চলে যাচ্ছি। মিস ঘোষালকে বলে যাচ্ছি।

কী বলবে?

বলব যা হোক।

সত্যিই ফাইলপত্র গুটিয়ে রেখে, 'বিশেষ একটু দরকার আছে' বলে নেমে গেল পম্পা। সেও তো পারছিল না স্থির হয়ে থাকতে।

রত্নাকর রাধামোহনের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, হাত তুলে বলে উঠল, রায়-চৌধুরী, কাট মারছি! একটু ম্যানেজ করে নেবেন। বাজারে জোর গুজব রাজ্য লটারীর ফার্স্ট প্রাইজটা নাকি আমার নাম্বারে উঠেছে।

ঝোড়ো বাতাসের বেগে বেরিয়ে গেল। নেমে দেখল পম্পা ইতিমধ্যেই একটা ট্যাক্সি ধরেছে। কাছে চলে এসে নিচু গলায় বলল, উঃ। কী শার্প ব্রেন! ঠিক এই সময় এই জিনিসটিরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তোমাকে নিয়ে কী করতে ইচ্ছে হচ্ছে জানো? লোফালুফি! গাড়িতে উঠে বসল। বলল, পম্পা! আমরা কী মুখ্যু! জীবনের কতগুলো দিন নষ্ট করলাম!

পম্পা বলল, এমনও হতে পারে আমরা দারুণ বুদ্ধিমান। দিনগুলোকে বেহিসেবি খরচ করে না ফেলে ব্যাঙ্কে জমা করেছি!

হয়ত তাই। কিন্তু আর নয়। এবার উড়নচণ্ডী হয়ে যাই। চলো দুজনে রেজিস্ট্রেশন অফিস, নোটিশটা দিয়ে আসি।

পম্পার হেসে ফেলা ছাড়া গতি হয় না।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, হা ভগবান! আমি কি শেষে এক পাগলের পাল্লায় পড়লাম?

এতে পাগলের কী হল? জানো, অন্তত এক মাস আগে নোটিশ দিতে হয়। আর—কোনো মালিকহীন সাবালক মিসেসকে বিয়ে করতে কোনো অবজেকশন উঠতে পারে না।

কিন্তু গার্জেনদের—না, না, এক্ষুনি হয়ত 'গার্জেন' কথাটায় আপত্তি তুলবে তুমি। বলবে 'আমরা সাবালক'। তাই গার্জেন না বলে গুরুজনই বলি। গুরুজনদের একবার না জানিয়েই এসব করতে আছে?

ঠিক! ওঃ। সাধে বলেছি ব্রেন কী শার্প। যখন যেটি দরকার ঠিক মনে পড়বে। যাক বাবা! বাঁচা গেল। আমিও আমার দাদার মত বাকি জীবনটা বসে খেতে পাব! বলো আগে তোমাদের বাড়ি, না আগে আমাদের বাড়ি?

আগে তোমাদের।

পম্পা যা করছে, যা বলছে, সে সব কি সে নিজে করছে? পম্পা কি তার নিজস্ব সত্তার মধ্যে আটকে আছে? না দুর্নিবার নিয়তির এক প্রবল টান দুরন্ত বন্যার টানের মত পম্পাকে টেনে নিয়ে চলেছে, এক অনিবার্যতার দিকে!

কিছুক্ষণ আগেও কি পম্পা ভাবতে পারতো সে এইভাবে অফিসের কাজ ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়ে বেহেডের মত ট্যাক্সির মধ্যে রত্নাকরের কাঁধে মাথা রেখে বলে উঠবে, দস্যু! দস্যুই! নামটা কে রেখেছিল?

আঃ! নিজেকে ছেড়ে দিতে পারায় কী সুখ! কী নিশ্চিন্ততা! পম্পার ভাগ্যে তোলা ছিল এই সুখ? অবিরত নিজেকে আটকে আটকে চলতে চলতে ক্রমশঃই ভেবে নিয়েছিল পম্পা এটাই তার জীবন। এই শ্যাওলাধরা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে অবিরত শ্যাওলার নীচের মাটিতে পা পুঁতে রাখবার চেষ্টা করে চলা!

নদীতে নেমে পড়ে অবগাহনের সুখ, পম্পার জন্য নয়।

হঠাৎ একটা মুহূর্তের কারসাজি।

কী থেকে কী হয়ে গেল।

পম্পা নিজেব আচরণে অবাক হতেও ভুলে গেল। পম্পা দেখল, কখন নদীর ঢেউ উঠে এসে তাকে গ্রাস করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

এ কী গত দুদিনের একটা বুকচাপা দমবন্ধ করা পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া? এই দুটো দিন কী অদ্ভুত ব্যবহার করেছে নিরীহ কমলা চক্রবর্তী তার মেয়ের সঙ্গে! কী ব্যবহার করেছে তার ছেলে, বয়েসে অনেকটা বড় দিদির সঙ্গে!

পম্পা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে পাশের ঘরে মা ছেলের আলোচনা! শুনতে তো পাবেই দু'ঘরের মাঝখানে তো মাত্র পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের ব্যবধান।

কে বললে? কে আবার বলতে আসবে? এই সমু চক্কোত্তিকে কারুর কিছু বলতে হয় না! আমি ভদ্রলোককে দেখেই বুঝে ফেলেছি, দিদির সঙ্গে আছে 'কিছু ব্যাপার'!

বুঝেছি! তাই ওঁদের শত সাধ্যসাধনাতেও চাকরিটি ছাড়ার কথা গায়ে মাখা হয় না।

কমলার স্বর হিংস্র! যে হিংস্রতা আসে আশাভঙ্গে। বড় যত্নে একটি

চারাগাছকে লালন করে করে প্রায় ফলবতী হবার টাইমে পৌঁছে যাচ্ছিল, সেই গাছটাকে কিনা সমূলে উপড়ে ফেলল, লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে। এতোদিন পরে, সেই ভালমানুষ দুটো শোকাতাপা মানুষের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে, তুই ড্যাংডেঙিয়ে আবার বিয়েয় বসতে যাবি? লজ্জা হোল না তোর? ঘেন্না হোল না? বলি একবার ভাবলি না, দু'দুটো সংসারের মুখে চুনকালি পড়বে এতে?

মনের মধ্যে অনবরত এই গজরানি, অথচ মুখে তালাচাবি। মেয়ের ভাত বেড়ে দিয়ে কাজের মেয়েটাকে দিয়ে জানিয়ে দিল, ভাত দেওয়া হয়েছে।

পম্পা অবশ্য সেটা বুঝতে পারার কোনো চিহ্ন না দেখিয়ে খুব সহজ স্বাভাবিক ভাবে খেতে বসল, এবং খেয়েই নিল। আজ তো ছুটির দিনই ছিল, সমুর সঙ্গে একসঙ্গেই খেতে বসার কথা পম্পার। দেখা গেল সমুর ভাত পড়ে থাকে, তার আর চুল আঁচড়ানো শেষ হয় না। শেষ হয় না সাবানকাচা ভিজে জামাপ্যান্টকে তরিবৎ করে শুকোতে দেওয়া।

পম্পা কি বুঝতে পারছিল না, এই দেরিটা ইচ্ছাকৃত? তবু পম্পা বিশ্বাস করতে চাইছিল না। তাই পম্পা কণ্ঠে সহজ ভাব ফুটিয়ে ডাক দিয়েছিল, এই সমু, কত দেরি করছিস?

সমু যেন শুনতে পায়নি।

তাই সমু ঘাড়ে গলায় জোরে জোরে পাউডার ঘষতে বসেছিল তখন। পম্পা খেয়ে উঠে পড়েছিল।

এই ভাবেই চলছে দু'দিন।

কমলা চক্রবর্তীর অবশ্য এমন সাহস হয় নি যে মেয়েকে ডেকে খোলাখুলি প্রশ্ন করে। অথচ এখন মেয়েকে তার বিষ লাগছে। আর দুঃখে লজ্জায় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে উত্তরপাড়ার তাঁদের জন্যে। কী জানি কী বলে এসেছে মুখপোড়া মেয়ে। বলল যে, সব শেষ করে এলাম। কী তার মানে? তবে কি ওদের কাছে বলে এসেছে, 'আমি আবার বিয়ে করব!'

যদিও কমলার ঝুলিতে একমাত্র ওই অকালপক্ক ছেলেটির ভবিষ্যৎবাণীটিই সম্বল, তবু সেটি উড়িয়ে দিতে পারছে না কমলা। কমলার যে তখন তার বেয়াইবাড়ির দাসীর জলদগম্ভীর ভাবটি দেখে বুক কেঁপে গেছে।

ভেবেছিল, 'শরীর খারাপ' বলে বাপেরবাড়ি চলে আসায় তাঁরা বিরক্ত হয়েছেন। হবারই কথা। কিন্তু মেয়ে বলল কিনা 'শরীর খারাপ' হতে যাবে কেন?

কমলা মনে মনে নিজের ভাষায় কথা বলে চলেছে, তা'হলে তুমি কী ভেবেছ

পম্পারাণী, মা'র বুকে বসে বসে তার দাড়ি ওপড়াবে? শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে কেলেঙ্কার করবে? ও আশা ছাড়ো। আমি শক্ত হতে জানি। সমু আছে আমার দলে।

এই মনোভাবের পাথরখানি নিয়ে ঘুরছে কমলা। মেয়ের সঙ্গে কথা নেই বললেই চলে।

এহেন পরিস্থিতিতে দুটো দিন কাটিয়ে এসেছে পম্পা। মা'র নীরব মুখের রেখায় কি তার বক্তব্যগুলি ফুটে ওঠেনি?

সেই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অফিসে এসেছিল আজ।

অথচ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল।

অনায়াসে রত্নাকরের কথার উত্তরে বলে উঠল, আগে তোমাদের বাড়ি।

* * *

রত্নাকরের বউদি খুশিতে উচ্ছ্বসিত হল।

নিঃশব্দে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার জন্যে দেওরকে গঞ্জনা দিল, পম্পাকে কাছে বসিয়ে খুব আদর করে চা মিষ্টি খাওয়ালো, এবং 'শুভস্য শীঘ্রং' এই শাস্ত্রবাক্যটি মনে করিয়ে দিল।

আর তক্ষুনি বিয়ের বাজারের ফর্দ করতে বসল। কিন্তু আড়ালে এসেই সুধাকরকে বলল, আশ্চর্য বাবা! তোমার ভাই আর কনে খুঁজে পেল না? বিধবা হোক তাতে কিছু না। বিদ্যেসাগরের অশরীরী আত্মার আশীর্বাদ পাবে। কিন্তু কী রকম বিধবা জানো? ফুলশয্যা হয়নি। বরকনে নিয়ে ঠাকুরমন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে গাড়ি অ্যাক্সিডেণ্ট।

সুধাকর বলল, তাই নাকি? তাহলে তো 'বিধবা'ই নয়। বলতে গেলে আইবুড়োই।

তা অবশ্য। তবে মনে একটু খটকা লাগছেই। অ্যাক্সিডেণ্টে বর খতম, বিয়েটা সম্পূর্ণ না হতেই বরের বাবা অন্ধ আর পঙ্গু এবং মায়ের হার্ট জখম। অথচ কনে ঠিক রইল। 'পয় অপয়' বলে একটা কথা আছে তো?

সুধাকর বলল, ওটা কোনো কথাই নয়। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়।

জানিও সব, বুঝিও সব। তবু মনে যেন কাঁটা ফুটছে। তবে হ্যাঁ, প্রেমটি জব্বর। ওই মেয়ের শ্বশুরবাড়ি তো নাকি বেশ বড়লোক, বরটা ছিল বাপের একমাত্র সন্তান। কাজেই যথাসর্বস্ব এই বউই পেতে পারতো। তারা নাকি আদরও করতো খুব। সেসব লোভ ছেড়ে চলে এসেছে তো!

উদোমাদা সুধাকর হঠাৎ একটা একদম মেয়েলী কথা বলে বসল। বলল, তার মানে সেই যে বলে যে যার বর, যে যার কনে। প্রথম বিয়েটাই একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট'। খোকাই ওর আসল বর।

মেয়েলী কথাটা বলে ফেলেই একটু লজ্জা পায়। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা মুখের সামনে মেলে ধরে।

ওরা যথেষ্ট সৌজন্য করেছিল, মানে সুধাকররা। কমলা চক্রবর্তী সৌজন্যের ধার দিয়ে গেল না, বলল, 'সুখ' কপালে থাকলে, ওই একবারেই হতে পারতো।

আর পম্পা যখন বলল, ও তোমায় প্রণাম করবে—তখন বলল, থাক থাক। এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি।

পম্পা ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলল, তা একবার দেখবেও তো? না সেই পাপীর মুখই দেখবে না?

আহা, দেখব না বলেছি? তবে এ তো আর 'নাপিতে পুরুতে' বিয়ে নয় যে, কিছু করণকারণ আছে। কাগজেকলমে লেখাপড়া করা বিয়ে। ওসব তো বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপার। আমার জন্যে তো আটকে থাকবে না!

কমলার মন ভেঙে যাচ্ছে মেয়ের দুর্মতিতে। সেই তাদের অত আদর ভালবাসা, অত বিষয়আশয়, সব পায়ে ঠেলে তুমি নতুন একটা বিয়ে করতে নাচছো! গৌরবের তো আর রইল না কিছু।

কমলা চক্রবর্তীর দরজায় আর যখন তখন মস্ত গাড়ি এসে দাঁড়াবে না। কমলা চক্রবর্তীর মেয়েকে মাথার মণি করে নিয়ে যাবে না। কমলা চক্রবর্তীর ঘরে থরে থরে এত উপঢৌকন এসে পড়বে না। যা সে পাড়াপড়শীকে দুহাতে বিলোতে পারে। এরপর লোকের সমালোচনা, আর নিজের মুখ হেঁট। বিধবা মেয়ে বিয়ে করলে কার মুখ উজ্জ্বল থাকে? ত্যাগের বড় আদর্শ আছে? মেয়েমানুষের এত ভোগসুখে লোভ থাকা উচিত নয়।

* * *

রত্নাকর এই দুই পক্ষের গুরুজনের সঠিক মনোভাবের হদিস জানে না। ও জানে ওর দাদা বউদি এতে বেদম খুশি। আর পম্পার মা লাজুক বলেই ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়তে বসতে পারল না। অতএব রত্নাকরের কোনোখানে নেই আনন্দের ঘাটতি। রত্নাকর হাওয়ায় পা ফেলে হাঁটছে। রত্নাকর অপেক্ষার দিনগুলোকে এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে।

তবে পম্পা সকলেরই মনের হদিস পেয়ে গেছে। ওটা মেয়েদের সহজাত!

তবু পম্পারও নেই আনন্দের ঘাটতি। পম্পার দিনরাতগুলো কাটছে অনির্বচনীয় একটি সুখের স্বাদে।

পম্পা তো কোনোদিন জানেনি, প্রেম বস্তুটার স্বাদ কী? পম্পার কোনো-দিন একছিটেও বাল্যপ্রেম, কৈশোর-প্রেমের অভিজ্ঞতা ছিল না। তার জীবনটা বড় সাধারণ ছিল। মা বাবা, ছোট্ট ভাইটি আর স্কুল-কলেজকে কেন্দ্র করেই পম্পার বাল্য-কৈশোরের দিনগুলি কেটেছে। আর নবযৌবনের দিনগুলি কাটছিল প্রাণ-ভেঙে-যাওয়া পিতৃশোক আর সংসারের হাল ধরবার চিন্তায় দিশেহারা অবস্থায়। এই মেয়েটার ওপর বাবার ছিল বড় ভালবাসা আর আশা। মেয়ে বি. এ. পাস করল, না অজিত চক্রবর্তী রাজ্যপদ পেল। তা সে আহ্লাদ আর কদিন ভোগ করতে পেল সে?

বাবা অত তাড়াতাড়ি চলে না গেলে, আমার এম. এ-টা পড়া হতো! এ দুঃখ মর্মে মর্মে বিঁধে আছে পম্পার। সেই পম্পার ওপর হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল চিলের ডানার ঝাপট। পম্পাকে বিধ্বস্ত করে দিল। পম্পা জগৎ সংসারের দিকে তাকাবারই বা সময় পেল কখন?

না, পম্পা কোনদিন জানতে পারেনি, পুরুষের মুগ্ধদৃষ্টি হৃদয়ে কী মোহ বিস্তার করে। পম্পা জানতে পারেনি প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে পারার স্বাদ এমন অনির্বচনীয়

পম্পাকে যখন তাঁতির মাকুর মত, অবিরত উত্তরপাড়া আর অফিসপাড়া, অফিসপাড়া আর পূর্বপাড়ায় আনাগোনা করতে হচ্ছিল, পম্পার ভিতরে প্রত্যাশার দানা বাঁধতে পায়নি। পম্পা স্বপ্ন দেখতেও সাহস পায়নি, সে একটা 'জীবন' পাবে

সেই 'জীবন' এসে তার হাতে ধরা দিচ্ছে।

এই সুখমগ্নতার মধ্যে পম্পার ওপর তেমন তীক্ষ্ণ রেখা বসাতে পারছে না মা'র বরফ-শীতল ব্যবহার, ভাইয়ের অপছন্দর দৃষ্টি। যদিও পম্পা ভাইকে বলেছে যাক, চাকরিটা তো আর ছাড়তে হল না আমায় তুই নিশ্চিন্দি হয়ে পড়াশুনো করবি। যতদিন না তোর কোনো রোজগারপাতি হচ্ছে, আমি .আছিই। তবু সমুর দিদির ওই 'মারকাটারি বন্ধুটার' সঙ্গে বিয়েয় বসাটা আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। নিজেকে কেমন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে।

নিষ্প্রভ তো বটেই। পড়াশোনায় এতই বাজে, যে এমন আশা কোনোদিন করতে পারেনি পম্পা ছোট ভাইটিকে সে 'অনেক বড়' হবার সুযোগ দেবে প্রাণপাত করেও ওকে বাইরে-টাইরে পাঠিয়ে পড়াবে, বাবার আত্মার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারবে। বরং এখন যা নমুনা দেখা যাচ্ছে, পাড়ায় একটা নামকরা

মস্তান হয়ে ওঠা ছাড়া বোধহয় সমুর আর কোনোদিকেই নামটাম করার সম্ভাবনা নেই। তাই সমুর 'অপছন্দ' পম্পাকে বিচলিত করতে পারছে না।

অফিসসুদ্ধ লোকের জানা হয়ে গেছে খবরটা। অনেকেই দেঁতো অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। এখন অতএব 'দুজনে একসঙ্গে' বেরিয়ে পড়ায় লজ্জার আড়ষ্টতা নেই। বেরিয়ে পড়ে কোথায় না কোথায় চলে যায়। অবশ্য কলকাতার মধ্যেই! শুভদিনটি আসার মধ্যে পর পর দুটো ছুটি পড়ল। এ রবিবারের, রত্নাকর বলল, চলো দীঘায় বেড়িয়ে আসি।

পম্পা বলল, নাঃ! একেবারে অধিকারের দাবি নিয়েই তোমার ঘরে প্রবেশ করব।

আহা, আমি তো বলছি না সেখানে গিয়ে তোমায় আমার ঘরে প্রবেশ করতে হবে। না হয় দুটো ঘর বুক করব। তোমার কৌমার্য অটুট অক্ষুণ্ণ থাকবে। গ্যারান্টি।

অসভ্যতা কোরো না বলছি। অন্যেরা বিশ্বাস করবে?

অন্যেরা তো অবিশ্বাস করার জন্যে মুখিয়েই থাকে।

সেই তো। তাই বলছি, তাদের সুযোগ দিতে যাব কেন মরতে? সারাদিন মাঠে চরে রাতের বেলা গোঠে ফেরাই ভাল।

ঠিক আছে। তুমি যা করবে তাই। তাই শিরোধার্য। দুটো 'গোল্‌ডে' মেঠো প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলো।

রাগ করলে?

তোমার ওপর রাগ? নাও নাও প্রোগ্রামটা ঠিক কর।

তা সেই প্রোগ্রামেই ঘোরা হল দু'দিন। সেই চিরপুরাতন জায়গাগুলোই যেন কী নতুন! কী নতুন! মনের মধ্যে ভাবের গুঞ্জরণ, 'আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে। অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে—

কিন্তু মুখে তো আর ওসব প্রকাশ করা চলে না। তাই শুধু কথার স্রোতে ভাসা।

এই জানো, বৌদি সাধ-মিটিয়ে এমন এনতার শাড়ি কিনছে যে আমার কেনবার জন্যে আর কিছুই রাখছে না!

পম্পা একটু কেঁপে ওঠে। তার তো শাড়ির গোনাগুনতি নেই। তারপর ভাবল, সে তো ওদের দেওয়া। আবার ভাবল, যাক ওগুলো সমুর বৌ এসে পরবে।

মুখে বলল, এতো বেশী নিয়ে কী হবে? একসঙ্গে দুটো শাড়ি পরা যায়?

ওরে বাবা! এ তো ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর বাণী। একসঙ্গে দুটো জিনিস ভোগ

করবার ক্ষমতা তো দেননি তার সৃষ্টিকর্তা। তবু মানুষ পকেটের ক্ষমতা থাকলেই দুটো চারটে গাড়ি কেনে, দুটো দশটা বাড়ি বানায়, দুশো পাঁচশো পোশাক বানায়, আর—একটু দুষ্টু হাসি হেসে বলে, আর পাঁচশো সাতশো বেগম ধরে এনে হারেমে পোরে।

তোমার সব কথায় দুষ্টুমি!

বলে আলো, আলো চোখে তাকায় পম্পা।

এই ঔজ্জ্বল্য, এই খোলা আকাশ পম্পার জন্যে তোলা ছিল? ভাবা যায় না! ভাবলে বিশ্বাস হয় না। এই লোকটার সান্নিধ্যে এলেই, আর মনে পড়ে না জীবনে কোনো জটিলতা আছে। কোনো ভয় আছে।

সহজ হওয়ার কী সুখ! নির্ভার হওয়ার কী আরাম!

দিনগুলো যেন পাখির ডানায় ভর করে আকাশে উড়তে চাইছে। টেবিলের ফাইলগুলোকে আর তেমন 'অমোঘ' বলে মনে হচ্ছে না, যেন 'থাকগে যাক, রইলই না হয় কিছু বাকি, আজ তো উঠে পড়া যাক।' বেরিয়ে পড়া যাক।

দু'জনে একসঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে, রাস্তায় নেমে পড়েই পম্পা বলে ওঠে, তোমার সঙ্গে মিশে আমার যে দিন দিন কী অধঃপতন হচ্ছে, তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। ঠিক তোমার মতই টেবিলের ফাইলগুলোকে দু'চক্ষের বিষ লাগছে।

রত্নাকর বলে, খুবই স্বাভাবিক। 'কুসঙ্গের কুফল,' বিশ্ববিশ্রুত।

আমাদের এই একসঙ্গে বেরোনো দেখে অফিসের সবাই কিন্তু মুখটিপে হাসে।

কথাটা সত্যি। হাসে। রাধামোহন কোম্পানী তো সে হাসি লুকোবারও চেষ্টা করে না।

রত্নাকর বলে, আহা হাসুক! হাসুক! হাসতে দাও। মানুষকে আনন্দ দেওয়ার মত পুণ্যকাজ আর নেই!

আচ্ছা এরপরও তো দু'জনে একই অফিসে এসে ঢুকতে হবে? ভেবে কিন্তু ভীষণ লজ্জা করছে।

সর্বনাশ! তবে কী চাও তুমি? এরপর দু'জনে দু'অফিসে ঢুকি?

এই মা! তাই বলেছি? বলছি লজ্জা-লজ্জা করছে।

আমার তো ঠিক উল্টো। ভেবে বেশ গৌরব-গৌরব লাগছে। এমন একখানি 'রত্ন' আমি হতভাগা লুঠে নিচ্ছি।

তা নেবে না? রত্নাকর যে! দস্যু কোথাকার।

এই বেশী বলবে না। হয়তো মেজাজ তুঙ্গে উঠে গিয়ে রাস্তার মধ্যেই দস্যুপনা করতে চাইবে।

আঃ, তুমি যে কী!

আমি যে 'কী', তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য!

* * *

হাঁটতে হাঁটতে চলে এসে যে কোনো লাইনের যে কোনো একটা বাসে উঠে পড়া রত্নাকারের একটা মজা!

পম্পা ব্যস্ত হয়, প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করে, বলে, বাড়ির দিক থেকে একেবারে উল্টোমুখে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু।

রত্নাকর বলে, সেটাই তো মজা!

আবার বলে ওঠে, এই প্রেমে পড়ার পর প্রথম প্রথম কী করণীয় বল তো?

করনীয় মানে?

মানে, ধর গল্পের বইতে যা সব লেখে। কফি হাউস, রেস্টুরেন্ট, বোটানিকস, ডায়মণ্ড হারবার, কাকদ্বীপ, শম্ভু মিত্রিরের নাটক, ফাইন আর্টস, একজিবিশান,— হঠাৎ প্রেমে পড়ার 'প্রথম পাঠ-টাঠ', যা আছে—

পম্পা আলো-আলো মুখে উত্তর দেয়, ওই—ওই সব তোমার প্রেমে পড়া-টড়া কি এই মাত্তরের ঘটনা? কবেই তো পড়ে বসে আছ।

বলছ? টের পেতে তুমি?

পাব না?

রত্নাকর ব্যগ্রভাবে বলে, আর তুমি?

আমি? কী মনে হয়?

যা মনে হয়েছে, তার ওপর বেস্ করেই তো ভবিষ্যতের প্রাসাদ নির্মাণ করে চলছিলাম।

* * *

হয়তো কলকাতার উত্তরাংশে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকেছে, কাগজের ঠোঙায় করে ঝালমুড়িই খাচ্ছে, ঘড়ির কাঁটাকে তেমন আমল দিচ্ছে না, এবং শুধু কথার সুখেই কথা বলে চলেছে।

তবে পম্পার মনের মধ্যে অবশ্য ঘড়ির কাঁটারা কাঁটা বিঁধোচ্ছে, এবং মাঝে-মাঝেই তাগাদা দিচ্ছে সে, কিন্তু রত্নাকর গায়ে মাখছে না সেটা।

আজ গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে, বিয়ের পর মধুচন্দ্র যাপন করে কোথায় যাওয়া হবে।

পম্পা বলল, আমি তো কোথাও যাইনি। আমার পক্ষে সবই নতুন। পুরী, কাশী, বৃন্দাবন যেখানে হোক।

মাই গড্, হনিমুন করতে তুমি কাশী বৃন্দাবন যাবে?

কেন? দোষ কী? তীর্থক্ষেত্র বলেই ওদের জাত গেছে? তাহলে পুরী কেন পরিত্যাজ্য নয়? বেশীর ভাগই তো দেখি বিয়ে হওয়া মাত্রই পুরী ছুটল।

আহা সে তো সমুদ্রের জন্যে। তবে আমি ওতে ভোট দিচ্ছি না। বড্ড বাজার-চলতি হয়ে গেছে।

আর বৃন্দাবন যে চিরপ্রেমের লীলাক্ষেত্র।

তা হোক। হনিমুন করতে কেউ বৃন্দাবন যায় না। রত্নাকর বলে, আমি বলি কি দার্জিলিং।

আহা। সেটা যেন বাজারচলতি নয়। সেও তো দোহাত্তা যাচ্ছে।

তবু দেখো, পাহাড়চূড়ো বলে কথা। তার স্বাদই আলাদা।

তুমি তো বললে গিয়েছ আগে।

সেই যাওয়া, আর এই যাওয়া? নাঃ তুমি আর মানুষ হবে না।

তোমার কপালে এই ছিল। কী আর করবে?

রত্নাকর বলে, সাধের উপযুক্ত সাধ্য থাকলে চলে যেতাম ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। কিন্তু ছুটি আর পকেট দুজনেই চোখ রাঙিয়ে তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা, অত কী? আমরা তো কাছেপিঠে সাঁওতাল পরগণার যে কোনো একটা জায়গায় চলে যেতে পারি? রেলের রিজার্ভেশানের জন্যে টেনশন নেই। দু'মাস আগে থেকে হোটেল বুক করে রাখার দায় নেই—

তাহলে? খাওয়াদাওয়া?

কেন? কোথাও একটা ঘর যোগাড় করে ফেলতে পারলেই তো হয়ে গেল। দু'জনে বেড়াতে গিয়ে বাজার করে আনা, দু'জনে মিলে রান্না করা, এবং দুজনে মিলে সেই সব 'অখাদ্য'দের খেয়ে নেওয়া।

অখাদ্য মানে?

মানে আবার কী? মা কি আমায় কোনোদিন রান্না করতে দিয়েছে?

এই কথা। ওটা কোনো প্রবলেমই নয়। আমি যা ফার্স্টক্লাস ডিম ভাজতে পারি, খেয়ে মোহিত হয়ে যাবে। সত্যি, তোমার আইডিয়াটি যাকে বলে দি আইডিয়া, ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। এক্ষনি থলি নিয়ে বাজার করতে বেরোতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য তোমার হাতেও একটা থলি ধরিয়ে দেওয়া যাবে, না না

তার দরকার নেই, তোমার ওই ঢাউশ হাতব্যাগটিতেই বাজারের অর্ধেকটা উঠে আসতে পারবে। আহা, জামতাড়া শিমুলতলা ঝাঁঝাঁর সস্তাগণ্ডা বাজার!

পম্পা হেসে ওঠে, চমৎকার। 'সস্তাগণ্ডা' বলে বাজারের অর্ধেকটা উঠিয়ে এনে খাবেটা কে?

পম্পা যে এমন খোলাগলায় হেসে উঠতে পারে কে জানতো?

রত্নাকর মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। হাওয়া বদলে খাওয়া বাড়ে।

এই ছিরির গল্প! প্রলাপ বললে প্রলাপ। তবু রাত হয়ে যায়।

লতিকা হেসে হেসে হ্যাওরকে বলে, উঃ, কার্তিক মাসটা গেলে বাঁচি। এমন করে আর বাইরে বাইরে 'প্রেম' করে বেড়াতে হয় না।

রত্নাকর একটু লজ্জা পায়। বলে, নাঃ, তোমায় খুব জ্বালাতন করা হচ্ছে। আসলে কী জানো—

থাক বাবা থাক। আমাকে আর 'আসল' বোঝাতে আসতে হবে না! নিজে 'পড়িনি' বলে কি আর পড়ে-যাওয়াদের দেখিনি? এখন তাড়াতাড়ি খাবেএসো।

কিন্তু পম্পার সমস্যা এত সহজে সমাধান হয় না। পম্পা রাত করে ফিরলে সমু দরজা খুলে দিয়ে বলে ওঠে, বিয়ের জন্যে টাকা জমাতে আজকাল বুঝি ওভার-টাইম খাটছিস দিদি?

আর কমলা চক্রবর্তী বেজার গলায় বলেন, গেরস্থর রুটি-তরকারিটা খাবে? না হোটেলে-মোটেলে 'খানা' খেয়ে এসেছ?

কিন্তু এসব আর গায়ে মাখছে না পম্পা। পম্পা শুধু মনে মনে বলে, আর ক'টা দিন! তারপর তো—

* * *

কিন্তু তারপর?

পম্পার সৃষ্টিকর্তা বোধহয় তার জন্মলগ্ন নির্ধারণকালে বড় বেশী ভারাক্রান্ত ছিলেন। নয়তো ভয়ানক কোনো ক্ষতির যন্ত্রণায় হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন।

নাহলে পম্পার জন্যেই কেন তোলা ছিল এমন অদ্ভুত ঘটনাটা?

বিয়ের তারিখ ঠিক করেছে লতিকা, ছুটি নিল দুজনে দিন পনেরোর জন্যে। ওর মধ্যেই বিয়ে আর মধুচন্দ্র সারতে হবে। আর ছুটি নেওয়ার সুবিধে নেই। তা হোক, ওতেই হবে। একটা অদ্ভুত পুলক নিয়ে বাড়ি ফিরল পম্পা! যদিও কাল থেকে আর অফিসে দেখা হওয়ার সুবিধে নেই। না হোক, পরম প্রাপ্তির

সম্ভাবনার সুখে হৃদয় আচ্ছন্ন।

কিন্তু বাড়ি ঢোকা মাত্রই কমলা চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বলে উঠল, আইনতঃ তো তুমি এখনো উত্তরপাড়ার রায়েদের বৌ? তোমার 'নতুন ব্যবস্থার' কথা বোধহয় টের পায়নি এখনো। তাই 'খবর' একটা দেওয়া উচিত বিবেচনায়, জানিয়ে গেল একজন।

পম্পা মা'র মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল।

খবর! কোন্ খবর! পম্পাকে দেবার মত কোনো খবর মজুত ছিল উত্তর-পাড়ার রায়েদের?

মার মুখেই বা কেন এমন একটা হিংস্র আর চাপা আহ্লাদের ভাব? ওঁরা কি তাহলে পম্পার নতুন 'জীবন' গ্রহণের সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা টের পেয়ে সেটাকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবেন, এই 'খবর' জানিয়েছেন? তা নইলে মা এ কথাটা বলল কেন, 'আইনতঃ এখনো তুমি উত্তরপাড়ার রায়েদের বৌ!' অর্থাৎ পম্পাকে জব্দ করবার অধিকার তাদের আছে। আর তার জন্যে কোনোভাবে আইনের শরণও নিতে পারেন। আর সেই আশ্বাসে মা'র মুখে কুটিল আহ্লাদ। আশ্চর্য! এই চিরকালের নিরীহ কমলা চক্রবর্তী, এতো বদলে গেল কী করে? উঠতি'মস্তান ছেলের প্রভাবে? না স্বার্থহানির আশঙ্কায়?

পম্পা তার নিজের জীবনটা নিজের হাতে নেওয়ার সংকল্প ঘোষণা করার পর থেকেই তো কমলা ওই স্বার্থহানির জ্বালায় ছট্‌ফট করছে। কী অদ্ভুত ব্যবহারই করছে পম্পার সঙ্গে!

পম্পা ভিতরে ভিতরে শক্ত হলো।

একটু কঠিন গলায় বলল, খবরটা কী?

কমলা একটু নির্লিপ্ত আর উদাস মত গলায় বলল, তোমার শাশুড়ীটি তো গেলেন!

কী? কী বললে?

পম্পাকে কে যেন তার আত্মস্থতার উঁচুচূড়ো থেকে আছড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। পম্পা বোকার মতই প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'গেলেন' মানে?

মানে আর কী! গেলেন, মানে মরলেন। নাকি হঠাৎ হার্টফেল।... অবিশ্যি খবর দিতে বাড়ির কেউ আসেনি, গাড়িও পাঠায়নি, পাড়ার কেউ বোধহয় খবরটা তোমায় পাঠানো বিবেচনায় নিজে থেকে দিয়ে গেল। সে বোধহয় তোমার নতুন পথের বিষয় জানে না। তা দেখো এখন তোমার বিবেচনা!

'গেলেন'। মানে 'মারা গেছেন'।

পম্পার আর এখন কী করার আছে? খালিপায়ে নম্রমুখে উত্তরপাড়ার রায়-বাড়ির সেই নিতান্ত পরিচিত দেউড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া?

না, পম্পা তার মা'র সঙ্গে কোনো কথার আদান-প্রদানের দিকে যায় নি। পম্পা এক মিনিটও দেরি করেনি। নিঃশব্দে যেমন ছিল সেই ভাবেই বেরিয়ে এল। পিছনে একটা ব্যস্ত কণ্ঠের চীৎকার শুনতে পেল, একা কোথায় যাচ্ছিস? সমু আসুক। সন্ধ্যে হয়ে আসছে—

কান দিল না পম্পা সেই ব্যাকুলতায়।

বেরিয়ে এসে একখানা ট্যাক্সি ধরল।

* * *

যখন এসে পৌঁছল, তখন দেউড়ীর সামনে এক চোখঝলসানো দৃশ্য!

বড় বড় আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে দেউড়ির মাথায়, পাশে। সারা বাগানটা আলোয় ভরে গেছে। সেই আলোর নীচেয় দেউড়ির সামনে নামানো হয়েছে পূর্ণিমাকে পালঙ্কে করে।

সৌভাগ্যবতী পূর্ণিমা রায়ের জরিতে বোনা বেনারসী শাড়ি মোড়া দেহটাকে ঘিরে ফুলের পাহাড়, গলায় মোটা মোটা গোড়েমালার ভার। পূর্ণিমা রায়ের ঘোমটা খোলা মাথাটা সিঁদুরে লালে লাল, খোলা পা দুখানি আলতায় ডোবানো।

যেন অদেখা এক দেবীপ্রতিমা। পম্পা যেন এই আশ্চর্য প্রতিমাখানিকে এই প্রথম দেখছে। এতো সুন্দরী ছিলেন পূর্ণিমা রায়? এমন অলৌকিক?

অদ্ভুত একটাঈর্ষা কাতর দৃষ্টিতে অপলকে তাকিয়ে থাকে পম্পা ওই অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে।

পম্পার জন্যেই না এমনি একটা সাজ মজুত রয়েছে? আর কদিন পরেই পম্পা যে সাজে অলৌকিক হয়ে যেতে পারে। এমনি জরির শাড়ি, সিঁদুরে লাল মাথা, আলতায় ডোবানো পা, সর্বাঙ্গ ঘিরে ফুলের সম্ভার।

এই মহিলা কি পম্পার সেই আসন্ন সাজটিকে চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছেন?

হঠাৎ এমন মনে হল কেন?

ওই অলৌকিক সৌন্দর্যের দিকে আরো একজোড়া চোখ অপলকে তাকিয়ে আছে তার দৃষ্টিহারানো দৃষ্টি নিয়ে। পালঙ্কের মাথার কাছে, একটা চেয়ার এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে। স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন পালঙ্কের বাজুতে একটু হাত ঠেকিয়ে। ভিড়ে ভিড়।

বাগানভর্তি লোক। ঘোরাঘুরি করছে ঠেলাঠেলি করছে। পম্পা যে এসে দাঁড়িয়েছে তা কেউ দেখছেও না। যে যার ভাব নিয়ে ঘুরছে।

এরই মাঝখানে কয়েকজন এগিয়ে এল। পূর্ণিমা রায়ের পালঙ্কের কাছে সরে এল।

পম্পার অপলক দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেল ওই সৌন্দর্যভার।

আর তখনই পম্পা একটা স্খলিত কণ্ঠের আর্ত হাহাকার শুনতে পেল, পূর্ণিমা! পূর্ণিমা একবার বলে যাও, এখন আমি কী করব!

কারা যেন অন্ধ আর পঙ্গু মানুষটাকে টেনে নিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। কারা সব যেন ওই ফুলের ভারে ভারাক্রান্ত পালঙ্কখানাকে উঠিয়ে নিয়ে গেটের বাইরে চলে গেল।

আর কারা যেন পম্পাকে ঘিরে ধরে নিয়ে চলে গেল সেই ঘোলাটে হয়ে যাওয়া মার্বেলটালীমোড়া দালানটার ভিতর দিয়ে।

তবু ফুলের আর অগুরুর গুরুভার সুরভি যেন এখান পর্যন্ত চলে এসে পম্পাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। আর আকাশে বাতাসে, এই পুরনো হয়ে যাওয়া দেওয়ালে দেওয়ালে সেই আর্তস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে…'এখন আমি কী করব!…এখন আমি…এখন আমি…'

* * *

অনেক রাত্রে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসার পর প্রভাতসূর্য টের পেলেন পম্পা এসেছে।

শুতে পারেননি, বসেই আছেন সারারাত। কখন একসময় পায়ের ওপর আলতো একটু হাতের স্পর্শ। কে যেন পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে।

চমকে উঠলেন প্রভাতসূর্য, ভাঙা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, কে? কে?

পিছন থেকে সুখদার মা আস্তে বলল, বউমণি! আপনাকে প্রণাম করছেন।

বউমণি!

শব্দটায় ভারী শান্ত আর গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রভাতসূর্য। সেই শান্ত গম্ভীর গলাতেই বললেন, কখন এসেছেন?

সন্ধ্যেকালে। 'তিনি' ত্যাখনো দেউড়িতে।

প্রভাত তেমনি তাপউত্তাপহীন শান্তগলায় বললেন, কে আবার তোমায় জ্বালাতন করতে গেছল? আমি তো তোমায় আসতে বলিনি মা।

পম্পা আস্তে বলল, আমি তো আপনার অবাধ্য মেয়ে বাবা! যেতে বলেননি তবু চলে গিয়েছিলাম, এখন আসতে বলেননি, তবু এসেছি।

একটা শীর্ণহাত অসহায় ভাবে শূন্যে এগিয়ে এসে অন্ধকারকে হাতড়াল। হাতটাকে ধরে ফেলল পম্পা।

*　　　*　　　*

রত্নাকর বলেছিল, এ অসম্ভব। এ হতে পারে না। ভুলে যেও না 'নোটিশ দেওয়া আছে।

পম্পা অদ্ভুত একটু হেসে বলল, কত কারণেই তো বিয়ে ভেঙে যায়। ধ'র কনেটা মরে গেল। সেটাই বোলো গিয়ে।

তবু রত্নাকর বলেছিল, নিজেকে বোঝবার চেষ্টা কর পম্পা। হঠাৎ উদারতার নেশায় সর্বস্বান্ত হয়ে 'দান' করে বসার মধ্যে সাময়িক উন্মাদনা থাকতে পারে, কিন্তু সে উন্মাদনা কেটে গেলে? তারপর?

পম্পার মুখটা নীচু করা ছিল, চোখ তুলে বলল, তারপর আর কী? দিন কাটিয়ে চলা।

শুধু দিন? দিনটাই সব? জীবনটা কাটবে কী করে ভেবে দেখেছ?

'জীবন?' নাঃ! ওটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি রত্নাকর। দিনগুলো কাটানো নিয়েই কথা।

তা সেটাই বা কাটবে কী করে বল শুনি? শুধু ওই এক আরো অধিক শোকগ্রস্ত অন্ধপঙ্গু লোকটার সেবা করে? এতবড় ভুল কোরো না। পম্পা। ওর তো টাকার অভাব নেই? দু'চারটে নার্স রাখুন না?

তা হয়না রত্নাকর।

কেন হয় না?—রত্নাকর তীব্র হয়। বুঝিয়ে দাও আমায়, কেন হয় না। টাকা দিয়ে উনি অনেক সুবিধে কিনতে পারেন।

'সুবিধে'টাই কি সব?

তোমার কাছে কোন্‌টা 'সব' আর কোন্‌টা 'কিছু না' আমার বোঝা অসাধ্য। কিন্তু লোকে তোমায় কি বলছে জানো? তুমি এদের এই বিষয়আশয়ের লোভের জালেই আটকা পড়ে গেলে শেষ পর্যন্ত। 'গিন্নী' মারা যাওয়ায়, সব কিছুর গিন্নী হওয়ার লোভ!

পম্পা একটু হাসল। লোকে তো এই রকমই বলতে অভ্যস্ত। এর উল্টোটায় বলছিল, 'জীবনের' লোভ, কামনা-বাসনার লোভ, ভোগসুখের—

লোকের কথা থাক। আমার কথাটা ভেবে দেখেছ একবারও?

পুরু চশমার আড়ালের সেই গভীর কালো দৃষ্টিটি আগুনের মত ধক ধক

করে জলে ওঠে।

পম্পার মুখটা আবার নীচু হয়ে যায়। কেঁপে-ওঠা গলায় বলে, ভাববার সাহস হয়নি।

তোমার এই ডিসিশান নেওয়াটাকে কী বলে জানো? জানো না? বুঝতে পারছ না, একে বলে 'বিশ্বাসঘাতকতা'!

পম্পার কণ্ঠস্বর অস্ফুট হয়ে এল, হয়তো এটাই আমার নিয়তি।

ওইটাই যুক্তিহীনের শেষ আশ্রয়।

* * *

সেদিন রাগ করে চলে গিয়েছিল রত্নাকর। আবার এল আজ।

এখন তো এসে এসেই দেখা করতে হবে। অফিসে তো আর যায় না পম্পা। সেদিন দেখা হয়েছিল বেলেঘাটায় কমলা চক্রবর্তীর বাড়ি, মায়ের আকুল আবেদনে দেখা করতে গিয়েছিল মেয়ে।···আজ এল উত্তরপাড়ার রায়বাড়িতে।

তা অফিসের সহকর্মী, হঠাৎ অফিসটা ছেড়ে দেওয়ায় খোঁজ নিতে আসবে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাড়িতে ঢোকার মুখে সিঁড়িতে সেই 'রহমন' ছাড়া আর কোথাও কোনো পাহারা ছিল না। অন্ততঃ দৃশ্যমান কেউ নয়।

তবু রত্নাকর বলল, হ্যাংলার মত আবার এলাম পম্পা। আবারও বলছি এখনো সময় চলে যায়নি, এখনো ভেবে দেখো, এই পুরনো প্রাসাদের মধ্যে বন্দিনী হয়ে থেকে তোমার 'জীবন' না হোক, দিনগুলোই বা কাটবে কী করে?

পম্পা একটু হাসল। বলল, এদের ভাঁড়ার গুছিয়ে, লক্ষ্মীর ঘর সাজিয়ে, রুপোর বাসনের সিন্দুক সামলে, চওড়া চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো পুরনো পুরনো অয়েলপেন্টিং ঝেড়ে, বিশাল বিশাল আরশী, আর সুন্দর সুন্দর পুরনোকালের পোর্সিলেনের পুতুল আর ফুলদানী মুছে এবং একগাদা লোকজনের ওপর খবরদারী করে। দিন কাটার আবার ভাবনা।

রত্নাকর বলল, তা বটে। কাটলে ছুরি দিয়েও কেটে কেটে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পম্পা, একটা অলীক মোহে নিজেকে 'দেবী' ভাবতে বসলেও, সত্যিকার ভাবনায় ভেবে দেখো, তুমি একটা রক্তমাংসে গড়া মানবী।

পম্পা আবারও হাসল। বলল, সেটা ভেবে দেখেই তো মুশকিল হয়েছে রত্নাকর। 'মানবী' বলেই মানবিকতার দায়।